নামাযের শিক্ষা ও তাৎপর্য

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুল মজিদ
ও
অধ্যাপক সাইদুর রহমান

www.pathagar.com

নামাযের শিক্ষা ও তাৎপর্য

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুল মজিদ
ও
অধ্যাপক সাইদুর রহমান
সম্পাদক
আবদুল মান্নান তালিব

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৭০

১ম প্রকাশ
জিলকদ ১৪২৬
পৌষ ১৪১২
ডিসেম্বর ২০০৫

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৮০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

NAMAZER SHIKHA O TATPORJO by Md. Abdul Majed and Md. Saydur Rahman. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Fixed Price : Taka 80.00 Only.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নামাযের শিক্ষা ও তাৎপর্য গ্রন্থের

লেখক সম্পর্কে দুটি কথা

নামাযের শিক্ষা ও তাৎপর্য গ্রন্থের লেখক অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুল মজিদ বৃহত্তর যশোর জেলার (বর্তমান নড়াইল) কালিয়া থানার বর্ধিষ্ণু গ্রামে বড় নলের একটি রাজনৈতিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মোঃ ইসমাঈল হোসাইন সরদার। এবং মাতার নাম মোছাম্মাৎ জামিলা বেগম। নিজ গ্রামে প্রাইমারী শিক্ষা সমাপ্ত করে কালিয়া থানা সদরে কালিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হলেও নিজ পরিবারের উদ্যোগে খামার পারখালী উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর আবার গ্রামে ফিরে খামার পারখালী উচ্চ বিদ্যালয়ে ৭ম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ৭ম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার পরই ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তখন ১৯৬২ সাল। সারা বাংলাদেশব্যাপি হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন চলছে। কারো প্ররোচনা ছাড়াই কালিয়া থানা সদর থেকে সুদুর খুলনায় প্রায় ৩০ মাইল পথ পায়ে হেঁটে মিছিল সহকারে হাজির হয়েছিলেন খুলনার বিভাগীয় প্রতিবাদ সমাবেশে। এখান থেকে রাজনৈতিক জীবন শুরু। এরপর ১৯৬৪ সালের শেষ দিকে সিরাজুল আলম খান সাহেবের সাথে কাকতালীয়ভাবে পরিচয় ঘটলো। পরে অবশ্য জানতে পেরেছিলেন পরিকল্পিতভাবে তাঁর সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তিনি মন্ত্র দিলেন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গড়ার।

তেভাগা আর কমিউনিষ্ট আন্দোলনের পীঠস্থান হলো নড়াইল। স্বাভাবিক কারণেই সমাজতন্ত্রের প্রতি আগ্রহ এবং শ্রেণী সংগ্রাম ও সশস্ত্র বিপ্লবের প্রতি আগেই ঝুঁকে পড়েছিলেন। ইতিমধ্যে বিচারপতি ইবরাহীম সাহেবের নেতৃত্বে লিবারেশন সেল তৈরি করে ফেলেছিলেন জনাব সিরাজুল আলম খান। ১৯৬৫ সালে লিবারেশন সেলের সদস্যপদ লাভ করার পর একাডেমিক পড়াশুনা ছিকায় উঠলো। স্কুল নামের পদার্থটির কথা একেবারে ভুলে গেলেন। ১৯৬৫ সালের পাক ভারত যুদ্ধের সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীর চর হিসেবে গ্রেফতার ও জেল হাজতে বসেই মার্কসবাদ লেলিনবাদ গিলতে শুরু করলেন অবিরাম গতিতে।

জেল থেকে মুক্তি পেয়েই লিবারেশন সেলের সার্বক্ষণিক কর্মী বনে গেলেন। ইতিমধ্যে পারিবারিক চাপের মুখে ১৯৬৬ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ

www.pathagar.com

করলেও উত্তীর্ণ হবেন না বিধায় পরীক্ষার ফলাফল জানার কোনো আগ্রহই ছিলো না। কিন্তু হঠাৎ করেই পারিবারিক সূত্রে অবগত হলেন যে, তিনি দ্বিতীয় বিভাগে এস. এস. সি. পাশ করেছেন। লিবারেশন সেলের নির্দেশক্রমে খুলনাকেই রাজনীতির ক্ষেত্র হিসেবেই বেছে নিতে হলো। ভর্তি হলেন আই. এস. সি ক্লাসে দৌলতপুর বি. এল কলেজে। ব্যাস ঐ পর্যন্তই পড়াশুনা শেষ। ১৯৬৮ সনের প্রথম দিকে কমিউনিষ্ট পার্টির প্রভাবে Anti Tax Movement-এ জড়িয়ে পড়ায় গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয় এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ব্যয় নির্বাহের জন্য কুপন বিক্রি করতে গিয়ে আবারো শ্রী ঘরে স্থান করে নেন।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের আন্দোলনে নড়াইল জেলা সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি (আহবায়ক)-এর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এবং নড়াইল জেলার বি. এল. এফ (মজিব বাহিনী)-এর উপ প্রধান ও কালিয়া থানার প্রধান হিসেবে বিভিন্ন রণাঙ্গনে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধ করেন। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের কেন্দ্রীয় রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। এ সময়কালের মধ্যে গণবাহিনীর দক্ষিণ অঞ্চলীয় উপ-প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। অসমাপ্ত স্বাধীন বাংলাদেশে অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুল মজিদের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবের সরকার সর্বপ্রথম হুলিয়া জারী করে। সময়কাল ছিল ১৩ এপ্রিল ১৯৭২ সাল। এরপর ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পুনরায় বডি ওয়ারেন্ট জারী করে। এ সময়ের মধ্যে পুরোপুরি নাস্তিক বনে যান। ১৯৭৫ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর সূর্যসেন হল থেকে আবারো সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক গ্রেফতার হয়ে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ৩ মাসাধিককাল অন্তরীন থাকেন। এ গ্রেফতারী পরোওয়ানা মাথায় নিয়ে তিনি নর্থ খুলনা ডিগ্রি কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস বিষয়ে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে এম. এ. পাশ করেন ১৯৭৫ সালে।

১৯৭৭ সাল থেকে জুন ১৯৮০ পর্যন্ত ঢাকায় লালন ফাইন আর্ট একাডেমীর অধ্যক্ষ এবং জুলাই ১৯৮০ সাল থেকে মুন্সী মানিক মিয়া ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বরত আছেন।

তিনি যখন পুরোপুরি নাস্তিক ঠিক তেমনি মুহূর্তে ১৯৮৩ সালে পরিচয় ঘটলো মওলানা মওদূদুল হক সাহেবের সাথে এবং তাঁর মাধ্যমেই পরিচয় হলো গোপালগঞ্জ ইয়াতিম খানার প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাত আলেম মরহুম হযরত মওলানা আবদুল ওয়াহাব সাহেবের সাথে। (মহান রাব্বুল আলামীন

www.pathagar.com

তাঁকে জান্নাতবাসী করুন) এরপরই বর্তমান জীবনে অর্থাৎ একজন ঈমানদার মুসলমান হিসেবে শহীদি মৃত্যু লাভের আকাঙ্ক্ষায় শরীক হওয়ার চেষ্টায় লিপ্ত আছেন। এ বিষয়গুলো বুঝতে পেরে আওয়ামী সরকার ১৯৯৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তাঁর বড়দিয়াস্থ বাসভবনে সশস্ত্র হামলা চালানোর পর তিনি চাকুরী বহাল থাকা সত্বেও বেকার জীবন যাপন করছেন। এ অবস্থায় তিনি এখন ইসলামের ও মুসলমানদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সার্বক্ষণিকভাবে গবেষণারত আছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণা কর্ম ও বিশেষ নিবন্ধ এ পর্যন্ত ২১টিতে পৌঁছেছে।

কবি মহসিন হোসাইন
সাব এডিটর, দৈনিক ইনকিলাব

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

লেখক পরিচিতি

সহকারী অধ্যাপক সাইদুর রহমান

এ গ্রন্থের অন্যতম লেখক মুহাম্মদ সাইদুর রহমান পুরাতন যশোর জেলাধীন হরিনাকুণ্ড থানার ভবানীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মুহাম্মদ আলতাফ হোসেন এবং মাতার নাম মুসাম্মাত রিজিয়া বেগম। গ্রামের প্রাইমারী ও জুনিয়র হাইস্কুলের শিক্ষা অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে সমাপ্ত করে তিনি ১৯৬৭ সালে রাজশাহী সরকারী হাই মাদ্রাসায় অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন, এবং ১৯৭০ সালে অত্যন্ত সুনামের সাথে এস. এস. সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৭২ সালে রাজশাহী সরকারী কলেজ থেকে এইচ. এস. সি তে প্রথম বিভাগ নিয়ে পাশ করেন এবং ১৯৭৫ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাধারণ ইতিহাসে বি. এ. (অনার্স) এবং ১৯৭৬ সালে এম. এ. এ দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনা শেষ করেন। ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত তিনি স্বীয় এলাকায় মসজিদ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন সমাজ সংস্কারমূলক কাজে অতিবাহিত করেন। ১৯৮০ সালে নড়াইল (যশোর জেলার) লোহাগড়া কলেজে ইতিহাসে প্রভাষকের পদে চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৯৮৪ সালে তিনি শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কৃত হন। ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি লোহাগড়া কলেজেই অত্যন্ত সুনামের সাথে অধ্যাপনায় রত ছিলেন। অধ্যাপনার সাথে সাথে তিনি বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা করে যাচ্ছিলেন। তার গবেষণার উল্লেখযোগ্য ফসল হলো ঃ

১. ইসরাঈল ও মুসলিম জাহান
২. লোহাগড়া উপজেলা সংকলন' ৮৪
৩. নামাযের শিক্ষা ও তাৎপর্য (আংশিক)
৪. ইসরাঈল এবং মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা
৫. শবে বরাতের ঐতিহাসিক পটভূমি ও তাৎপর্য

৬. নড়াইল জেলায় নীল চাষ ও নীল বিদ্রোহ ইত্যাদির পরবর্তীতে তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস রচনা এবং সমাজ থেকে "সুদ প্রথা" মূলোৎপাটনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

মোঃ রিফাত হাসনাত উজ্জল
ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পূর্বাভাস

নামায কায়েম করো। পবিত্র আল কুরআনে উক্ত শব্দগুলো ৮২ বার উল্লেখ করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা এবং তাৎপর্য বর্ণনা করতে গেলে একটি বিশাল গ্রন্থ রচিত হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে আমার মূল লক্ষ্য "নামাযের শিক্ষা ও তাৎপর্য" গ্রন্থটির ভূমিকা রূপায়ণ। নামাযের শিক্ষা ও তাৎপর্য গ্রন্থের যাবতীয় তথ্য দলিলাদি এবং লেখার ৭০% কাজ সম্পন্ন করেন অধ্যাপক মুহাম্মদ সাইদুর রহমান। বিগত ১৯৯৬ সালের ৩০শে এপ্রিল তিনি মাত্র ৪১ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি ছিলেন সত্যিকারের একজন কৃতি গবেষক ও ঐতিহাসিক। মরহুম মুহাম্মদ সাইদুর রহমান প্রণীত ইসরাঈল ও মুসলিম জাহান, মাহে রমযানের শিক্ষা ও তাৎপর্য, ইসরাঈল ও মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা, স্নাতক শ্রেণীর পাঠ্যক্রম অনুযায়ী রচিত ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস এবং ইসলামের ইতিহাস তাঁর ইসলাম ও ইতিহাস সম্পর্কিত জ্ঞানের গভীরতা ও পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর বহন করে। তাঁর অকাল মৃত্যুতে ভবিষ্যত প্রজন্ম অনেক কিছু থেকেই বঞ্চিত হলো। এ দার্শনিক তত্ব ও তথ্যপূর্ণ অসমাপ্ত "নামাযের শিক্ষা ও তাৎপর্য" গ্রন্থখানার বাকী কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব গ্রহণ করে বুঝতে সক্ষম হলাম কাজটি কতটুকু দুরূহ। দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টায় গ্রন্থখানার কাজ সম্পন্ন করলেও আমার ধারণা হয়তবা আমার লেখা পাঠক বর্গের সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হবে না। কারণ বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমি শুধু অজ্ঞই নই আনাড়ীও বটে। তাই বিদগ্ধ পাঠক সমাজের কাছে নিবেদন ভুল-ত্রুটি হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি নিয়ে দেখবেন আর এই গ্রন্থের ৭০% লেখা অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীলভাবে যে বিশিষ্ট গবেষক, ঐতিহাসিক মরহুম অধ্যাপক সাইদুর রহমান সম্পন্ন করেছিলেন তার আত্মার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করবেন।

যার অপরিসীম কৃপায় আমাদের এ জীবন, যার অযাচিত দানে আমরা সমৃদ্ধ, যাঁর অফুরন্ত দান-ভাণ্ডার ভোগ করছে মানুষ তাঁর স্তুতি বন্দনা ও সন্তোষ সাধনের যৌক্তিকতা এবং গুরুত্ব অস্বীকার করতে পারে না কোনো সুস্থ বিবেক-মন। তাঁর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা-প্রেম, ভালোবাসা নিবেদনের মাহাত্ম সত্যিই প্রণিধানযোগ্য। ইসলাম তাই জীবন-প্রভাতে দৈনন্দিন

www.pathagar.com

অবশ্য পালনীয় অনুষ্ঠান হিসেবে যেমন নামায পড়ার নির্দেশ প্রদান করেছে তেমনি দিনরাতের বিভিন্ন অংশে কাজকর্ম এবং অন্যান্য সাধনার ফাঁকে ফাঁকে নামায আদায় করতে বাধ্য করেছে।

বইটি প্রকাশে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন আমি আন্তরিকভাবে তাদের নিকট কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে বাংলা সাহিত্য পরিষদের ব্যবস্থাপক জনাব তৌহিদুর রহমান ও আমার স্ত্রী মোসাম্মাৎ হেলেনা বেগম।

সর্বমোট ফরয নামাযের ওয়াক্তের সংখ্যা পাঁচ। আলোচ্য গ্রন্থটিতে দলিল আকারে কেন, কিভাবে কোন্ অবস্থায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হলো তাই আলোচনার চেষ্টা করা হলো।

বিনীত

মুহাম্মদ আবদুল মজিদ
অধ্যক্ষ
মুন্সি মানিক মিয়া ডিগ্রি কলেজ, নড়াইল

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

১. নামায পরিচিতি ১৫
২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার সন ও তারিখ ২১
৩. নামায ও মিরাজ ২৩
৪. মিরাজ যে স্বাপ্নিক নয় তার সপক্ষে বিজ্ঞান ৪২
৫. মিরাজ যে সশরীরেই সংঘটিত হয়েছিলো তার ঐতিহাসিক দলিল ৪৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

৬. পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয ঘোষণার দার্শনিক কারণ ৫১
৭. পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয ঘোষণার ঐতিহাসিক কারণ ৫৪
৮. কুরআন ও হাদীসের যে সমস্ত আয়াত দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে সাবেত (সনাক্ত) করা হয়েছে ৬১
৯. নামাযকে কতকগুলো বিশেষ নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ করার পটভূমি ৬৮
১০. নামাযে নামাযীরা যা পড়েন ৭১
১১. নামাযে পঠিত আয়াত সমূহের তাৎপর্য ৭৬
১২. নামায মু'মিনদের জন্য মি'রাজ ৯৩
১৩. মানব সংস্কারে নামাযের ব্যর্থতার কারণ ৯৬
১৪. নামায ও কুরআন ৯৮
১৫. নামাযে কুরআন তেলাওয়াত করার বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক কারণ ৯৯
১৬. কুরআন যে সত্য সত্যই আল্লাহর বাণী তার স্বপক্ষে বিজ্ঞান ১০৪

তৃতীয় অধ্যায়

১৭. নামায ও আযান ১০৬
১৮. নামায ও জামায়াত ১০৯
১৯. জামায়াতে নামায আদায় করার তাৎপর্য এতো গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ার কারণ ১১২
২০. জামায়াতের সামরিক গুরুত্ব ১১৫
২১. সমাজ সংস্কারে জামায়াতের গুরুত্ব ১১৯

www.pathagar.com

২২. সাম্য প্রতিষ্ঠায় নামায ১২১
২৩. ইমাম বা নেতা নির্বাচনে নামায ১২৬
২৪. আনুগত্য প্রশিক্ষণে নামায ১২৯
২৫. মসজিদের ইমাম এবং রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান ১৩১
২৬. নামায মানুষকে কর্তব্য পরায়ণ ও কর্মঠ করে তোলে ১৩৪
২৭. নামায মানুষকে আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তিদান করে ১৩৭
২৮. নামায মানুষকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে ১৪২
২৯. মসজিদ ও ইমাম ঃ এ যুগে ও সে যুগে ১৫০

চতুর্থ অধ্যায়

৩০. সালাত ও নামায ১৬১
৩১. পূজা, উপাসনা ও ইবাদাত ১৬২
৩২. ধর্ম বৈকল্য ও তার পরিণতি ১৭১

পঞ্চম অধ্যায়

৩৩. নামাযের স্বাস্থ্যগত তাৎপর্য ২০১

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

১. নামায পরিচিতি

নামায ফার্সী শব্দ। আরবীতে একে বলা হয় সালাত। সাধারণত সালাত অর্থ উপাসনা, মঙ্গল প্রার্থনা, আশীর্বাদ। ইসলামের প্রথম থেকেই দৈনিক পাঁচবার নামায পড়ার বিধান নির্দিষ্ট হয়েছে। ফজর, জোহর আসর, মাগরিব ও এশা। ইসলামের পাঁচটি রুকন বা স্তম্ভের মধ্যে সালাত বা নামায একটি। প্রথম রুকন ঈমানের পরেই সালাতের স্থান। তারপর যাকাত, সওম বা রোজা ও হজ্জ। কুরআন মজিদে সালাত কায়েম করার জন্য বারবার তাকীদ করে বলা হয়েছে যে, সালাত উপযুক্ত ভাবে প্রতিপালিত হলে এটা মানুষকে সবরকম অন্যায় অসঙ্গত কাজ হতে বিরত রাখে। হাদীস শরীফেও সালাতকে দীন বা ইসলামের ভিত্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃত সালাতে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভ ও তাঁর সাথে আন্তরিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

পাক-পবিত্র হয়ে পবিত্র স্থানে বিশুদ্ধ অন্তকরণে সালাত সম্পন্ন করতে হয় এবং একমাত্র প্রভু আল্লাহ্ তাআলার নিকট নিজের দীনতা ও হীনতা প্রকাশ করে তাঁর অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে হয়। সালাত সম্পাদনের পূর্বে শারীরিক পবিত্রতার জন্য ওযূ বা তায়াম্মুম—প্রয়োজন হলে গোসল করতে হয়। পরিধানের বস্ত্র পাকসাফ হওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং পুরুষের পক্ষে অন্তত নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং স্ত্রীলোকের জন্যে মুখমণ্ডল ছাড়া সমস্ত শরীর ঢাকা আবশ্যক। কিবলা অর্থাৎ বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে নিয়ত করতে হয়। নিয়তে যে সময়ের যে নামায তার উল্লেখ করতে হয়। নিয়ত মনে মনে ও নিজ নিজ ভাষায় করাই ভালো। কবর ও অপবিত্র স্থান ছাড়া যে কোনো স্থানে নামায সম্পন্ন করা যায়। তবে মসজিদে সম্পন্ন করা উত্তম। কিবলামুখী দাঁড়িয়ে নিয়ত করে তাকবীর তাহরীমা অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবর' বলে দু হাত পুরুষদের কান পর্যন্ত উঠিয়ে নাভি মূলে ও স্ত্রীলোকদের কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে বুকের উপর রাখতে হয়। ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের ওপর থাকে। এভাবে দণ্ডায়মান মুসল্লী সানা, তা'আউবুয ও তাসমিয়া পড়ে সূরা ফাতিহা ও তারপর কুরআন মজীদ থেকে অন্তত ছোট তিন আয়াত বা বড় এক আয়াত পরিমাণ পাঠ করেন, এরপর আল্লাহু আকবর বলে সম্মুখে ঝুঁকে রুকূ'তে যান এবং রুকূ'র তাসবীহ

www.pathagar.com

পড়েন। তারপর তাকবীর তসমী, ও তাহমীদ বলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে স্থির হন ও পুনরায় আল্লাহু আকবর বলে সিজদায় যান ও সিজদার তাসবীহ পড়েন। সিজদা দুবার করতে হয়। এভাবে এক রাকাআত নামায সম্পন্ন হয়। তারপর মুসল্লী আবার আল্লাহু আকবর বলে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ান ও সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা বা সূরার অংশ পড়ে পূর্ব রাকাআতের ন্যায় তাকবীর রুকূ', তাসবীহ, তাসমী, তাহমীদ ও সিজদা শেষ করে বাম পায়ের ওপর বসেন ও ডান পা ভাঁজ করে গোড়ালী উর্ধে রাখেন। এভাবে উপবিষ্ট অবস্থায় তাশাহুদ ও দরূদ পাঠ করে ডানে ও বামে মুখ ফিরিয়ে সালাম করেন। এতে করে দুই রাকআত নামায সম্পন্ন হয়। তিন বা চার রাকাআত ফরয নামায পড়ার নিয়ত করে থাকলে তাশাহুদের পর তাকবীর বলে উঠে দাঁড়িয়ে বাকী এক বা দুই রাকআত পূর্ব নিয়মে শেষ করতে হয়। কিন্তু এ বাকী এক বা দুই রাকাআতে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়তে হয়। অন্য সূরা বা সূরার অংশ পড়তে হয় না। নামায একাকী পড়তে পারা যায়, কিন্তু জামাআতে পড়াই শরীয়তের বিধান। জামাআতে নামায পড়তে আহবানের জন্য আযান দেয়া হয়। জামাআতে ফরয নামাযের আগে ইকামত দেয়া হয়। জামা'আতে নামায পড়ার সওয়াব অনেক বেশী। জামাআতে নামায পড়লে ইমামের পিছনে ইকতিদা করছি বলে নিয়ত করতে হয়। কিন্তু কোনো সূরা পড়তে হয় না। চুপ করে ইমামের পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর সূরা কিরাআত শুনতে হয়। জামা'আতের ইমাম আগন্তুক না হয়ে স্থানীয় যোগ্য ব্যক্তি হওয়া উচিত।

কর্তব্যের গুরুত্ব হিসেবে সালাতকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল। ফজরে দুই রাকআত সুন্নাত ও দুই রাকাআত ফরয, জোহরের চার রাকাআত সুন্নাত, চার রাকা'আত ফরয ও দুই রাকাআত সুন্নাত। আসরের চার রাকাআত ফরয, মাগরিবে তিন রাকাআত ফরয ও দুই রাকাআত সুন্নাত। এশার চার রাকা'আত ফরয, দুই রাকা'আত সুন্নত ও তিন রাকা'আত ওয়াজিব বিতর। এছাড়া নফল নামায যত ইচ্ছা পড়া যায়। ফজর, মাগরিব, এশা ও জুমআর ফরয নামায ছাড়া সব নামাযই নীরবে পড়তে হয়। কোনো বিশেষ কারণে সালাত আদায় না করতে পারলে তার কাযা আদায় করতে হয়। দৈনিক পাঞ্জেগানা নামায কায়েম করা প্রত্যেক বালিগ ও সুস্থ মস্তিষ্কের পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জন্য ফরয। ফরয ত্যাগ করলে কবীরা গুনাহ হয় এবং অস্বীকার করলে কাফের হয়। ওয়াজিব ত্যাগ করলে শক্ত গুনাহ হয় কিন্তু অস্বীকার করলে কাফের হয় না। দৈনিক পাঞ্জেগানা নামায ছাড়া অন্যান্য সময়ে ও উপলক্ষে

www.pathagar.com

নামায পড়া হয় যেমন, শেষরাতে সালাতুত তাহাজ্জুদ, শুক্রবারে জোহরের পরিবর্তে ঐ সময় সালাতুল জুম'আ, সালাতুল ঈদ, সালাতুল ইস্তিস্কা (বৃষ্টির জন্য নামায), সালাতুল কুসুফ (সূর্যগ্রহণের সময় নামায), সালাতুল খুসুফ (চন্দ্রগ্রহণের সময় নামায), সালাতুল জানাযা, সালাতুত তারাবীহ, সালাতুল ইসতিখারা (ভালো মন্দ জানার জন্য নামায), সালাতুল এশরাক, সালাতুল আওয়াবিন। সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ।

সালাতুত তারাবীহ

রমযান মাসে এশার নামাযের পর বিতরের নামাযের পূর্বে যে বিশ রাকা'আত নামায পড়া হয় তাকে সালাতুত তারাবীহ বলা হয়। এ নামায দুই দুই রাকা'আত করে দশ সালামে পড়া হয় এবং প্রত্যেক চার রাকাআত পর পর বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়া হয়। এজন্য এর নাম সালাতুত তারাবীহ বা বিরামযুক্ত নামায। বিরামের সময় দোয়া পড়া উত্তম। তারাবীহের নামায জামা'আতে পড়া সুন্নাতে মু'আক্কাদা। হযরত রসূলে করীম স. এ নামাযের জন্য খুব তাকীদ করেছেন। তবে কেউ যেন একে ফরয বা বাধ্যতামূলক বলে মনে না করে সে জন্য তিনি কদাচিৎ এটা ত্যাগও করেছেন। যদি কেউ ইমামের সাথে তারাবীহের নামায পড়ার পূর্বে এশার ফরয নামাযের জামাতে শামিল না হতে পারেন তাহলে প্রথম এশার নামায পড়ার পর ইমামের সাথে জামা'আতে যতটুকু তারাবীহের নামায পান তা পড়বেন এবং বিতরের নামায ইমামের সাথে জামা'আতে পড়ে তারপর তারাবীহের নামায যতটা পাননি তা নিজে নিজে পড়বেন। তারাবীহের নামাযে সমস্ত কুরআন মজীদ অন্তত একবার শেষ করা সাধারণ রীতি।

সালাতুল ঈদ

ঈদের নামায। ইসলামে বছরে দুটি ঈদ উৎসবের ব্যবস্থা আছে। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা।

সালাতুল খাউফ

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় নামাযের গুরুত্ব এত বেশী যে, শত্রু কিংবা হিংস্র জন্তুর ভয় থাকলেও নামায ত্যাগ করতে পারা যায় না। ভয় সংকুলস্থানে নামায আদায় করতে ইমাম মুক্তাদীগণকে দুভাগে বিভক্ত করে একদলকে শত্রুর দিকে পাহারায় নিযুক্ত করবেন। মুসাফির হলে অথবা

www.pathagar.com

ফজরের নামায হলে শুধু দু রাকাআত পড়তে হয়। কাজেই ইমাম দ্বিতীয় দল নিয়ে এক রাকা'আত নামায পড়বেন। আর মুকীম হলে অথবা মাগরিবের নামায হলে ইমাম দ্বিতীয় দল নিয়ে দু রাকাআত নামায পড়বেন। তৎপর দ্বিতীয় দল নামায ত্যাগ করে শত্রুর দিকে পাহারায় নিযুক্ত হবেন। এ সময় প্রথম দল এসে ইমামের সাথে নামাযে সামিল হবেন। ইমাম প্রথম দল নিয়ে বাকী নামায পড়ে একাই সালাম ফিরাবেন। প্রথম দল সালাম না ফিরিয়ে আবার পাহারায় নিযুক্ত হবেন। দ্বিতীয় দল তখন ফিরে এসে বিনা কিরআতে বাকী নামায শেষ করে সালাম ফিরিয়ে আবার পাহারায় ফিরে যাবেন। তখন প্রথম দল আবার এসে কিরাআত সহ প্রথম ভাগের বাকী নামায শেষ করে সালাম ফিরাবেন। এভাবে সকলেরই পুরো নামায আদায় করা হবে।

সালাতুল জানাযা

মৃত ব্যক্তির জন্য নামায পড়া ফরযে কিফায়া অর্থাৎ কয়েকজন লোক জানাযার নামায পড়লেই অন্যেরা এ দায়িত্ব হতে মুক্ত হয়। কিন্তু কেউ না পড়লে সকলেই গুনাগার হয়। মৃত ব্যক্তি মুসলিম ও পাক-পবিত্র হওয়া জানাযা নামাযের শর্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি মুসলিম নয় বা যে মুসলিম মৃতের গোসল দেয়া হয়নি তার জন্য জানাযার নামায পড়া সিদ্ধ নয়। আত্মহত্যা করেছে এমন মৃতের জন্য জানাযার নামায পড়া হয় না। জানাযার নামাযে ইমামতের জন্য অগ্রগণ্য ব্যক্তি সুলতান বা শাসনকর্তা, তারপর কাজী, তারপর মহল্লার ইমাম, তারপর মৃতের ওলী। মৃতের পিতা ও পুত্রের মধ্যে পিতা অগ্রগণ্য। জানাযার নামাযের সময় মৃতকে সম্মুখে শায়িত রেখে ইমাম কিবলামুখী হয়ে মৃতের বক্ষ সোজা দাঁড়ান এবং মুক্তাদীগণ সারিবদ্ধ হয়ে তার পিছনে দাঁড়ান। সকলে নিয়ত করে তাকবীর সহ দুই হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে তাহ্‌রীমা বাঁধেন। তারপর সানা পড়ে দ্বিতীয়বার তাকবীর বলেন। তারপর দরুদ পড়ে তৃতীয় তাকবীর বলেন। শেষে নিজেদের জন্য, মৃত্যের জন্য ও সমস্ত পরলোকগত মুসলিম নর-নারীর জন্য দোয়া পড়ে চতুর্থ তাকবীর বলেন এবং সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করেন। নিয়ত, সানা, দরূদ ও দোয়া নীরবে পড়তে হয়। যানাযার নামাযে কিরাআত ও আত্তাহিয়াতু পড়তে হয় না এবং প্রথম তাকবীর ছাড়া অন্য তিনবার তাকবীর বলতে হাত উঠাতে হয় না। মৃতের অনুপস্থিতিতে গায়েবানা জানাযা পড়া যায়। মহল্লায় অথবা মসজিদে বা মৃতের বাড়ীর আঙ্গিনায় জানাযার নামায পড়া যায়।

www.pathagar.com

সালাতুল জুম'আ

ইসলামে শুক্রবার সাপ্তাহিক মিলন পর্ব—পবিত্র দিন। শুক্রবারকে জুম'আর দিন বলা হয়। যোহরের নামাযের পরিবর্তে ঐদিন ঐসময়ে জামা'আতের সাথে জুম'আর নামায পড়া হয়। প্রত্যেক স্বাধীন, সুস্থ মস্তিষ্ক, বালেগ পুরুষ মুসলিমের দুই রাকা'আত জুমআর নামায আদায় করা ফরয। জুম'আর নামায সাধারণত মসজিদে পড়া হয়। আযানের পর মুসল্লীগণ মসজিদে সমবেত হন। প্রথমে চার রাকা'আত সুন্নাত নামায পড়ার পর দ্বিতীয়বার মসজিদের ভিতরে আযান দেয়া হয়। তখন ইমাম মিম্বারে উপবিষ্ট থাকেন। ইমাম প্রথম খুতবায় ইসলামী জীবন বিধান সম্বন্ধীয় উপদেশ দান এবং সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় সমস্যাদি আলোচনা করে বক্তৃতা পাঠ করেন। কিছুক্ষণ বসে বিশ্রামের পর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খুতবায় আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা এবং রসূল স. ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম ও বংশধরদের গুণাবলী আলোচনা ও দরূদ পাঠ করেন। খুতবা শেষ হলে ইকামাত দিয়ে যথানিয়মে দুই রাকা'আত ফরয নামায সম্পাদন করা হয়। উপস্থিত মুসল্লিগণ সকলেই ইমামের পিছনে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে তাঁর অনুসরণ করেন। তারপর চার রাকা'আত সুন্নাত এবং আরো দুই রাকা'আত সুন্নাত নামায পড়া হয়। জুম'আর নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য ছয়টি শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে ঃ (১) শহর বা শহরতলী অথবা বড়গ্রাম, (২) মুসলিম সুলতান, শাসনকর্তা বা তার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকা, (৩) যোহরের সময় হওয়া, (৪) নামাযের পূর্বে খুতবা পড়া, (৫) জামা'আত হওয়া (ইমাম ছাড়া অন্তত তিনজন মুসল্লী থাকা) এবং (৬) নামাযের স্থানে সর্বসাধারণ মুসলমানের প্রবেশ করার অনুমতি থাকা।

জুম'আর নামাযে খুতবা পাঠ করার জন্য ইমাম যখন ওঠেন বা তাঁর হুজরা থেকে বের হয় তখন থেকে নিয়ে ইমামের খুতবা শেষ হওয়া পর্যন্ত মুক্তাদীগণ কোনো কথাবার্তা বলতে পারবেন না।

সালাতুল কসর বা সফরের নামায

নিজের বাড়ী হতে গন্তব্যস্থান মধ্যম গতির পদব্রজে তিন দিবারাতি বা ৪৮ মাইল পরিমাণ ব্যবধান হলে শরী'আতে এমন 'প্রবাস'-কে সফর বলা হয়। সফরের নিয়ত করে যে ব্যক্তি এরূপ দূরদেশে যান তাঁকে মুসাফির বলা হয়। মুসাফির ব্যক্তি যে পর্যন্ত নিজ বাড়ীতে ফিরে না আসেন সে পর্যন্ত যোহর, আসর ও এশা এ তিন সময়ে চার রাকা'আত ফরয নামাযের স্থলে দু রাকা'আত পড়বেন। একে কসর বা সংক্ষিপ্ত নামায বলা হয়। সফরের মধ্যে

www.pathagar.com

মুসাফির কোনো স্থানে ১৫ দিন বা অতিরিক্ত কাল বাস করার নিয়ত করলে সেখানে স্থায়ী গৃহবাসীর ন্যায় চার রাকা'আত নামায পড়বেন। কিন্তু বসবাসের নিয়ত না করলে কোনো স্থানে ১৫ দিন বা তার অধিক সময় থাকলেও তিনি মুসাফিরের ন্যায় নামায পড়বেন। জামা'আতের নামাযে মুসাফির স্থায়ী বসবাসকারী ইমামের পিছনে মুক্তাদি হলে তিনি ঐ স্থায়ী বসবাসকারীর ইমামের সাথে পূর্ণ চার রাকা'আতই পড়বেন। কিন্তু মুসাফির জামা'আতের নামাযে ইমাম হলে তিনি দু রাকা'আত পড়ে সালাম ফিরাবেন, আর তার পিছনের স্থায়ী বাসিন্দা মুক্তাদিগণ তখন সালাম না ফিরায়ে দাঁড়িয়ে বাকী দু রাকা'আত পড়বেন। স্থায়ী অবস্থার কাযা নামায সফরে পড়লেও চার রাকা'আত পড়তে হয়। আর মুসাফির অবস্থার কাযা নামায গৃহে ফিরলেও দু রাকা'আত পড়তে হয়।

❐

www.pathagar.com

২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার সন ও তারিখ

পাঁচ ওয়াক্ত নামায কত সালে কোন্ তারিখে মানব জাতির ওপর ফরয বলে ঘোষণা করা হয় তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। এ ব্যাপারে দশজন ঐতিহাসিকের দশটি সিদ্ধান্ত আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই। যেমন ঃ

১. হযরত মুহাম্মাদ স.-এর মক্কা হতে মদীনায় হিজরতের ছয় মাস পূর্বে।

২. হিজরতের আট মাস পূর্বে।

৩. হিজরতের ১১ মাস পূর্বে।

৪. হিজরতের এক বছর পূর্বে।

৫. হিজরতের দুমাস পূর্বে।

৬. হিজরতের তিন মাস পূর্বে।

৭. হিজরতের এক বছর পাঁচ মাস পূর্বে।

৮. হিজরতের এক বছর ছয় মাস পূর্বে।

৯. হিজরতের তিন বছর পূর্বে এবং

১০. হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে নামায ফরয করা হয়েছিল।

উল্লেখ্য, হযরত মুহাম্মাদ স. ৬২২ খৃস্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর (ডঃ মাহমুদুল হাসান, ইসলামের ইতিহাস, পৃঃ ৫২) হিজরত করেছিলেন।

উপরোক্ত তথ্যগুলো ফাতহুল বারীতে মি'রাজ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত এই যে, হযরত খাদীজা রা.-এর মৃত্যুর পরে এবং ঐতিহাসিক আকাবার বায়আতের পূর্বে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়েছে। যেমন প্রথমোক্ত ৮টি বর্ণনায় ঐকমত্য রয়েছে যে, খাদীজা রা.-এর মৃত্যুর পরে যেহেতু মি'রাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে সেহেতু নামাযও তাঁর মৃত্যুর পরেই ফরয বলে ঘোষিত হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলামী জ্ঞান অধ্যয়নের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র লাহোরের জামেয়া আশরাফিযার তথা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তরজাতিক ইসলামী শিক্ষাবিদ ও গবেষক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস কান্ধলুভী তাঁর

www.pathagar.com

ডকুমেন্টারী গ্রন্থ 'সীরাতুল মুস্তফা'-এর ১ম খণ্ডে 'মি'রাজ অধ্যায়ে' উল্লেখ করেছেন যে, একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত খাদীজা রা. পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার পূর্বেই ইন্তিকাল করেন। তাছাড়া এটাও স্বীকৃত যে, হযরত খাদীজা রা. শিয়াবে আবু তালিবে রসূলুল্লাহ স.-এর সঙ্গিনী ছিলেন। শিয়াবে আবু তালিব থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তাঁর ইন্তেকাল হয়। রসূলুল্লাহ স. ও তাঁর সঙ্গিবৃন্দ শিয়াবে আবু তালিব থেকে নবুওয়াতের দশম বছরের শেষার্ধে বা একাদশ বর্ষের প্রথমার্ধে প্রত্যাবর্তনের পর কোনো এক মাসে মি'রাজ অনুষ্ঠিত হয়। তবে তা কোন্ মাসে হয়েছে এ বিষয়েও মতভেদ আছে। রবিউল আওয়াল, রবিউস সানী, রজব, রমযান ও শাওয়াল-এ পাঁচ মাসের কোনো এক মাসে নামায ফরয হয়েছে বলে বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়। তবে নির্ভরযোগ্য মত এই যে, রজব মাসের সাতাশ তারিখ (২৬ তারিখ দিবাগত রাত) প্রভাত লগ্নে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয ঘোষিত হয়। আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'শারহে মাওয়াহিব' ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা -৩০৭।

www.pathagar.com

৩. নামায ও মি'রাজ

নামাযের সাথে মি'রাজের এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায যেদিন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আখেরী জামানার মানুষের জন্য ফরয (compulsory) ঘোষণা করে দিয়েছিলেন সেদিন ছিল ঐতিহাসিক মি'রাজ রজনী। এ রজনীতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বান্দাহ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব (The Hundred Michel. H. Hart. দ্রঃ) এবং রসূল কূল শিরমণি মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ স.-কে সশরীরে মহাকাশ ভ্রমণ করিয়েছিলেন। সেখানে পার্থিব জগত, মৃত্যুর পরের জগত, আলমে বরযখ এবং রূহানী জগতের যাবতীয় সৃষ্টিরাজী, আল্লাহদ্রোহীদের করুণ পরিণতি, জান্নাতীদের সুখময় জীবন এবং রহস্যময় বিষয়াবলীর পরিপূর্ণ চাক্ষুস জ্ঞান নবী করীম স.-কে দান করেছিলেন। তাঁর সাথে সরাসরি বাক্যালাপ করেছিলেন, উম্মাতে মুহাম্মদীর জন্য উপহার স্বরূপ পাঁচ ওয়াক্ত নামায, সূরা আল বাকারার শেষাংশ এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ১৪ দফা মূলনীতি প্রদান করেছিলেন। (খন্দকার আবুল খায়ের—মি'রাজের তাৎপর্য ও বিভ্রান্তি অপনোদন, পৃষ্ঠা ৪১ তৌহীদ প্রকাশনী, আল ইত্তেহাদ সীরাতুন্নবী সংখা ১৯৮৬ইং, যুক্তির কষ্টিপাথরে মি'রাজ ও তার শিক্ষা অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ ছিফাতুল্লাহ পৃষ্ঠা ৭৬)

হিজরী প্রথম সালে (৬২২ খৃষ্টাব্দে) ২৬ রজব মাসের দিনগত রাতের শেষাংশে হযরত জিবরাঈল আ কয়েকজন ফেরেশতা সহ নবীর ঘরে অবরতণ করেন। নবী তখন উম্মেহানীর বাড়ীর একটি কামরায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। কেবল মাত্র তন্দ্রা তাঁকে আবিষ্ট করার চেষ্টা করছে। এ অবস্থায় জিবরাঈল আ. তাঁকে সালাম জানিয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্য জানিয়ে দিলেন এবং সাথে করে মাসজিদুল হারামের দিকে নিয়ে গেলেন। যমযম কূপের পাশে নিয়ে শায়িত করে সীনাচাক করলেন এবং যমযমের পানি দ্বারা হযরতের কলব (Heart) বের করে উত্তমরূপে ধৌত করলেন। ফেরেশতাদের আনীত সোনার তশতরী থেকে পরিপূর্ণ ঈমান ও হিকমাত নিয়ে তাঁর কলবে স্থাপন করলেন।

হযরতের এভাবে মোট ৪ বার সীনাচাক করানো হয়। প্রথমবার হালিমার ঘরে থাকাকালে ৪ বছর বয়সে, দ্বিতীয়বার ১০ বছর বয়সে, তৃতীয়বার ৪০ বছর বয়সে এবং মি'রাজের রজনীতে (পরশমণি পৃষ্ঠা ৫৬)। কুরআনকে ধারণ করার ক্ষমতা অটুট রাখার জন্য, বিরাট নবুওয়াতি

www.pathagar.com

দায়িত্ব সঠিকভাবে প্রতিপালনের জন্য এবং মহাকাশ ভ্রমণের অসাধ্য সাধন করার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীন পূর্ব প্রস্তুতি স্বরূপ এভাবে তাকে পূর্ণ ক্ষমতাবান (Empowered) করেছিলেন। এরপর হযরতের মহাযাত্রা শুরু হলো। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে সাক্ষাতের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর মহান অতিথির যথোপযুক্ত সম্মান প্রদানের জন্য মক্কা থেকে মদীনা, মদীনা থেকে সীনাই পাহাড়, সীনাই পাহাড় থেকে মাদায়েন, মাদায়েন থেকে জেরুসালেমের বায়তুল মোকাদ্দাস এবং বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কোটি কোটি ফেরেশতা নিয়োগ করেছিলেন, গমন পথের দু ধারে গার্ড অব অনার (Guard of Honour) প্রদানের জন্য। নবী-রসূলদের রূহ যারা তাঁর পূর্বে পৃথিবীতে এসেছিলেন তারাও শ্রেষ্ঠ নবীকে সাদর সম্ভাষণ জানানোর জন্য বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত নেমে এসেছিলেন এবং বিশ্ব নবীর পিছনে দু' রাকাআত নামায পড়ে নিজেদেরকে ধন্য করেছিলেন। মীর রহমত আলী তাঁর পরশমণি গ্রন্থের 'নূরুল্লাহ বনাম নূরনবী' অধ্যায় ৫৭ পৃষ্ঠায় এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন ঃ

হিজরতের কিছুকাল আগে রজব মাসের ২৭ তারিখ নিশীথে মাবুদের বাণী ঝংকৃত হয়। হে রিদওয়ান! (জান্নাতের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা) আজ জান্নাতকে অভিনব সাজে সজ্জিত করো। নিখিল বিশ্বের প্রেমাস্পদ তশরীফ আনছেন। রুহুল আমীন হযরত জিবরাঈল (আ) সংবাদদাতা ফেরেশতার প্রতি আদেশ হয়—'যাও বোররাক সহ কা'বার হেরেমে অবতরণ করো। তাজিম ও তসলিমের সাথে নিয়ে এসো আমার হাবীবকে। পথে তোমার কাছে তিনি যা যা জানতে চান এবং তুমি যা যা জানো অকপটে তাঁকে বলো। আলমে আমরের ফেরেশতাদের প্রতি আদেশ হয়—'আজ সব কাজ বন্ধ রাখো। আমার মহান অতিথি আসছেন। তাঁর গমন পথে জৌলুশ করো। সবাই সিদরাতুল মুনতাহায় সমবেত হয়ে তাঁর জামাল ও কামাল দর্শন করে চরিতার্থ হও। আলমে খালকের ফেরেশতাদের প্রতি আদেশ হয়—'পানি ও মাটির কাজ বন্ধ রাখো। স্থান ও কালকে স্থির (গতিশূন্য) করে দাও। ব্যবধানের পর্দা ছিন্ন করো। দর্শন, শ্রবণ ও কথোপকথনের বিধি রহিত করে দাও। আকাশের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করে আমার প্রিয়তম বন্ধুর তাজিমের জন্যে সেখানে দাঁড়িয়ে যাও।'

নিশি রাত, চারদিক নীরব, সবাই সুপ্ত। নূরনবী স. ওযু করে বোররাকে[১] আরোহণ করতে এগিয়ে যান। বোররাক তাজিমের সাথে মহান অতিথি ও

১. বোররাক একটি জান্নাতি জানোয়ারের নাম। আকারে খচ্চরের থেকে কিছু ছোট আর গাধার থেকে কিছু বড়, রং সাদা, চলার গতি বিদ্যুত অপেক্ষা দ্রুততর।

www.pathagar.com

ফেরেশতাকে পিঠে নিয়ে উড়ে চলে। কিছুদূর অগ্রসর হতেই খেজুর গাছের বিথিকায় সমাচ্ছন্ন এক প্রান্তর পথে হযরত জিবরাঈল আ. বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, এ স্থানটির নাম 'ইয়াসরিব', অচিরেই আপনি এখানে হিজরত করবেন এবং এখান হতেই ইসলামের আলো তামাম জাহানে ছড়িয়ে পড়বে। তৎক্ষণাত বোররাক থামিয়ে হুযুর স. এখানে দু রাকা'আত নামায আদায় করে নেন। শাদ্দাদ বিন আওস রা. থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "আমি যখন পথিমধ্যে অধিক খেজুর গাছ সম্বলিত জায়গা অতিক্রম করে যাচ্ছিলাম, তখন জিবরাঈল আ. আমাকে বললেন এখানে নেমে নামায আদায় করুন। আমি নেমে নামায আদায় করলাম। জিবরাঈল আ. বললেন, আপনার কি জানা আছে আপনি কোন্ জায়গায় নামায আদায় করলেন ? আমি বললাম, না আমার জানা নেই। জিবরাঈল জানালেন আপনি ইয়াসরিবে (মদীনায়) নামায আদায় করেছেন। সেখানে আপনি অদূর ভবিষ্যতে হিজরত করবেন। এরপর অন্য একটি ভূখণ্ডে উপনীত হলাম। তখন জিবরাঈল আ. বললেন, এখানে নেমে নামায আদায় করুন। আমি নামায আদায় করলাম। জিবরাঈল আ. জানালেন আপনি সীনাই উপত্যকা মূসা আ.-এর সেই গাছের নিকট নামায আদায় করেছেন যেখানে আল্লাহ রব্বুল আলামীন মূসা আ.-এর সাথে কথা বলেছেন। পরে অন্য একটি ভূখণ্ডে গিয়ে উপনীত হলাম। জিবরাঈল আ. বললেন, এখানে নেমে নামায আদায় করুন। আমি নামায আদায় করলাম। জিবরাঈল আ. জানালেন আপনি মাদায়েনে নামায আদায় করেছেন। এখানে (নবী) শুআয়িব আ. বসবাস করতেন। সেখান থেকে রওয়ানা দিয়ে আরেকটি ভূখণ্ডে পৌছলে জিবরাঈল আ. বললেন, এখানেও নামায আদায় করুন। পরে আমি নামায আদায় করলাম। তখন তিনি বললেন এটা বায়তুল লাহম। এখানে ঈসা আ. জন্ম গ্রহণ করেন।"

এ একই ঐতিহাসিক ঘটনা প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, ঐতিহাসিক ও হাদীস শাস্ত্র বিশারদ ইমাম আবি হাতিম ইমাম, বাযযার, ইমাম বায়হাকী ইমাম তাবরানী এবং ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেছেন।–(আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'আল কাসায়েসুল কুবরা' ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৩ এবং যুরকানী লিখিত 'শরহে মাওয়াহিব'-এর ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৯)।

বোররাক পুনরায় উড়ে চলে। এ সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 'আলমে বরযখের' কতকগুলো ঘটনা প্রিয়তম নবীর সামনে তুলে ধরেন। তিনি এক স্থানে গিয়ে দেখতে পান এক শ্রেণীর মানুষ (কওম) মাটিতে বীজ বুনার সাথে সাথেই তা পেকে উঠছে এবং তারা তা মহানন্দে কাটতেও শুরু করে

www.pathagar.com

দিয়েছে। জিজ্ঞেস করলে ফেরেশতা বলেন এরা শহীদ শ্রেণীর লোক। আল্লাহ্ কতো শীঘ্রই তাদেরকে কর্মফল দিয়ে তৃপ্ত করবেন এটা তারই বহিঃপ্রকাশ ও নমুনা।

আর একটু এগোতে অপূর্ব খোশবাসে হুযুর স.-এর মনপ্রাণ মোহিত হয়ে যায়। জিজ্ঞেস করেন ভাই জিবরাঈল! এ মনমাতানো সুগন্ধ আসছে কিসের ? জিবরাঈল বলেন এটা বিবি আছিয়ার অনিন্দ্য ঈমানের সুগন্ধ। কাফের স্বামী ফিরাউনের নির্মম অত্যাচারেও তাঁর ঈমান বিন্দুমাত্র টলেনি।

আর কিছুদুর যেতেই ডানদিক থেকে ডাক আসতে থাকে 'মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ দাঁড়াও দাঁড়াও। শুনে যাও।' হুযুর জিজ্ঞেস করলেন, এ বেতমিজ লোকগুলো কারা ? এমনভাবে আমাকে ডাকছে ? জিবরাঈল আ. বলেন "আপনি ওদের ডাকে সাড়া দিবেন না।" এরা অভিশপ্ত ইয়াহুদী জাতি। উত্তর দিলে আপনার উম্মাতও ইয়াহুদী হয়ে যেতো।

এমন সময় বামদিক থেকেও অনুরূপ ডাক আসতে থাকে। হুযুর স. কোনো উত্তর দিলেন না। জিবরাঈল আ. বললেন, এরা ভ্রান্ত খৃস্টান জাতি। উত্তর দিলে আপনার উম্মাতও খৃস্টান হয়ে যেতো।

আর একটু এগিয়ে যেতেই এক মনোমোহনী যুবতী নারী নূরনবী (স)-এর পথরোধ করে দাঁড়ায়। খিল খিল করে হাসতে হাসতে চারদিক কাঁপিয়ে তোলে। বলে হে নবী! আমি আপনাকে খুব ভালোবাসি। তিনি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলীয়্যিল আজীম বলে মুখ ফিরিয়ে নেন। ফেরেশতা বলেন হুযুর! এটা দুনিয়া। এর দিকে চাইলে আপনার উম্মাতও অন্যান্য জাতির ন্যায় দুনিয়া ভক্ত হয়ে উঠতো। অন্যসূত্রে জানা যায় ওটা ছিল শয়তান।

তারপর বোররাক একটি জামায়াতের নিকটবর্তী হতেই তাঁরা সমস্বরে বলতে থাকেন, আস্সালামু আলাইকা ইয়া আউয়ালু, আস্সালামু আলাইকা ইয়া আখিরু, আস্সালামু আলাইকা ইয়া হাশিরু, আস্সালামু আলাইকা ইয়া শাফীয়্যিউ—হে প্রথম (সৃষ্টি) আপনার প্রতি সালাম। হে শেষ নবী! আপনার ওপর সালাম। হে বান্দাহদেরকে একত্রকারী! আপনার ওপর সালাম। হে মুক্তির জন্য শাফায়াতকারী! আপনার ওপর সালাম।

নূরনবী স তাঁদের সালামের জবাব দিয়ে জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করেন, এতো ভদ্র এরা কারা ? জিবরাঈল বলেন, এরা নবী-রসূল ও অলী আওলিয়াগণের রূহ যাঁরা আপনার এই মহান সফরকে স্বাগত জানাতে

www.pathagar.com

এসেছেন।-(আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'আল খাসায়েসুল কুবরা' ১ম খণ্ড ১৫৫ পৃষ্ঠা এবং তাফসীর ইবনে কাছীর ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা-৬)।

অতপর পথ অতিক্রম করার সময় নবী করীম স. দেখতে পান একটি সম্প্রদায় কাঠ কুড়াতে কুড়াতে পাহাড় গড়ে তুলেছে। তবু আরো কাঠ পেতে হন্যে হয়ে ঘুরছে। তিনি জিবরাঈল আ.-কে জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা ? জিবরাঈল আ. বললেন, এরা উম্মাতে মুহাম্মাদীর দাবীদার ধনলিপ্সু ব্যক্তিগণ।

এদের ছাড়িয়ে যেতেই একদল লোকের বেদনাদায়ক কাজ দেখে বিশ্বনবী স. আঁতকে উঠে জিজ্ঞেস করেন, এরা কারা ভাই ? এ কি কাণ্ড করছে। জিবরাঈল আ. বললেন, এরা আপনার গাফেল উম্মাত। নামায যে কি অমূল্য ধন ছিল তা এখন বুঝতে পেরে আফসোসে নিজেদের মাথা নিজেরাই পাথর মেরে ভেঙে দিচ্ছে। সাথে সাথে তা আবার গড়ে উঠছে। আবার চূর্ণবিচূর্ণ করে দিচ্ছে।

আর কিছুদূর যেতেই নবী করীম স. একদল স্ত্রী-পুরুষের লজ্জাকর উলঙ্গ অবস্থা দেখে মুখ ফিরিয়ে নেন। তিনি জিবরাঈল আ.-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'এরা কারা ? কী অপরাধে ওরা লজ্জাস্থান ঢাকতে পারছে না ? জিবরাঈল বললেন এরা সেই স্বামী-স্ত্রী যারা ঘরে হালাল স্ত্রী রেখে বাইরে গিয়ে পর-নারীর সাথে ব্যভিচার করেছে। আর যেসব স্ত্রীলোক স্বামী থাকা সত্ত্বেও বাইরে পর-পুরুষের অভিসারে বেরিয়ে গেছে, এরা তারা।

আরো সামনে গিয়ে নবী করীম স. শিউরে ওঠেন। একদল লোক বড় বড় তামার নখ দিয়ে আঁচড় কেটে কেটে নিজেদের বুক মুখ ছিড়ছে। আবার তা পূর্বের ন্যায় গড়ে উঠছে আবার ছিড়ছে।। জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন এরা আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্নকারী ও স্বগোত্রীয় লোকদের প্রতি নির্মম ব্যবহারকারী লোক।

আর একটু যেতেই দেখেন, কতকগুলো লোক ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে মরা মানুষের গোশত খাচ্ছে। খেতে না চাইলেই ফেরেশতারা মুগুর মারছে। চীৎকার করে কেঁদে কেঁদে আবার তা খাচ্ছে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন, এরা চোগলখোর লোক (গীবতকারী) ।

পথের মধ্যে আরো দেখেন, কিছু লোক নদীতে সাঁতরাচ্ছে এবং লোকমা বানিয়ে পাথর খাচ্ছে। তখন রসূল স. জিবরাঈলকে প্রশ্ন করলে তিনি জানালেন, এরা সুদখোর। (গবেষক হাদীস শাস্ত্রকার ইবনে মারদুইয়া এ হাদীসটি সামুরা ইবনে জুনদুবের রেফারেন্সে বর্ণেনা করেছেন।)

www.pathagar.com

এরপর নবী করীম স. এমন একটি সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করলেন, যাদের লজ্জাস্থান অগ্র পশ্চাতে আটকিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তারা উট ও গরুর মত চলছে ! "যরীয়, যাক্কুম" (কাঁটা ও জাহান্নামের পাথর) খাচ্ছে। তখন তিনি জিবরাঈল আ.-কে প্রশ্ন করলে জানতে পারেন, "এরা নিজেদের সম্পদের যাকাত আদায় করতো না।"

তিনি এরপর একটি লাকড়ীর স্তুপ অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, সেখান দিয়ে গেলে পথচারীর কাপড় ছিড়ে ফেলে এবং শরীর ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। তিনি জানতে চাইলে জিবরাঈল বললেন, "এরা আপনার উম্মাতের সেই লোকদের উদাহরণ যারা চুপ করে রাস্তায় বসে থাকে আর পথিকদের মালামাল ডাকাতি ও ছিনতাই করে।"

এরপর তিনি আরেকটি সম্প্রদায় অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, সেখানে দেখা গেলো এক ব্যক্তি লাকড়ীর এক বিরাট স্তুপ করছে। অথচ তা উঠানোর তার শক্তি নেই। তারপরও এত লাকড়ী জমা করছে। রসূল স. জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এ আপনার উম্মাতের সেই লোক, যার উপর মানুষের হক ও আমানত ছিল, সে তা আদায় করেনি। এজন্য তাকে এ বোঝা বহনের শাস্তি দেয়া হচ্ছে। একটু পরেই তিনি আরেকটি সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হলেন। তাদের জিহবা ও ঠোঁট লোহার কাঁচি দিয়ে কেটে দেয়া হচ্ছে এবং যখনই কাঁটা হচ্ছে তখনি তা সাথে সাথে পূর্বের ন্যায় জোড়া লেগে যাচ্ছে। এমন ক্রমাগত কাটা হচ্ছে অন্তহীনভাবে। রসূল স. জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা ? জিবরাঈল আ. বললেন, "এরা আপনার উম্মাতের মধ্যে সেই সব খতীব ও বক্তা যারা অপরকে নসীহত করতো। পক্ষান্তরে নিজে আমল করতো না। ইবনে জরীর বায্যার আবুইয়ালা, বায়হাকী থেকে বর্ণনা করেন। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'আল খাসায়েসুল কুবরা' গ্রন্থের ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ১৭২ এবং যুরকানী ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা ৪১)।

এরপর বোররাক এক বিস্তীর্ণ ফুলবাগিচায় এসে পড়ে। সেখানে ফুরফুরে হাওয়া বইছে। ফুলের সুবাস ছুটছে। দোয়েল, কোয়েল, ময়না, বুলবুলির মোহন কুজনে স্বর্গীয় আবেশ ছড়িয়ে পড়ছে। সবকিছু ছেপে শোনা যাচ্ছে নারী কণ্ঠের মিনতি—ওগো প্রভু! আপনার ওয়াদা তো নড়চড় হয় না। কিন্তু এ কি, কে আমাদের স্বামীগণ ? দেখুন তো আপনারই রহমত ও বরকতে ভরতে ভরতে দুধ, মধু শরাবান তহুরা পেয়ালা ভরে উপছে পড়ছে। বাগে বাগে ফুলেরা সেথায় সুবাস ঢালছে। গাছে গাছে ছেব, নাসপতি পেকে পেকে ঝরে পড়ছে। কতো করে মহলটিকে নয়া সাজে সাজাচ্ছি। বলুন

www.pathagar.com

তো, মণি-মুক্তার আসন, আবকারী বাসন কোসন, স্বর্ণ-রৌপ্যের তশতরী কুজা দস্তাদার-হীরামতির ইস্তাবরাক নিত্য-নতুন করে নেড়ে নেড়ে কতো আর সাজাই। সাজ খুলি সেজে সেজে কতো আর দিক বলাকায় তাকাই। প্রভু আর কতকাল এভাবে যাবে ?

প্রভুর বাণী ঝংকৃত হয়। তোমরা আমার আদরের সৃষ্টি। আমার আদরের বান্দারা এই এলো বলে।

হুরগণ বলছে শুকরিয়া।

এরপর বোররাক এমন একস্থানে গিয়ে উপনীত হয় যে, নূরনবী স নাকে-মুখে কাপড় গুজেও অস্থির হয়ে ওঠেন অসহ্য দুর্গন্ধ ও অত্যধিক তাপে। জিবরাঈল আ. বলেন, হুযুর! এটা জাহান্নামের দুর্গন্ধ ও তাপ। কিন্তু জাহান্নাম এখান থেকে এখনো প্রায় পাঁচশো বছরের পথ দূরে আছে। হুযুর স. আফসোস করে বলেন হায়রে জাহান্নামবাসী এতো কষ্ট সইবে কী করে।

এমন সময় নবী করীম স. অত্যন্ত বিরক্তিবোধ করতে থাকেন। অতীব কর্কশ বেসুরো কণ্ঠে অনুযোগ ভেসে আসতে থাকে। "আয় আল্লাহ! তোমার জবান কেন এমন ? কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। আমরা তো সইতে পারছিনে জাহান্নামের অত্যাচার। জাহান্নাম তার লেলিহান জিহবা লেলিয়ে দিয়ে (পাপীদের না পেয়ে) আমাদেরই চাটতে শুরু করেছে। আগুনের তাক ও শিকলগুলো উত্তাপে লাল হতে হতে গলে যাচ্ছে। জাহান্নামের তলায় দরীগাছগুলো যাক্কুমের ভারে নুইয়ে পড়ছে। আমরা নিত্য হাত ভাজাই। গুর্জ কাঁধে এগিয়ে যাই। কই তোমার পাপীদেরকে পাইনে তো।

প্রভু আল্লাহ রব্বুল আলামীনের বাণী ঝংকৃত হয়। থাকো আর কিছুটা দিন। আমি ধরবো ওদেরকে শীঘ্রই শাঁড়াশী হাতে।

বায়তুল মোকাদ্দাসে অবতরণ

এতোক্ষণে বোররাক এসে পৌঁছে যায় বায়তুল মুকাদ্দাসে। মহানবীর ভ্রমণের এটুকু কথা আল কুরআনে উল্লেখ আছে—

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ط

"পবিত্র তিনি, যিনি এক রাতে তাঁর বান্দাকে মসজিদে হারাম থেকে দূরবর্তী সেই মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে গেলেন যার চারপাশে তিনি বরকত

www.pathagar.com

দান করেছেন—যেন তাকে নিজের কিছু নিদর্শনাদি পর্যবেক্ষণ করাতে পারেন।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১

পবিত্র ও মহিমাময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন, যার পরিবেশ আমি বরকতময় করেছিলাম তাঁকে আমার নির্দশনসমূহ দেখানোর জন্য।

নবী করীম স বায়তুল মোকাদ্দাসে পৌঁছেই বোররাক থেকে অবতরণ করেন এবং বোররাকটি সেই পাথরের সাথে বাঁধেন যে পাথরের সাথে ইতিপূর্বেকার নবী-রসূলগণ তাঁদের সওয়ারী বাঁধতেন। পাথরের ছিদ্রটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হযরত জিবরাঈল আ. আঙুল দিয়ে উক্ত ছিদ্রটি পরিষ্কার করেন। হযরত জিবরাঈল আ. নবী করীম স.-কে নিয়ে মসজিদুল আকসায় প্রবেশ করেন এবং দু' রাকাআত (দুখুলুল মসজিদ) নামায আদায় করেন (ইফা. মা. প. মার্চ/১৯৮৫ পৃঃ ২১৮ বায়হাকী, তাফসীরে ইবনে কাছীর ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা ৩০২)।

এদিকে মসজিদুল আকসায় রসূলুল্লাহ স.-এর শুভাগমন উপলক্ষে আম্বিয়ায়ে কিরামের রূহ সমূহ তাঁর জন্য অপেক্ষমান ছিলেন। এদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম আ., হযরত মূসা আ., ও হযরত ঈসা আ. প্রমুখ নবীগণ ছিলেন অন্যতম (যুরকানী ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা ৫।) কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেক ফেরেশতা এসে মসজিদুল আকসায় সমবেত হন। রসূল স. বলেন, আমরা কাতারবদ্ধভাবে দাঁড়ালাম। সবাই অপেক্ষারত ছিলেন—এ জামাতে কে ইমামতী করবেন ? এমন সময় জিবরাঈল আ. আমাকে হাত ধরে সামনে বাড়িয়ে দিলেন। আমিই নামাযে ইমামতি করলাম। যখন আমি নামায শেষ করলাম, জিবরাঈল বললেন, আপনি যাদের ইমামতি করেছেন তারা কারা আপনি জানেন কি ? আমি বললাম, জী-না। জিবরাঈল আ. বললেন, দুনিয়ায় যে সমস্ত নবী-রসূল প্রেরিত হয়েছিলেন তাঁরা সবাই আপনার পেছনে নামায (সালাত) আদায় করেছেন।–ইফা. মা. প. মার্চ/ ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ২২৯।

উপরোক্ত হাদীসটি ইবনে আবী হাতিম হযরত আনাস রা.-এর রেফারেন্স দিয়ে উদ্ধৃত করেছেন। এ হাদীসটি একটু অন্যভাষায় ইবনে জারীর, বায্যার, আবু ইয়ালা, বায়হাকী প্রমুখ প্রখ্যাত হাদীস শাস্ত্রকার আবু আলীয়া থেকে হযরত আবু হুরাইরা রা.-এর রেফারেন্সে উদ্ধৃত করেছেন।

মুহাম্মাদ স. যখন নামায সম্পন্ন করে মসজিদের বাইরে তশরীফ নিলেন তাঁর সামনে তিনটি পেয়ালা পেশ করা হলো ঃ প্রথমটি পানির, দ্বিতীয়টি

www.pathagar.com

দুধের এবং তৃতীয়টি শরাবের। তিনি দুধের পেয়ালাটি তুলে নিলেন। জিবরাঈল আ. বললেন, হে রসূল! আপনি দীন-ই ফিতরাত গ্রহণ করলেন। যদি আপনি শরাব গ্রহণ করতেন তবে আপনার উম্মাত গোমরাহ হয়ে যেতো। আর যদি পানি গ্রহণ করতেন আপনার উম্মাতের ভাগ্য বিপন্ন হয়ে যেতো।–যুরকানী ৬ষ্ঠ খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ৪৭।

মহাকাশে মালাউল আ'লায় গমন

অতপর সম্মিলিত রূহের মজলিসে নাতিদীর্ঘ এক ভাষণ দিয়ে হুযুর স. বোররাকে চড়ে উর্ধদিকে যাত্রা করেন। উপস্থিত পয়গম্বর ও অলি আউলিয়াগণের রূহ তাঁকে সালাম ও তসলিম দ্বারা সম্ভাষণ জানান। সাথে সাথে বোররাক বিজলীর চেয়েও দ্রুত গতিতে উর্ধাকাশে অদৃশ্য হয়ে যায়। —এ সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১০।

প্রথম আকাশের প্রধান ফেরেশতা আগেই সেখানকার অগণিত সুসজ্জিত ফেরেশতাগণকে নিয়ে এ আকাশের সদর গেট 'বাবুল আফাযায়' অপেক্ষা করছিলেন। হুযুর স.-এর বোররাক অদৃশ্য হওয়া মাত্র ফেরেশতাগণ সমস্বরে সালাম জানাতে থাকেন।

অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে অগণিত ফেরেশতা মিছিল করে তাঁকে প্রথম আকাশের ওপর নিয়ে যান। সেখানে পৌঁছতেই হযরত আদম আ.-এর সাথে তাঁর চোখাচোখি ও সালাম-কালাম বিনিময় হয়। এর মধ্যে আল্লাহর রসূল স. লক্ষ করেন, বাবা আদম আ. ডান দিকে তাকিয়ে হাসছেন এবং বাম দিকে তাকিয়ে কাঁদছেন। এর কারণ কি জিজ্ঞেস করলে হযরত জিবরাঈল আ. বললেন, আপনার অবগতির জন্য আল্লাহ আজ জগতের যাবতীয় নেক ও বদদের রূহ এনে হযরত আদম আ.-এর ডানপাশে ও বাম পাশে জমা করে দিয়েছেন। ডান পাশে জান্নাতীদের দেখে তিনি হাসছেন ও বামপাশে জাহান্নামীদের দেখে কাঁদছেন।

অতপর বোররাক দ্বিতীয় আসমানের দিকে উড়ে যায়। সেই শূন্যমণ্ডলে শ্রুত হতে থাকে গভীর নিনাদে সুমহান কালেমায়ে তাইয়্যেবা। জিজ্ঞেস করলে জিবরাঈল আ. বলেন, আরশে মোয়াল্লার হাশিয়াতে এ কালেমা শরীফ খোদাই করা আছে। সেখানে আপনা থেকেই এ কালেমা ধ্বনিত হচ্ছে এবং তা সমগ্র সৃষ্টি জগতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ক্রমে বোররাক দ্বিতীয় আসমানের কাছে পৌঁছে যায়। তাঁকে দর্শন মাত্র প্রথম আকাশের চেয়ে

www.pathagar.com

অধিক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ফেরেশতাগণ অব্যক্ত আনন্দে আত্মহারা হয়ে সমস্বরে তাঁকে সালাম জানাতে থাকেন।

বিশ্বের হাসি জান্নাতের খুশী যাত্রী বে-নজির স্বীয় ইলাহীর দীদার পিয়াসী নবী স. ফুলেল হাসিতে উঠে আসেন। দ্বিতীয় আকাশের ওপর। সাথে সাথে হাসি মুখে এগিয়ে আসেন হযরত ইয়াহ্ইয়া ও হযরত ঈসা আ.। তার সাথে সালাম-কালাম ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর নূরনবী স.-এর বোররাক তৃতীয় আকাশের দিকে ধাবিত হয়। সেই আকাশের সুসজ্জিত সদর গেটের নিকটবর্তী হতেই সেখানকার অভূতপূর্ব সুবেশধারী অগণিত ফেরশেতা সমস্বরে সালাম জানাতে থাকেন।

আখেরী রসূল হাবীবে জান্নাতী বুলবুল তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে আসেন তৃতীয় আসমানে। নূরনবী স. এখানে বোররাক থামিয়ে নামতেই তাঁকে ইস্তেকবাল জানাতে এগিয়ে আসেন সৃষ্টি সেরা রূপবান নবী হযরত ইউসুফ আ তাঁর কাওমের লোকজন নিয়ে। তাঁদের সাথে শুভেচ্ছা ও কালাম বিনিময়ের পর বোররাক মহানবী স.-কে নিয়ে চৌঠা আসমানের দিকে নিমিষে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে তাঁদের বাহন বোররাক চৌঠা আসমানের অতি সন্নিকটে পৌছে যায়। সেখানকার বেশুমার বুযুর্গীর অধিকারী অত্যাশ্চর্য মনোরম সুবেশধারী ফেরেশতাগণ তাঁকে অতুলনীয় তাজীম ও তোয়াজের সাথে চৌঠা আসমানে আগবাড়িয়ে নিয়ে যায়। তন্মধ্যে হযরত ইদ্রিস আ।

তাঁর সাথে প্রীতি ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর মহানবী স.-কে যখন সেই আকাশের অব্যক্ত দৃশ্যাদি অবলোকন করানো হয়, তখন তিনি সেই আকাশের অপরিসীম সৌন্দর্য ও বিস্ময়কর বিষয়রাজি দর্শনে খুশীতে হতবাক হয়ে যান।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন, 'আচ্ছা আপনি কান পেতে শুনুন তো এ দুনিয়া থেকে কিসের ধ্বনি উঠছে?'

বিশ্বনবী স. শুনতে পান, সে দুনিয়ার চতুর্দিক হতে তাকবীর, তাহমীদ, তাসবীহ ও আখেরী নবীর ওপর দরূদ শরীফ পাঠের অমিয় ধ্বনি ভেসে আসছে। অতপর তিনি উৎফুল্ল মনে প্রভুর হামদ গাইতে গাইতে বোররাকে চড়ে বসেন। বোররাক পঞ্চম আসমানের দিকে উড়ে যায়। আগের চেয়েও বেশী তাজীম ও তাকরীমের সাথে বিশ্বনবী স. ক্রমে পঞ্চম আসমান পেরিয়ে ৬ষ্ঠ আসমানে পৌছলে হযরত মূসা ও হারুন আ.-এর সাথে সাক্ষাত ও

www.pathagar.com

মত বিনিময়ের পর সপ্তম আসমানে এসে উপনীত হন। এখানে অপরিমিত বুযুর্গীওয়ালা অগণিত ফেরেশতার তাজীম তোয়াজে বিশ্বনবী স. অত্যন্ত আবেগমুগ্ধ হয়ে পড়েন। তদুপরি বিশ্ববিশ্রুত নবী হযরত ইবরাহীম আ.-এর সাথে সাক্ষাত ও আলাপ পরিচয়ে তিনি যারপরনেই পরিতুষ্টি লাভ করেন। হযরত ইবরাহীম আ. তাঁকে লক্ষ করে বলেন, হে মাখলুকমণি! আপনার উম্মাতদের আমার সালাম জানিয়ে বলবেন, তারা যেন বেহেশতের গাছ খুব বেশী বেশী রোপণ করে। কেননা বেহেশতের মাটি অত্যন্ত পাক ও বেশুমার প্রশস্ত। লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলীয়্যল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, এগুলো বেহেশতের বাগিচার গাছ, যার সুস্বাদু ফলের কোনো তুলনা হয় না।

এভাবে একে একে ঊর্ধদিকে অবস্থিত সপ্ত আসমান পরিভ্রমণের পর আল্লাহর রসূল স. বেহেশতের দিকে যাত্রা শুরু করেন। বোররাক বিদ্যুত গতিতে ঊর্ধ দিকে উঠতে থাকে।

বেহেশত হচ্ছে আটটি। প্রত্যেকটি বেহেশত একটি হতে অপরটি ঊর্ধদিকে পাঁচশো বছরের পথ পরিমাণ ব্যবধানে অবস্থিত রয়েছে। প্রথম বেহেশত হতে উপরের দিকের বেহেশতগুলো ক্রমেই বেশী সুন্দর, বৃহৎ ও মর্যাদাসম্পন্ন। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ বেহেশতের নাম জান্নাতুল ফিরদাউস। এটা বহুতল বিশিষ্ট। এ বেহেশতের সর্বনিম্ন তলাও তার নিম্নস্থ সাতটি বেহেশতের যে কোনো বেহেশত হতে বেশী মনোরম ও জ্যোতির্ময়। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবার হতে এক নুরানী জ্যোতির্ময় ঘর উক্ত বেহেশতগুলো ভেদ করে সর্বনিম্ন বেহেশত 'জান্নাতুল খুলদ' পর্যন্ত নেমে এসেছে। এরই নাম বায়তুল মামুর। এ ঘরে ফেরেশতাগণ তাওয়াফ করেন ও নামায আদায় করেন।

বিশ্বনবী স.-এর বোররাক প্রথম বেহেশতের নিকটবর্তী হতেই সেই বেহেশতের অগণিত ফেরেশতা এগিয়ে এসে আগমনী-গাথা গাইতে গাইতে বিশ্বনবী স.-কে এগিয়ে নিয়ে যান। প্রথম বেহেশতে ঢুকে প্রথমেই তিনি বায়তুল মামুরে গিয়ে নামায আদায় করেন। বিশ্বনবী স. লক্ষ করেন যে, ঘরভর্তি একদল ফেরেশতা দু রাকাআত নামায আদায় করে বেরিয়ে আসতেই অপেক্ষমান অন্যদল ফেরেশতা ঘরে ঢুকে দু রাকাআত নামায আদায় করছেন। তারা বেরিয়ে আসতেই অন্যদল ঢুকছেন। ব্যাপার কি ? জিজ্ঞেস করলে হযরত জিবরাঈল আ. বললেন, সৃষ্টিকাল থেকে এ ঘরে এভাবে প্রত্যহ সত্তর হাজার (৭০,০০০) ফেরেশতা নামায আদায় করে

www.pathagar.com

আসছেন। অথচ একবার যাঁরা এ ঘরে দু রাকাআত নামায আদায় করেছেন, অনন্তকালের মধ্যে দ্বিতীয়বার আর তারা এ সুযোগ পাবেন না।

বিশ্বনবী স. বলেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কি পরিমাণ ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন তিনিই জানেন। অতপর যথাযোগ্য সম্মানে সবগুলো জান্নাত পরিদর্শন করে তিনি সিদরাতুল মুনতাহায় তথা সীমান্তের কুল বৃক্ষে গিয়ে উপনীত হন। এটা সর্বোচ্চ জান্নাত—জান্নাতুল ফিরদাউসের উপরতলা হতেও শত শত বছরের পথ পরিমাণ উর্ধদিকে অবস্থিত এবং সীমান্তের কুলবৃক্ষ বা বরই গাছ নামে কথিত গাছটিও অবস্থিত এখানে। এর বিস্তৃতি ও পাতার সংখ্যা বলার যো নেই। তবে এর পাতাগুলো এতো বড় যে, এর যে কোনো একটি পাতার ছায়াতেই তামাম উম্মতে মুহাম্মাদীর ঠাঁই হয়ে যাবে। এ গাছেরই গোড়া থেকে দুধ, মধু, আবেহায়াত ও শরাবান তহুরার চারটি নহর (ঝর্ণা) বেরিয়ে এসে নিম্নস্থ সবগুলো জান্নাতকে জালের মতো ছেয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। জান্নাতবাসীদের রূহের খোরাক হবে এ দুধ, সান্নিধ্যের সুধা হবে মধু, পিয়াসার শান্তি হবে আবেহায়াত ও তৃপ্তির তোহফা হবে শরাবান তহুরা। এছাড়া সালসাবিল নামে একটি শরবতের ঝর্ণা সর্বদা উৎসারিত হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নিকটতম বান্দাদের বাসস্থানে। এটা এতোই উপাদেয় পানীয় যে, আল্লাহ বলেন—

يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ○ خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ط وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَا فَسِ
الْمُتَنَافِسُوْنَ ○ وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ ○ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ○

"তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে। তার ওপর মিশক-এর মোহর থাকবে। যারা অন্যদের ওপর প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চায় তারা যেন এ জিনিসটি হাসিল করার জন্য প্রতিযোগিতায় জীয় হবার চেষ্টা করে। সে শরাবে তাসনীমের মিশ্রণ থাকবে। এটি একটি ঝরণা, নৈকট্যলাভকারীরা এর পানির সাথে শরাব পান করবে।"

–সূরা আল মুতাফফিফীন ঃ ২৫-২৮

'কাউসার' নামে আরো একটি অমিয় নহর বা ঝর্ণা প্রবাহিত হচ্ছে, খাস করে আমাদের বিশ্বনবী স.-এর বাসস্থানে। এ নহরের অমীয় ধারা হচ্ছে দুধ হতে সাদা, মধু হতে মিঠা, ও বরফ হতে আরামদায়ক ঠাণ্ডা খোশবুদার পানীয়।

রহমতের নহর নামে আরো একটি নহর আছে জান্নাতে খুলদের মধ্যে। যেসব পাপী লোক জাহান্নামের খাটনী শেষে ছুটি পেয়ে এ জান্নাতে

www.pathagar.com

আসবে। তারা উক্ত নহরে অবগাহন করে নিজেদের আগুনে পোড়া অঙ্গার চেহারা সুশ্রী সুন্দর করে তুলবে।-(আল কুরআন)। এরা তারা যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান থাকা সত্ত্বেও বাস্তব জীবনে আল্লাহর হুকুম আহকামকে অবহেলা করেছে এবং এ অবস্থায় পৃথিবী হতে বিদায় হয়ে গেছে।

যাক উক্ত 'সিদরাতুল মুনতাহা' দৃশ্যমান বস্তু জগতের (আলমে খালকের) নাভিমূলে (মধ্যস্থল) অবস্থিত। এর উপর থেকেই শুরু হয়েছে রহস্যময় জগত। উক্ত সিদরাতুল মুনতাহার উপর দিকে পাঁচশো বছরের পথ পরিমাণ দূরে দূরে উপরে উপরে ক্রমে সত্তর হাজার নূরের পর্দা (মাধ্যাকর্ষণ শক্তির শেষ সীমার ন্যায়) স্থিত আছে। এসব পর্দার অন্তর্গত আরশ, কুরছি, লওহ, কলম পর্যন্তই আলমে খালকের শেষ উর্ধসীমা। উক্ত কলমের উপর থেকে যে জগত শুরু হয়েছে ওটারই নাম আলমে আমর, বা রুহানী জগত। সেটা অদৃশ্যময় জগত। লা-মাকাম, লা-জামান, মাকামে মাশহুদ ও সর্বোপরি আল্লাহর খাস-দরবার সেই জগতের অন্তর্গত বলে কথিত। সিদরাতুল মুনতাহা হতে কলম পর্যন্ত জগতটা আলমে খালকের ফেরেশতাদেরও অগম্যস্থান। এটা দৃশ্যমান জগত না অদৃশ্যমান জগত একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনই জানেন। তবে কলমের উপরিস্থিত জগতটা হচ্ছে স্থান কাল পাত্র নামহীন অচল স্তব্ধ স্থবির অনন্ত জগত। সেটার শুরুও নেই শেষও নেই। এখানেই আমাদের আদি অন্তহীন আল্লাহ রব্বুল আলামীন এর খাস দরবার বা স্থিতি। সেখান থেকেই আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ সূচক বাণীসমূহ নেমে এসে উক্ত বরইগাছের পাতায় ভাস্কর হয়ে থাকে। তা দেখে ফেরেশতাগণ প্রভুর আদেশ পালন করেন। আর জগতবাসীদের যেসব আমল উপরে উঠে যায় তাও সেই বরইগাছের পাতায় ভাস্কর হয়ে থাকে। যাদের আমল যে কোনো দোষে দুষ্ট হয় তাদের আমল ততোদূরে পৌছায় না, মা'বুদ তা গ্রহণ করেন না। পৃথিবী উক্ত সাত আসমান এবং আট জান্নাতের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতারা কেউ ঐ সিদারাতুল মুনতাহার ওপরে যেতে পারে না। এজন্য তাঁরা সবাই মিলে সিদরাতুল মুনতাহায় বিশ্বনবী স.-কে বিদায় সম্ভাষণ জানাবার জন্য একত্রিত হন। আলীমুল গাইব আল্লাহ আগেই সেখানে বর্ণনাতীত এক দরবার গৃহ গড়ে রেখেছিলেন। সেই গৃহেই আল্লাহর হাবীবকে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। অগণিত ফেরেশতা আল্লাহর শান ও মহানবী স.-এর মাহত্ম বর্ণনায় সে স্থান মুখরিত করে তোলেন। আনন্দ ও আবেগে সবাই যেনো ফেটে পড়তে চান। ঠিক এমন সময় অভূতপূর্ব সবুজ জ্যোতি বিচ্ছুরিত করে উপর থেকে একটি নয়ন তৃপ্তিকর মনোমোহন রফরফ নেমে আসে। সেই দরবার গৃহের গেটে। সেইসাথেই

www.pathagar.com

নেমে আসেন এমন এক অভূতপূর্ব ফেরেশতা যাঁর সৌন্দর্য প্রভায় উপস্থিত অগণিত ফেরেশতাকে মলিন দেখা যেতে থাকে ডেলাইটের (Daylight) পাশে হারিকেনের মতো। তিনি এসেই অতীব মোহন কণ্ঠে আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া রসূলাল্লাহ বলে সালাম জানিয়ে বিশ্বনবীকে স. বলেন, হুযুর এ রফরফে আরোহণ করে তাশরীফ আনুন। আমি উর্ধাকাশে যাচ্ছি হুযুরের অভ্যর্থনার ব্যবস্থায়।

তদশ্রবণে হযরত জিবরাঈল আ. অতীব মলিন চেহারায় রোরুদ্যমান কণ্ঠে বলতে থাকেন। "ইয়া রসূলাল্লাহ ! এটাই আপনার মধুসাহচর্য হতে আমার বিচ্ছেদের শেষ সীমা। এ সিদরাতুল মুনতাহার একচুল উপরে উঠলেই আমার এবং আপনার বাহন বোররাকের পরগুলো আল্লাহর নূরের তাজাল্লীতে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যাবে। আপনার সাথে বিরহ বিচ্ছেদ আমি সইতে পারছি না। কিন্তু উপায় নেই যে, আপনার সাথে এর বেশি পথ এগোব। বিশ্বনবী স. বলেন, "আচ্ছা ভাই জিবরাঈল। একটু আগে যে ফেরেশতা এসেছিলেন, তুমি কি তাঁকে চিন ? হযরত জিবরাঈল আ. বলেন, আল্লাহর কছম আমি এই প্রথম তাকে দেখলাম।"

অতপর আল্লাহর রসূল স. সেই রফরফে চড়ে প্রভূর উদ্দেশ্যে উর্ধদিকে যাত্রা করেন। পথে আরশে মোআল্লা হুজুর স.-কে সালাম জানিয়ে তাঁর বস্ত্র খণ্ড জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। হে ভাগ্যবান নবী ! যে মা'বুদের দর্শন বিরহে কুলমাখলুক মুহ্যমান সেই মা'বুদ আপনার মিলনাকাঙ্ক্ষায় নিজেই আজ আগুয়ান। কখনো বা তিনি নিম্নাকাশে আপন জ্বলোয়া প্রকাশ করছেন। কখনো বা খাস দরবারে ঝংকার তুলেছেন। 'সুবহানাল্লাযি আসরা বি আবদিহি' কখনো বা আপন মহিমায় আপনি বলেছেন, 'মা কাযাবাল ফুয়াদু মা-রা-আ।' কখনো বা ছামাদিয়াতের জামাল প্রকাশ করে বলেছেন, 'মা যা-গাল বাসারু ওয়ামা তাগা।' কখনো বা অজানাকে জানিয়ে দিয়ে বলেছেন 'ফা আউহা ইলা আবদিহি মা আউহা।' আবার কখনো বা আশেকী মহল সাজিয়ে বলেছেন—'ফাকা-না ক্বাবা ক্বাওসাইনে আউ আদ্‌না।' আপনি মা'বুদের জন্যে আকুল, 'মা'বুদও আপনার জন্যে ব্যাকুল। কিন্তু আমি ? আমাকে মা'বুদ জিজ্ঞেসও করেন না একটু। আমি আরশ—আল্লাহর আসন জানি। আমি চিরকাল শুধু আসন হয়ে থাকবো তাও জানি। কেননা এমন অসীম আরশে কি মা'বুদ বসবেন ? এ শুধু সাজ। তাঁর সাজানোর তাজ। তাঁর অনন্ত কুদরতের রীতি। একটু কার্যকারণে প্রকাশিত হওয়ার কণিকা স্থিতি। নইলে আমার প্রভূবিরহ যাচ্ছে না কেন ? প্রভুর দোস্ত আপনি। তাই আপনাকে আমি জানাতে চাচ্ছি যে .....।

www.pathagar.com

কিন্তু হুযুর স.-এর এতো কথা শুনার অবসর কোথায় ? তিনি হাতছানিতে 'থামো' বলেই উর্ধাকাশে অদৃশ্য হয়ে যান। তারপর তাঁর বাহন ক্রমে ক্রমে কুরছি, লাওহে কলম, লা-মাকাম, লা-জামান ও মাকামে মাশহুদের সবগুলো নূরের পর্দা পার হয়ে আল্লাহর খাস-মাকামের পার্শ্বস্থ শেষ পর্দার গোড়ায় উঠে একদম থেমে যায়। এতোক্ষণ এক পর্দা ছাড়িয়ে আসতেই তার উপস্থিত পর্দার প্রহরী ফেরেশতাগণ এগিয়ে এসে তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে নিয়ে গেছেন। কিন্তু এখানে কেউ কেউ একটু খবরও নিচ্ছেন না। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ কেটে যায়। নিবেদিত প্রাণ নবী স.-ও একটু ঘাবড়ে যান।

এর একটু পরেই উর্ধস্থিত নূরের পর্দা ঠেলে বেরিয়ে আসেন সেই ফেরেশতা। যিনি তাঁকে সিদরাতুল মুনতাহায় দর্শন দিয়ে মি'রাজের পথে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এসেই তিনি সালাম জানিয়ে বলেন—ইয়া রসূলাল্লাহ। আমার সাথে পাঠ করুন, আমি আপনাকে আক্বামত শিক্ষা দিচ্ছি।"

আল্লাহর রাসূল তাঁর সাথে পড়তে থাকেন ঃ
আল্লাহু আকবার,
আল্লাহু আকবার,
আল্লাহু আকবার,
আল্লাহু আকবার।

পর্দার আড়াল হতে ঝংকৃত হতে থাকে ঃ
"সাদ্দাক্বতা, সাদ্দাক্বতা, সাদ্দাক্বতা, সাদ্দাক্বতা"

হুযুর (স) পাঠ করেন, "আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।"

পর্দার আড়াল হতে ধ্বনি উঠে।

"আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।"

হুযুর (স) পাঠ করেন ঃ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ

পর্দার আড়াল হতে আওয়াজ আসে ঃ

"আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ।"

www.pathagar.com

হুযুর (স) পাঠ করেন ঃ

"হাইয়্যালাস সালাতি, হাইয়্যালাস সালাহ"

পর্দার আড়াল হতে আওয়াজ আসে ঃ

"আক্কিমুস সালাতি, আক্কিমুস সালাহ। হাইয়্যালাল ফালাহি, হাইয়্যালাল ফালাহ।"

পর্দার আড়াল হতে আওয়াজ আসে ঃ

"আনাস সালামু, আনাস সালাম।"

অতপর ফেরেশতা অদৃশ্য হয়ে যায় এবং সেইসাথে উপর হতে এতো বেশী মনোরম এক রফরফ হুযুর স.-এর সামনে নেমে আসে। যার জ্যোতি প্রভায় আগের রফরফটি তলিয়ে যায়। সাথে সাথেই অব্যক্ত অমীয় সুরে আহ্বান আসে, আয় হাবীবী। আসুন। উঠে আসুন, এ রফরফে চড়ে আমার সান্নিধ্যে। আয় আশেক। আসুন আপনার আশেকের কাছে। বিশ্বনবী স. তৎক্ষণাৎ রফরফে চড়ে বসেন। রফরফটি তাঁকে চক্ষের পলকে প্রভুর পাশে পৌঁছিয়ে দেয়। প্রভুর দর্শন-আনন্দে বিহবল হয়ে বিশ্বনবী স. লুটে পড়েন, সিজদা দিয়ে গদগদেভাবে বলতে থাকেন ঃ

"আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্‌সালাওয়াতু ওয়াত্তায়্যিবাতু।"

মা'বুদের বাণী ঝংকৃত হয়।

"আসসালামু আলাইকা আইউহান্নাবিয়্যিউ ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বাকারাতুহ।"

হুযুর সিজদা থেকেই পাঠ করেন ঃ

"আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন।"

সাথে সাথে উপস্থিত সমস্ত ফেরেশতা বলে উঠে ঃ

"আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহু।"–পরশমণি পৃঃ নং ৭৪।

প্রভু-ভৃত্যে আলাপ আলোচনা চলে সুদীর্ঘ সময় ধরে। অভয় পেয়ে বিশ্বনবী নব্বই হাজার কালামের মারফত চাওয়া-পাওয়ার সব পর্বই শেষ করেন। তবু বিদায় বেলায় আরজ করেন। আয় মাবুদ! প্রত্যেক মুসাফির তার মুসাফিরী থেকে বাড়ী যাওয়ার বেলায় তার প্রিয়জনদের জন্য বিশেষ কোনো তোহফা নিয়ে যায়। এতো বড় দরবারে এসে আমি আমার প্রিয় উম্মাতদের জন্য তেমন বিশেষ তোহফা কী নিয়ে যাচ্ছি?"

www.pathagar.com

আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর পিয়ারে হাবীবের এ আবদার ও আকাংখা পূরণের জন্য তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় উম্মাতের মুক্তি ও শান্তির জন্য নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য তিনটি জিনিস প্রদান করেন।

১. পাঁচ ওয়াক্ত নামায
২. সূরা বাকারার শেষাংশ এবং
৩. শান্তি প্রতিষ্ঠার ১৪ দফা মূলনীতি।

পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মি'রাজের রাত্রিতে তোহফা স্বরূপ আল্লাহ রব্বুল আলামীন উম্মাতে মোহাম্মাদীর জন্য যে ১৪ দফা শান্তিনীতি অনুসরণ করে চলার উদ্দেশ্যে দিয়েছিলেন, তা যাতে তারা বাস্তব জীবনে মেনে চলতে পারে এবং যাবতীয় ঐশী সংবিধান অনুসরণ করার যোগ্য হয়ে ওঠে এজন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীন ট্রেনিং স্বরূপ পাঁচ ওয়াক্ত নামায কায়েম ফরয (Compulsory) বলে ঘোষণা করেন। এটা প্রতিপালন করতে গিয়ে ষড়রিপুর তাড়নায় মানব ও জ্বীন শয়তানের প্ররোচনায় এবং নিজেদের অসাবধানতার জন্য যদি কোনো ত্রুটি হয়ে যায় তা যাতে সাথে সাথে মার্জনা করিয়ে নিতে পারে সেজন্য করুণাময় আল্লাহ তাআলা করুণ আবেদনে পূর্ণ সূরা বাকারার শেষাংশ প্রদান করেন।

শান্তি প্রতিষ্ঠার ১৪ দফা মূলনীতি

১. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব

এবং তোমার প্রভুর সিদ্ধান্ত যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব আনুগত্য ও উপসনা করবে না।

২. পরিবার ব্যবস্থা

এবং পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। যদি তাদের একজন অথবা দুজন বৃদ্ধ অবস্থায় বেঁচে থাকেন তবে তাদের সাথে 'উহ্!' শব্দটা পর্যন্ত করবে না। তাদের তুচ্ছ জ্ঞান করবে না। তাদের সাথে মিষ্টি ভাষায় কথা বলবে। তাঁদের সামনে যাবে অত্যন্ত বিনম্রভাবে ও দয়াদ্র চিত্তে আর বলবে, হে প্রভু ! তাদেরকে সেইরূপ প্রতিপালন কর যেরূপে তারা আমাদেরকে ছোট বেলায় লালন পালন করেছিলেন। তোমার প্রভু তোমার অন্তরের খবর রাখেন। তোমরা যদি সৎ হয়ে যাও তবে জেনে রেখ আল্লাহ প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।

৩. পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংবেদনশীলতা

আপনার আত্মীয়-স্বজনদের হক (পাওনা) বুঝিয়ে দাও এবং মিসকিন ও পথিকদেরও হক বুঝিয়ে দাও। আর অন্যায়ভাবে অর্থ ব্যয় করো না।

www.pathagar.com

৪. অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা

যারা বেহুদা খরচ করে তারা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রভুর সাথে বিদ্রোহকারী। তোমার প্রভুর নিকট থেকে তোমার কাছে রিযিক আসার সময় পর্যন্ত যদি তোমাকে অপেক্ষা করতে হয় আর তার কারণে যদি কাউকে তোমার ফিরিয়ে নিতে হয় তবে তাদের সাথে অত্যন্ত বিনয়ীর ভাষায় কথা বলো।

৫. অপব্যায় ও কৃপণতামুক্ত সমাজ

তোমার হাতকে না একেবারে ঘাড়ের সাথে বেঁধে ফেলবে আর না একেবারে খুলে দিবে। (বখিলও হয়ো না এবং অমিতব্যায়ীও হয়ো না) জানবে যারা অমিতব্যয়ী তাদেরকে একদিন পস্তাতে হবে।

৬. রিযিক প্রদানের নিরংকুশ এখতিয়ার আল্লাহর

অবশ্য রিযিক বন্টনের ব্যাপারে কাউকে কিছু বেশি বা কাউকে কিছু কম দিয়েছেন। কারণ এর মধ্যে বান্দার জন্যে এমন কিছু কল্যাণ রয়েছে একমাত্র সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহই তার খবর রাখেন।

৭. মানব বংশের ধ্বংসের প্রচেষ্টা ঘৃণ্যতম কাজ

গরীব হয়ে যাওয়ার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে মেরে ফেল না। আমি তাদেরকে রিযিক দেব এবং তোমাদেরকেও রিযিক দেব। নিশ্চয়ই সন্তান হত্যা গুরুতর অপরাধের কাজ।

৮. নৈতিক অবক্ষয় মুক্ত সমাজ গঠন

এবং তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। অবশ্যই তা অশ্লীল কাজ এবং তা ধ্বংসের পথ।

৯. জীবন ও সমাজের নিরাপত্তা ঘোষণা

জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তোমরা এ আদেশ মেনে চলবে যে, কেউ কাউকে হত্যা করবে না। কারণ মানুষের জীবন আল্লাহর নিকট অতীব পবিত্র। তাই লোক হত্যা তিনি হারাম করেছেন। কিন্তু কেউ বিচারে মৃত্যুদণ্ডের উপযোগী হলে তাকে হত্যা করায় কোনো দোষ নেই। নিহত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন যেনো হত্যাকে অবলম্বন করে বাড়াবাড়ি না করে, কারণ বিচার তার স্বপক্ষে রয়েছে।

১০. দুর্বল, দুঃস্থ ও ইয়াতীমের নিরাপত্তা ও পুনর্বাসন

কখনো ইয়াতীমের মাল স্পর্শ করো না। তবে ইয়াতীম যতক্ষণ পর্যন্ত

www.pathagar.com

জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়ার মতো বয়সে না পৌঁছে ততদিন পর্যন্ত তার সম্পত্তির দেখাশুনা করা উত্তম।

১১. প্রতিশ্রুতি, চুক্তি ও ওয়াদা রক্ষা

ওয়াদা, চুক্তি ও অঙ্গিকার পূরণ করবে। অবশ্যই চুক্তি সম্পর্কে মানুষ জিজ্ঞাসিত হবে।

১২. দূর্নীতিমুক্ত ব্যবসায় ও বাণিজ্য

যখন পরিমাপ করবে তখন পুরো পরিমাপ করবে এবং সঠিক পাল্লায় যথাযথ ওজন করবে। এটাই সঠিক পদ্ধতি। এবং এ ব্যবস্থা অত্যন্ত ভালো ব্যবস্থা।

১৩. সন্দেহ ও অমূলক ধারণা মুক্ত সমাজ

যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার ওপর অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে হঠাৎ কোনো কাজ করবে না। নিশ্চয়ই তোমার শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি ও চিন্তাশক্তির ব্যবহারের ব্যাপারে তুমি জিজ্ঞাসিত হবে।

১৪. আত্মম্ভরিতা ও অহংকার বর্জন

যমিনের ওপর দিয়ে কখনো গর্ব ভরে চলাফেরা করবে না। তোমার গর্বিত পদনিক্ষেপে যমীন ফাটবে না এবং তুমি পাহাড়ের চেয়ে উঁচু হতে পারবে না।

এখন চিন্তা করুন, যদি ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে এবং বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় জীবনে এসব ধারা কার্যকরী করা হয় তাহলে আর কি এমন কোনো চোরাপথ খোলা থাকে যে পথ ধরে মানব সমাজে অশান্তি ঢুকতে পারে ?

www.pathagar.com

৪. মি'রাজ যে স্বাপ্নিক নয় তার সপক্ষে বিজ্ঞান

কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো এই যে, মি'রাজ বা সশরীরে মহাকাশ ভ্রমণ আদৌ সম্ভব কি না এবং সম্ভব হলেও আদৌ তা সংঘটিত হয়েছিল কি না ?

প্রথমেই আমাদের একটা সত্য মনে রাখতে হবে। আর তা হচ্ছে আমরা যতই জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিত ব্যক্তি হই না কেন তা একটা সীমায় আবদ্ধ। আমরা যে বিষয়েই বিজ্ঞানী বিশেষজ্ঞ হই না কেন তা প্রকৃতপক্ষে আপেক্ষিক—পূর্ণাঙ্গজ্ঞানী বলে আমরা কেউই দাবী করতে পারিনে। আর দাবী করলেও তা আদৌ গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত নয়। আর জ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখা-প্রশাখা জ্ঞান মূলে আবদ্ধ। প্রকৃত জ্ঞানী হতে হলে, সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে হলে জ্ঞানের প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। আর এখানেই আমাদের মহা দুর্বলতা, মহা বিভ্রাট এবং নিরংকুশ নিষ্কলুষ মহাসত্য রূপ আল কুরআনের দেয়া তথ্য ও সত্য বুঝতে অসুবিধা ও দিশেহারা হবার অন্যতম প্রধান কারণ। তাই প্রখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী বলেছিলেন।

For many centuries, men were unable to study them. because he did not possess sufficient scientific means. It is only today that humerus verses of the Qur'an dealing with natural phenomena have become fully comprehensible. It should even go so far as to say that, in the 20th century, with its compartmental of ever increasing, It is not always easy for the average scientist to understand everything he reads in the Qur'an on such subjects, without having resourses to specialized research.This means that to understand all such verses of the Qur'an one is today required to have an absolutely ....." (আধুনিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জীববিজ্ঞানী ফ্রান্সের মরিস বুকাইলীর ১৯৭৮ সালের ১৪ জুন লন্ডন Commonwelth Institute-এ দেয়া বক্তৃতা থেকে।)

মি'রাজ যে নবী করীম স.-এর সশরীরেই সংঘটিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে মহাসত্য আল কুরআন দৃঢ়ভাবে সাক্ষ্য প্রদান করছে আজ সুদীর্ঘ চৌদ্দশ বছর ধরে। যার প্রতিটা নিদর্শন বা আয়াত বহু পরীক্ষা নীরিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিজয়ীর বেশে দণ্ডায়মান। যার পাদমূলে একপেশে জ্ঞানের অধিকারী অহংকারী নির্বোধ মানুষেরা বারবার আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে।

www.pathagar.com

ফরাসী বিজ্ঞানীরও ঐ একই দশা। একথা তিনি নিজেই প্রখ্যাত থিসিস গ্রন্থ "The Bible, The Qur'an and science"-এর Introduction page (VIII)-তে এবং মূল গ্রন্থের ১২০ পৃষ্ঠায় স্বীকার করেছেন।

মি'রাজ সম্বন্ধে যাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করেন, তাঁদের নিকট কালের (Time) প্রশ্ন একটি বড় যুক্তি। বিবরণে প্রকাশ, নবী করীম স. যখন বোররাকে চড়ে রওয়ানা হন, তখন তাঁর অজু করার স্থান হতে অজুর পানি যেরূপভাবে গড়িয়ে যেতে দেখেছিলেন, ফিরে এসে ঠিক সেভাবেই গড়িয়ে যেতে দেখলেন। ক্ষণিকের মধ্যে কি করে এতবড় কাণ্ড ঘটলো ? এটাই সন্দেহবাদীদের বড় প্রশ্ন। কিন্তু তাদের সম্ভবত জানা নেই মি'রাজ রজনীর পুরো ইতিহাস। যে মহাশক্তি ও মহাবিজ্ঞানী এ বিশ্বটাকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করছেন সেই রব্বুল আলামীনই যে তাঁর মহান অতিথির শুভাগমন উপলক্ষে কালের স্বাভাবিক কাজ স্থগিত রেখেছিলেন বা রাখতে পারেন আর এটাইতো স্বাভাবিক যেমন আমাদের রাষ্ট্রে অন্য দেশের কোনো মহান রাষ্ট্রীয় অতিথি আসলে আমাদের দেশের রাষ্ট্র প্রধান বা প্রেসিডেন্ট হুকুম জারি করে যানবাহনের স্বাভাবিক চলাফেরা ক্ষণিকের জন্য হলেও স্থগিত রেখে থাকেন।

অন্যদিকে যে বিজ্ঞানের বলে তাঁরা এটা অবিশ্বাস করেন সে বিজ্ঞানই তো বলছে, সময়ের স্থিরতা কিছুই নেই। ওটা আমাদের মনের একটা খেয়াল মাত্র। সময় সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বা হিসাবও নিতান্তই ভুল। যে হিসাবে কোনো ঘটনাকে আমরা নির্ণয় করি, প্রকৃতি সে হিসাবের ধার ধারে না। আল্লাহর ঘড়ির সাথে আমাদের ঘড়ি মিলে না। অন্য গ্রহে আমাদের ঘড়ি অচল। কাজেই যে ঘড়ি আমাদের একান্তই মনগড়া এবং যার কোনো মূল্য নেই। তা-ই নিয়ে মি'রাজের সময় নির্ণয় করতে যাওয়া আমাদের বিরাট অন্যায়। বৈজ্ঞানিকরা তো পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন প্রকৃতির প্রকৃত সময় (True time of Nature) আজও তাঁরা জানেন না। কাজেই সময়ের প্রশ্ন মোটেই এখানে যুক্তিপূর্ণ ও বিজ্ঞান ভিত্তিক নয়।

সময় সম্বন্ধে যে আমাদের ধারণা ঠিক নয় সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকরা এখন একমত। দর্শকের নিজস্ব অবস্থানের উপরে কালের গতি নির্ভর করে। একস্থানে দাঁড়িয়ে থাকলে যেভাবে কোনো ঘটনাকে ঘটতে দেখবো, দ্রুতবেগে দৌড়ে গেলে সে গতিতে দেখবো না। মনে করুন, কোনো ব্যক্তি তার ইচ্ছামত যে কোনো বেগে শূন্যলোকের মধ্যে দিয়ে উড়ে যেতে পারে। সে যদি আলোকের গতি অপেক্ষা কম গতিতে ছোটে তবে দেখবে

www.pathagar.com

স্বাভাবিক ভাবেই ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, অর্থাৎ সময় সম্মুখের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অন্য কথায় রবির পর সোম, সোমের পর মঙ্গল আসছে। সে যদি আলোকের সম গতিতে অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বেগে ছুটতে পারে তবে দেখবে সময় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ সকাল কি সন্ধ্যা কিছুই বুঝা যাচ্ছে না। আবার আলোকের গতি অপেক্ষা বেশী দ্রুত যদি সে ছুটতে পারে তবে দেখবে গতি উলটা দিকে চলছে। অর্থাৎ কোনো ঘটনা ভবিষ্যতের দিকে না গিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। অন্য কথায় রবির পর শনি, শনির পর শুক্র আসছে। এটাতে বুঝা যায় যে, গতির তারতম্যে সময়ের তারতম্য ঘটে যায়। আধুনিক বিজ্ঞান একথা অকপটে স্বীকার করে নিয়ে বলে।

If speeds that approach the velocity of light make time in a moving system run slower, a superlight velocity should turn the time backward.

"আলোকের গতির যত কাছে যাওয়া যায়, ততই সময় শ্লথ হয়ে আসে তখন এটা একরূপ স্বতসিদ্ধ যে আলোকের গতি অপেক্ষা বেশী দ্রুত গতিতে গেলে সময় উল্টা দিকে বইবে। (One, Two, Three .... infinity) p. 105

কয়দিন আগেও বৈজ্ঞানিকগণ মনে করতেন যে, আলোকের গতি অপেক্ষা বেশী গতিতে কেউই যেতে পারে না। অন্য কথায় আলোকের গতিই সর্বোচ্চ গতি এবং এটাই ধ্রুবগতি (Absolute) কিন্তু অধুনা এ মত পরিত্যক্ত হয়ে যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক Harold Leland Goodwise বলেন ঃ

"Would it be odd if one them exceeded it some day and demonstrated that the velocity of light is not absolute ?" (space travel)

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

"The constancy of the speed of light has been challenged recently. A European scientist who has studied the subject for over a quarter century M.de Bray, Says that the all~ged constancy of light is unsupported by observation." (Space Travel, p. 180-181)

মূলত আলোকের গতি থেকে মনের গতি (Mind) অনেক অনেক বেশি। কাজেই আলোকের গতিই যে সর্বোচ্চ গতি এখন তা মানা যায় না।

www.pathagar.com

স্থান, কাল এবং গতি সম্বন্ধে বিজ্ঞান ইতিমধ্যে আরো অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছে। যে তথ্যগুলো বিজ্ঞানময় মহান ঐশীগ্রন্থ আল-কুরআনের দেয়া তথ্যাবলী বুঝতে বিশেষ সহায়ক হচ্ছে। সহায়ক হচ্ছে মি'রাজের ন্যায় দুর্বোধ্য ঘটনার স্বরূপ ও প্রকৃতি বুঝতে। নিম্নে এ সম্বন্ধে আমি দু একটি তথ্য পরিবেশন করার চেষ্টা করবো।

[১] দর্শকের গতির তারতম্যে বস্তু বা ঘটনার স্থান নির্ণয়ে তারতম্য ঘটে। বিজ্ঞান বলে ঃ

"Two events occurring at the same place, but at two different moments, from the point of view of one observer will be considered as occurring at different places, if viewed by another observer in a different state or in different states of motion, (One, Two, Three.... Infinity)

একই স্থানে কিন্তু বিভিন্ন মুহূর্তে সংঘটিত দুটি ঘটনা বিভিন্ন গতিতে দেখলে দর্শকেরা বিভিন্ন রূপে দেখবে। যেমন মনে করুন দ্রুতগামী একখানা চলন্ত ট্রেনের খাবার কামরায় জানালার ধারে একটি টেবিলে বসে এক সাহেব খানা খাচ্ছেন। খাওয়া শেষ হয়ে গেলে সাহেবটি সিগারেট ধরালেন। পাশে খানসামা দাঁড়িয়েছিল। সে দেখলো—দুটি ঘটনাই (খানা খাওয়া ও সিগারেট ধরানো) একই স্থানে সংঘটিত হলো। এটা সম্ভব হলো এজন্য যে, ট্রেনের গতি সাহেবের গতি এবং খানসামার গতি সমান ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারটিই যদি লাইনের ধারে পাঁচ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত দুটি গুমটি ঘরের নিশানধারী দুজন চৌকিদার লক্ষ্য করে, তবে প্রথমজন দেখবে সাহেবটি খানা খাচ্ছেন। দ্বিতীয়জন দেখবে সাহেবটি সিগারেট ধরাচ্ছেন। আর এ দুটি ঘটনার মধ্যে অন্তত পাঁচ মাইলের ব্যবধান ঘটে গেছে। চলন্ত গাড়ীতে থেকে খানসামা দুটি ঘটনাকে একই স্থানে সংঘটিত হতে দেখে। কিন্তু মাটির ওপরে দণ্ডায়মান অবস্থায় দুজন চৌকিদার ঘটনা দুটিকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঘটতে দেখেছে। দর্শকের গতির তারতম্যই এ পার্থক্যের কারণ।

[২] একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত দুটি ঘটনা দর্শকের গতির তারতম্য বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত হচ্ছে বলে মনে হবে।

এ সম্বন্ধে বিজ্ঞান বলে ঃ

"Two events occurring at the same moment(i.e. simultaneously) but at different places, from the point of view

www.pathagar.com

of one ovserver, will be considered occurring at different moments, if viewed by another observer in a different state of motion." (I. b. d)

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, মনে করুন উপরোক্ত চলন্ত ট্রেনের সাহেবটি যখন সিগারেট ধরালো, ঠিক সেই মুহূর্তে খাবারের গাড়ীর অন্য কোণে অবস্থিত আর একজন সাহেব সিগারেট ধরালেন। খানসামা দেখলো একই সময় দুটি ঘটনা ঘটলো। কিন্তু এ ঘটনাটি যদি মাটিতে দাঁড়ানো অবস্থায় কোনো লোক দেখে, তবে সে দেখবে একজন সাহেব অন্য জনের চেয়ে কিছু আগে সিগারেট ধরিয়েছে। অর্থাৎ দুজনে সিগারেট ধরাবার মধ্যে ব্যবধান ঘটে গেছে।

স্থান এবং কালের ন্যায় গতি আপেক্ষিক। নির্দিষ্ট কোনো গতির কথা কেউই বলে দিতে পারে না। একটি উদাহরণ দিচ্ছি দেখুন।

মনে করুন একটি ট্রেনগাড়ী ঘন্টায় ৫০ মাইল বেগে ছুটে যাচ্ছে। একজন যাত্রী তার কামরা থেকে বের হয়ে খাবার কামরায় যাচ্ছে। তার এই চলার গতি কত ? সে দেখলো ঘন্টায় দুই মাইল বেগে যাচ্ছে। কিন্তু রেল লাইনের ধারে কোনো বাড়ীর জানালায় দাঁড়িয়ে যদি একটি লোক এ চলন্ত গাড়ীর গতি লক্ষ্য করার জন্য তাকিয়ে থাকে। তবে সে কি দেখবে ? সে দেখবে লোকটি ৫০ মাইল বেগে যাচ্ছে। অর্থাৎ গাড়ীর গতির সমগতিতে সে চলছে। আবার মঙ্গল গ্রহ থেকে দেখলে দেখা যাবে পৃথিবীর আহ্নিক গতির সমগতিতেই (ঘন্টায় ১০০০ মাইল বেগে) লোকটি ছুটে চলছে। লোকটির প্রকৃত গতি তাহলে কত ?

৩ গতির ওপর থাকলে সময় অস্বাভাবিক রূপে খাটো হয়ে যায়।

উদাহরণ স্বরূপ আপনি মনে করুন, সাইরিয়াস গ্রহে আপনি বেড়াতে যাচ্ছেন। পৃথিবী থেকে সাইরিয়াসের দূরত্ব ৯ আলোক বছর (৫৪ লক্ষ কোটি মাইল)। অন্য কথায় যদি আপনি রকেটে চড়ে যান, তবে সাইরিয়াস গ্রহে পৌছাতে পৃথিবীর সময়ানুসারে আপনার ৯ বছর সময় লাগবে। ফিরে আসতেও আর ৯ বছর লাগবে। এত দীর্ঘ প্রবাসে প্রচুর রসদ পত্র নিশ্চয়ই আপনি সাথে নিতে চাইবেন। কিন্তু তার কোনোই প্রয়োজন হবে না। সময় এতো সংকুচিত হয়ে যাবে যে, এ ১৮ বছর আপনার ঘড়িতে ১২/১৩ ঘন্টার বেশি বলে মনে হবে না। আপনি যদি পৃথিবী থেকে সকাল বেলায় চা পান করে রওয়ানা দেন, তবে সাইরিয়াস গ্রহে পৌছে আপনি দুপুরের খাওয়া খাবেন। দুপুরের এই খাওয়া খেয়েই যদি পৃথিবীর দিকে যাত্রা করেন তবে গৃহে ফিরে আপনি রাত্রের খাওয়া

www.pathagar.com

খেতে পারবেন। অর্থাৎ আপনি রাত ৮/৯ টায় ফিরে আসতে সক্ষম হবেন। আপনার বেলায় তো এরূপ। কিন্তু পৃথিবীতে পরিত্যক্ত আপনার স্ত্রী পুত্র দেখবে, তাদের ১৮ বছর পার হয়ে গেছে।

এসব অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক তথ্যের কথা শুনে অনেকেই হয়ত অবাক হবেন কিন্তু ইসলামের নিকট এটা কোনোই নতুন কথা নয়। আজ থেকে ১৪০০ বছর আগেই পবিত্র কুরআনে সময় সম্বন্ধে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনুরূপ কথাই বলেছেন ঃ

اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ج قَالَ اَنّٰى يُحْىٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ج فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ط قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ط قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ط قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ج وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ ق وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ط فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ لا قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

"তুমি কি ভেবেছো সেই ব্যক্তির কথা, যে একটা গ্রামের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ গ্রামটি ধসে পড়লো। লোকটি মনে মনে বললো, কিরূপে আল্লাহ আবার এর অধিবাসীদের জীবিত করবেন ? তখন আল্লাহ লোকটির মৃত্যু ঘটালেন এবং একশ বছর সেই অবস্থায় রেখে তাকে পুনর্জীবিত করে বললেন, তুমি কতদিন এরূপ (মৃত অবস্থায়) ছিলে। লোকটি উত্তর দিলো, একদিন বা তারও কম। আল্লাহ বললেন, না তুমি একশ বছর মৃত অবস্থায় ছিলে। কিন্তু তোমার খাদ্য ও পানীয়ের প্রতি তাকাও, তা অবিকৃত অবস্থায় রয়ে গেছে। অথচ তোমার গাধার প্রতি চেয়ে দেখ। এটা এজন্য (করেছি যে) যাতে আমি তোমাকে অন্যান্য লোকদের জন্য নিদর্শনে পরিণত করতে পারি। এবং গাধার অস্থিগুলোর প্রতি তাকাও, দেখ কি প্রকারে আমি সেগুলোকে জুড়ি এবং তাতে মাংস পরাই। যখন এ ঘটনাগুলো স্পষ্ট দেখানো হলো সে বলে উঠলো, আমি বুঝলাম নিসন্দেহে আল্লাহ সর্বশক্তিমান।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৯

সূরা কাহফে বর্ণিত আসহাবে কাহফের ঘটনাটি এক্ষেত্রে স্মরণীয়। রোমের মুশরিক সম্রাট ও তার বাহিনী যখন একটি জনপদের ৭জন

www.pathagar.com

মু'মিন রোমান অধিবাসীর উপর আপতিত হলো। তারা রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গিয়ে একটি পার্বত্যময় গুহায় আশ্রয় নিলো এবং অদৃশ্য ইংগিতে তারা এমন ঘুম ঘুমালো যে ৩৭৫ বছরের অধিক কাল অতিবাহিত হয়ে গেলো। কিন্তু যখন তাদের ঘুম ভাঙলো, তারা ছদ্মবেশে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য কাছের শহরে গেলো রুটি ক্রয় করার জন্য। কিন্তু তাদের নিকট যে টাকা ছিলো তা ৩৭৫ বছর পূর্বের মুদ্রা। তা এ সরকারের আমলে অচল। অথচ তাঁদের মনে হচ্ছিল যেন তারা একদিনের বেশী ঘুমায়নি। জনগণ এদের লম্বা লম্বা নখ ও চুল দেখে ভীড় জমায় এবং বস্তুত তারা একটি প্রদর্শনীর বস্তুতে পরিণত হয়।

এসব সাংকেতিক ঘটনা হতে এ সত্যই প্রতিপন্ন হয় যে, সময় সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বা জ্ঞান আপেক্ষিক (Relative)। এক এক অবস্থার সময় এক এক রূপ ধারণ করে। কাজেই সময় সম্বন্ধে কারো ধারণা কারোর সাথে মিলে না। অন্য কথায় সময়ের প্রভাব সকলের উপর সমান নয়। এ জন্যই আইনষ্টাইন বলেছেন, ষ্টাণ্ডার্ড টাইম বলে কোনো টাইম নেই। সব টাইম লোকাল "There is no standard time, all time is local."

বস্তুত স্থান, কাল, পাত্র, মহাকর্ষ বা গতির প্রশ্ন নিয়ে রসূলুল্লাহর স. সশরীরে মি'রাজ এখন আর অবিশ্বাস করা চলে না। বরং অবস্থা এখন এরূপ দাঁড়িয়েছে যে, মি'রাজ বিশ্বাস না করলে বর্তমান যুগের কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্যই আর বুঝা যাবে না। এখন নভোভ্রমণের বা গ্রহ বিহারের (Space travel) যুগ এসেছে। পৃথিবী থেকে রকেটে চড়ে বৈজ্ঞানিকরা চন্দ্রলোকে গিয়েছেন এবং মঙ্গল গ্রহ জয়ের চেষ্টা করেছেন। এ রকেটের বোররাক বা রফরফ এর সাথে কত নিকট সম্পর্ক। অথচ আশ্চর্যের বিষয় বোররাকের, কথা বললে তা ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস হয়। আর রকেটের কথা বললেই তা নিরেট বৈজ্ঞানিক সত্য হয়ে দাঁড়ায়।

www.pathagar.com

৫. মি'রাজ যে সশরীরেই সংঘটিত হয়েছিল তার ঐতিহাসিক দলিল

নবী করীম স. হিজরী প্রথম সনের ২৭ রজব মাসের (৬২২ খৃষ্টাব্দে) সোমবার ভোরে মক্কাবাসীর নিকট যখন মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করলেন তখন মুশরিকরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। মুহাম্মদ যে এক মস্তবড় পাগল, লোক সমাজে তা বিশ্বাস করানোর এক মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের উপযুক্ত বিষয় মনে করে মুহূর্তের মধ্যে এ সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে দিল। সাথে সাথে অজস্র কূটকৌশলী, সমাজ অধিপতি, পুরোহিত এবং সরদাররা জমায়েত হতে লাগলো। আর একের পর এক প্রশ্নবাণে নবী মুহাম্মদ স.-কে জর্জরিত করতে লাগলো। সত্য নবী এক এক করে নিশ্চিন্তে তাদের অবান্তর অবাস্তব প্রশ্নের জবাব দিতে লাগলেন, এতটুকু বিরক্তি বোধ করলেন না। একজন মুশরিক মক্কাবাসী নবী মুহাম্মদ স.-কে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা আপনি মি'রাজ গমনকালে 'বায়তুল মোকাদ্দাস' গিয়েছিলেন এবং নামাযও পড়েছিলেন তাহলে বলুন তো বায়তুল মোকাদ্দাসের কয়টা দরজা এবং কয়টা জানালা আছে ? নবী করীম স. সাথে সাথে বলে দিলেন এতোটা দরজা এবং একয়টা জানালা আছে। তারা একটা বিস্ময়ের ভিতর হলেও মাথা নত করে সরে গেলো। নবী করীম স. বায়তুল মোকাদ্দাসের বিস্তারিত চিত্র ও দৃশ্যের বর্ণনা নিখুঁতভাবে দিয়ে যেতে লাগলেন। যে সমস্ত প্রধান ব্যবসায়ী বা ভ্রমণকারী জেরুসালেম গেছে তাঁরা নবী করীম স.-এর বর্ণনার সত্যতা স্বীকার করে নিল। কুচক্রী মুশরিকদের নবীকে লোক সমাজে পাগল বলে সাব্যস্ত করার দুরভিসন্ধির মূলে কুঠারাঘাত পড়লো। কিন্তু তবুও তাদের প্রচেষ্টায় ছেদ পড়লো না। আর একজন ভীড় ঠেলে এগিয়ে এসে নবী স.-কে প্রশ্ন করলো, আপনি যে মি'রাজে গিয়েছিলেন তার আর কি কোনো প্রমাণ আছে ? নবী বললেন, হ্যাঁ আর একটা প্রমাণ আমি দিতে পারি। আমি যখন মি'রাজে যাচ্ছিলাম তখন মক্কার একটি কাফেলার সাথে দেখা হয়। তাদের উট হারিয়ে গিয়েছিল, আমি তাদের উটের সন্ধান দেই। তাদের সাথে কোথায় দেখা হয়েছিল জিজ্ঞেস করলে তিনি স্থানের নাম উল্লেখ করেন। এ থেকে প্রশ্নকারী অনুমান করলো কবে নাগাদ তারা ফিরে আসতে পারে সেই অনুযায়ী তারা পথপানে চেয়ে থাকে এবং কাফেলা মক্কাতে ফিরে আসার সাথে সাথে তারা সবাই ঘিরে ধরে প্রশ্ন করে পথের মধ্যে তাদের উট হারিয়ে গিয়েছিল কি না। কাফেলার লোকজন তা অকপটে স্বীকার করে নেয়। তারা আরো বলে বোররাকের ন্যায় এক অদ্ভুত

www.pathagar.com

যানবাহন দেখে কাফেলার উট রশি ছিড়ে পলায়ন করে এবং উক্ত কাফেলার পানির পাত্র থেকে নবী স. পানি পান করেছিলেন সে ঘটনাও উল্লেখ করে। এ সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী প্রিয়নবী স.-এর সশরীরে মি'রাজ অনুষ্ঠান সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

নবী করীম স.-এর মি'রাজ গমনের ঘটনার সংবাদ যখন রোমে পৌঁছে তখন রোমান সম্রাট (হেরাক্লিসের) নবী মুহাম্মাদ স-এর নবুওয়াত লাভ সম্পর্কে ঔৎসুক্য আরো বেড়ে যায়। তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসে নিয়োজিত গার্ডকে জিজ্ঞেস করেন মি'রাজের রজনীর উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে সে কী জানে? উত্তরে গার্ড জানায়, উক্ত রজনীতে বায়তুল মোকাদ্দাসের দরজা বন্ধের শত চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত বন্ধ করতে পারেনি। বাবুল আম্বিয়া নামক বায়তুল মোকাদ্দাসের দরজা বন্ধ না করতে পারাটাও নবী মুহাম্মদ স.-এর সশরীরে মি'রাজ যাওয়ার ঐতিহাসিক আর একটা দলিল।-(আল-ইত্তেহাদ, সিরাতুন্নবী সংখ্যা-১৯৮৬-পৃ ঃ ৭৯)

নবী করীম স.-এর মি'রাজ যে স্বাপ্নিক ছিল না বরং তিনি সশরীরেই নভোমণ্ডল পরিভ্রমণ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে কথোপোকথন করে সৃষ্টি সম্বন্ধে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং অর্পিত সামনের দায়িত্ব সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন হয়েছিলেন। তার আর একটি প্রমাণ হলো উক্ত রজনীতে হযরত জিবরাঈল কর্তৃক নবী স.-এর পিঠে খতমে নবুওয়াতের দলিল স্বরূপ মোহরাংকন। এর পূর্বে তাঁর পিঠে উক্ত খতমে নবুওয়াতের চিহ্ন ছিলো না। আর মি'রাজ সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য এমন একটি লোকের মুখ থেকে মানুষ শুনতে পেলো যিনি জীবনে একবারও ভুলক্রমে মিথ্যা কথা বলেননি। এ 'আল আমীন' ব্যক্তির মুখের কথাই মি'রাজের সত্যতা নিরূপনের বড় দলিল (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন মাইকেল এইচ হার্ট এর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ "The Hundred" বিশ্বনবীর জীবন কথা মাওলানা তারিকুল ইসলাম পৃ ঃ ১৭২। কবি গোলাম মোস্তফার বিশ্বনবী পৃ ঃ ৪৪৭-৪৫১। The Universe Around Us by J. Jeans p. 216,233-34, The exploration of Spae by A.G.Clark)

মি'রাজ সম্বন্ধে এ গ্রন্থে এতকথা বলার কারণ হলো, প্রত্যহ প্রতিপালিত পাঁচওয়াক্ত ফরয নামাযের সাথে মি'রাজের এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আর যেহেতু এরূপ নিবিড়তম সম্পর্ক রয়েছে সেহেতু এর সত্যতা সম্পর্কে পাঠক সমাজের মনের মধ্যে যাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকে সে জন্যই এতটুকু তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজন বোধ করলাম।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

৬. পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয ঘোষণার দার্শনিক কারণ

১. মানুষের শরীরে পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে যেমন (ক) চক্ষু, (খ) কর্ণ, (গ) নাসিকা, (ঘ) জিহ্বা স (ঙ) ত্বক।

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দেয়া এ পাঁচটি ইন্দ্রিয় দ্বারা মানুষ দুনিয়ার যাবতীয় সুখ ভোগে পূর্ণ সহায়তা পাচ্ছে। তাই পঞ্চইন্দ্রিয়ের শোকর গোজারীর জন্য পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় করা ফরয ঘোষণা করা হয়েছে।

২. নবী করীম স. নামায ৫০ ওয়াক্ত থেকে কমিয়ে ৫ ওয়াক্ত আনার জন্য পরপর পাঁচবার মি'রাজের রজনীতে আল্লাহর দরবারে ফিরে গিয়েছিলেন। উম্মাতে মুহাম্মদীকে দিবারাত্রি পাঁচবার নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হতে হয় গুনাহ মাফ করিয়ে নেয়ার জন্য। নূরনবী স. মি'রাজে গিয়ে নিজ উম্মাতের জন্য সেখানে মাফ চেয়েছিলেন। আর নামাযী নিজের গুনাহর জন্য মাফ চায়। নূরনবী স সরাসরি আল্লাহর দরবারে পৌছলেন আর নামাযী ব্যক্তি নামাযের মধ্যে রূহানী ভাবে আল্লাহর দরবারে পৌছে যায়।

৩. পৃথিবীর মানুষের জীবন-যাপনের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় পাঁচটি জিনিসের সচরাচার দরকার হয়। যেমন (ক) শোয়া (খ) বসা, (গ) ঘুমান, (ঘ) জাগ্রত হওয়া (ঙ) দাঁড়ানো। এ পাঁচ অবস্থাতে আল্লাহ তাআলার নেয়ামত ও রহমত তাঁর বান্দাদের উপর পানির ফোঁটার ন্যায় বর্ষিত হচ্ছে। আল্লাহর সেই রহমত ও নেয়ামতের প্রতিদান দেয়া মানুষের পক্ষে বড়ই কঠিন এবং প্রত্যেকটি নেয়ামতের পৃথকভাবে শোকর করা আরো বেশী কঠিন। এজন্য রব্বুল আলামীন পাঁচটি বিষয়ের সমূদয় নেয়ামতের শোকর পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে রেখেছেন। আর এজন্যই পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করে দিয়েছেন। যে মুসলমান পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়লো সে নিজের প্রত্যেক অবস্থায় আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রত্যেক নেয়ামতের শোকর আদায় করতে সক্ষম হলো।

৪. শরীআতে পাক-পবিত্র হওয়ার জন্য পাঁচটি গোসলের বিধান আছে।

(ক) জানাবাতের গোসল, (খ) হায়েজের গোসল, (গ) নেফাসের গোসল, (ঘ) বিধর্মী মুসলমান হলে গোসল এবং (ঙ) মৃতদের গোসল। এ পাঁচ প্রকার গোসল প্রকাশ্য বা বাহ্যিক নাপাকি থেকে শুদ্ধ করে। কিন্তু গুনাহের নাপাকি সর্বাপেক্ষা বড়। সেই নাপাকি হতে পবিত্র হওয়ার জন্য

www.pathagar.com

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ব্যবস্থা আল্লাহ রব্বুল আলামীন দিয়েছেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায় আদায়কারী প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে সমস্ত গুনাহ হতে মুক্ত হয়ে যায়। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হুযুর স. এরশাদ করেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন কোনো মুসলমানের বাড়ীর দরজার নিকট দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করলো সে যেন দৈনিক পাঁচবার ঐ নদীতে গোসল করে পবিত্র হলো। যেরূপ প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করলে তার শরীরে কোনো নাপাকী থাকতে পারে না। অদ্রূপ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করলে তার আর কোনো গুনাহ থাকতে পারে না।–মেশকাত শরীফ ৫৭ পৃঃ

৫. পার্থিব জীবন শেষ হবার পর মানুষের উপর পাঁচ প্রকার মসিবত আপতিত হবে।

(ক) মৃত্যুর মসিবত (খ) কবরের মসিবত (গ) হাশরের মসিবত, (ঘ) পুলসিরাতের মসিবত এবং (ঙ) জান্নাতের দরজা বন্ধ হওয়ার মসিবত।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন মেহেরবানী করে উক্ত পাঁচ প্রকার মসিবত হতে বাঁচাবার জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করে দিয়েছেন। হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাকে পাঁচটি নেয়ামত প্রদান করবেন। যেমন (১) মৃত্যুর কষ্ট হতে বাঁচাবেন। (২) কবরের আজাব হতে রক্ষা করবেন। (৩) তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে। (৪) পুলসিরাত বিদ্যুৎ বেগে পার করাবেন এবং (৫) বিনা হিসেবে জান্নাত প্রদান করবেন।

এখন প্রশ্ন হতে পারে তাহলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে রাকাআতের কম-বেশি হওয়ার কারণ কি ? মুসলিম চিন্তাবিদ ও দার্শনিকগণ সে প্রশ্নের উত্তরও প্রদান করেছেন। তাঁরা বলেন—

১. ত্বকের শোকরিয়া আদায়ের জন্য ফজরের নামায পড়তে হয়। কারণ চামড়ার দ্বারা দুটি জিনিস অনুভব করা যায়। গরম ও ঠাণ্ডা। এ দুটি জিনিসের শোকরিয়ার জন্য ফজরের মাত্র দু রাকাআত নামায ফরয করা হয়েছে।

২. জিহ্বার শোকরিয়া আদায়ের জন্য যোহরের নামায পড়তে হয়। জিহবার দ্বারা চার রকমের স্বাদ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যেমন (ক) মিষ্ট, (খ) তিক্ত, (গ) অম্ল ও (ঘ) লবণাক্ত। এ চার জিনিসের শোকরিয়া

www.pathagar.com

আদায়ের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীন যোহরের চার রাকাআত নামায ফরয করে দিয়েছেন।

৩. আছরের নামাযের দ্বারা নাকের শোকরিয়া আদায় করা হয়। নাসিকার দ্বারা চারটি কাজ সম্পন্ন করা যায়। যেমন (ক) শ্বাস গ্রহণ করা, (খ) নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করা। (গ) সুগন্ধ গ্রহণ করা এবং (ঘ) দুর্গন্ধ অনুভব করা।

এ চার জিনিসের শোকরিয়া আদায়ের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীন আছরের চার রাকাআত নামায ফরয করে দিয়েছেন।

৪. চোখের শোকরিয়ার জন্য মাগরিবের তিন রাকাআত নামায আদায় করতে হয়। কারণ চোখের দ্বারা তিন দিকে নজর করা যায়। যথা (ক) ডানে, (খ) বামে ও (গ) সম্মুখে। চক্ষুরূপ যে অমূল্য রতন আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানুষকে প্রদান করেছেন তার মূল্য উপলব্ধি পূর্বক শোকরিয়া আদায়ের জন্য মাগরিবের তিন রাকাআত নামায ফরয করে দিয়েছেন।

৫. কর্ণের শোকরিয়ার জন্য এশার নামায আদায় করতে হয়। কানের দ্বারা চারদিকের আওয়াজ বা শব্দ শুনা যায়। রাতে চক্ষু অকেজো হয় যায়। কিন্তু কর্ণ ঠিক থাকে। অন্ধকার রাতে একমাত্র কর্ণের দ্বারাই চারদিকের নেয়ামত উপভোগ করা যায়। তাই এ চারদিকের নেয়ামত উপভোগ করার শোকরিয়া আদায়ের জন্য এশার চার রাকাআত নামায আল্লাহ রব্বুল আলামীন ফরয করে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

৭. পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার ঐতিহাসিক কারণ

ফরয নামায

যখন হযরত আদম আ ও মা হাওয়া বেহেশতে থাকাকালীন সময়ে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করেন, তখন আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁদেরকে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিশেষ উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করেন। আদম আ.-কে স্বরন্দ্বিপ (শ্রীলংকা) এবং মা হাওয়াকে জেদ্দার উপকুলে নিক্ষেপ করেন। হযরত আদম আ. নিজের ভুলের জন্য এবং মা হাওয়ার থেকে নির্জন পৃথিবীতে পৃথক হওয়াতে সর্বদা ক্রন্দন করতে থাকেন। এরূপভাবে বহুকাল ধরে তিনি ক্রন্দন করলেন। কিন্তু মা হাওয়ার সাক্ষাত পেলেন না। তখন আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁকে একটি দেয়া শিখিয়ে দিয়ে বললেন "হে আদম, এ দোয়া পাঠ কর। এর বরকতে তোমার গোনাহ মাফ হতে পারে।" আর সেই দোয়া ছিল তাই যা আমরা প্রত্যহ নামাযান্তে মুনাজাতে পড়ে থাকি। "রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগ ফিরলানা ওয়াতার হামনা লানা কূনান্না মিনাল খা-সিরীন।"—"হে আমার প্রতিপালক, আমি আমার আত্মার উপর যুলুম করেছি। যদি তুমি মাফ না কর এবং দয়া না কর, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তরভুক্ত হবো।"

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশ অনুসারে আদম আ. দিবারাত্র উক্ত দোয়া পড়তে লাগলেন আর ক্রন্দন করতে থাকলেন। তাঁর ক্রন্দনে চক্ষু থেকে এতো অশ্রু নির্গত হয়েছিলো যে, কয়েক শত গজ পরিমাণ দুটি বৃহৎ ঝর্ণা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। বনের পশু পাখিরা সেই পানি তৃপ্তি সহকারে পান করতো। এভাবে তিন শত বছর পর্যন্ত আদম আ. উক্ত দোয়া পাঠ এবং ক্রন্দন করেছিলেন।

একদিন আদম আ. ক্রন্দন সহকারে উক্ত দোয়া পড়তে পড়তে অস্থির অবস্থায় ছুটাছুটি করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ একটি বৃহৎ পাথরে ধাক্কা খেয়ে সংজ্ঞাহীন অবস্থা মাটিতে পড়ে যান। প্রকৃতিস্থ হওয়ার সাথে সাথে তিনি আবার উক্ত দোয়া পড়তে থাকেন। কিন্তু তবুও তাঁর দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হলো না। হযরত আদম আ.-এর এরূপ অবস্থা দেখে ফেরেশতারা পাগলপারা হয়ে আল্লাহর দরবারে আরজ করতে লাগলেন, হে রব্বুল আলামীন! আপনার দোস্ত আদম আ. একটি ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আজ তিনশ বছর যাবত ক্রন্দন করছেন। কিন্তু আপনি তাঁর দিকে একবারও রহমতের দৃষ্টি দিচ্ছেন না। দোস্তের প্রতি এ কি আচরণ ?

www.pathagar.com

তখন আল্লাহ রব্বুল আলামীন বললেন, হে ফেরেশতাগণ! আমি সব জানি। কিন্তু আদম যদি লক্ষ বছর ধরেও ঐরূপ ক্রন্দন সহকারে দোয়া পাঠ করে তবুও তার দোয়া কবুল হবে না। কিন্তু সে যদি উক্ত দোয়ার সাথে আখেরী জামানার নবী, আমার পিয়ারা হাবিব হযরত মোহাম্মাদ স.-এর নাম পাঠ করে তবে তার দোয়া কবুল হতে পারে। একথা শোনামাত্র ফেরেশতাগণ ছুটে এলো হযরত আদমের নিকট এবং বললো, হে আদম আ.! আপনি বলুন, এ কালেমা তাইয়্যিবার বরকতে আমার দোয়া কবুল কর। এটা শোনার সাথে সাথে হযরত আদম আ. তাঁর পঠিত দোয়ার সাথে মিলিয়ে পড়লেন ঃ "বিরহমাতি হাযিহিল কালিমাতিত তাইয়্যেবাতি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর র সূলুল্লাহ।"

এটা বলার সাথে সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে হযরত আদম আ.-এর দোয়া কবুল হয়ে যায়।

এ ঘটনার পর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বললেন, হে আদম! তুমি নামায পড় আমার জন্য দুই রাকাআত, আর তোমার পিতা মাতার জন্য দু' রাকাআত। কিন্তু আদম আ.-এর কোনো পিতামাতা না থাকায় তিনি মাত্র দু' রাকাআত নামায আদায় করেন। তখন ফজরের ওয়াক্ত ছিল। সেই থেকে ফজরের নামায মাত্র দু' রাকাআত হয়ে গেলো। এখন সেই নামায আমাদের দ্বারা পঠিত হয়ে আসছে।-নামাযের দার্শনিক তত্ত্ব পৃঃ ১১

যোহরের নামায

যোহরের নামায হযরত ইবরাহীম আ. পড়েছিলেন। তিনি যে যামানায় পৃথিবীতে আসেন তখন বর্তমান ইরান-ইরাক দেশাঞ্চলে শিরক বেদায়াতে পরিপূর্ণ ছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে সঠিক পথের দিশা দিবার জন্য হযরত ইবরাহীম আ.-কে এ অঞ্চলে প্রেরণ করেন। সেই সময় নমরূদ নামক একজন অত্যন্ত প্রতাপশালী মূর্তিপূজক যালেম বাদশাহ হযরত ইবরাহীম আ.-এর একত্ববাদ বিলীন করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। এমন কি তাঁর পিতা আজর তাঁর বিরুদ্ধে নমরূদের পক্ষে যোগদান করেছিল। বলা বাহুল্য, আজর নমরূদের রাজ দরবারের একজন উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ছিল। নমরুদ ইবরাহীম আ.-কে বিভিন্ন প্রকারের রাজভয় দেখালেন। কিন্তু তিনি কোনো ভয় ও প্রলোভনেই কর্তব্য কাজ তাওহিদী দাওয়াত প্রদান থেকে বিরত হলেন না। বরং সকল বাধা উপেক্ষা করে সত্য প্রচারে জোর তৎপরতা চালাতে লাগলেন। নমরূদ অবশেষে হযরত ইবরাহীম আ.-কে

www.pathagar.com

আগুনে পুড়িয়ে মারার জন্য এক ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জলিত করে। কিন্তু প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডের তাপের প্রখরতা এতোবেশী হয় যে, হযরত ইবরাহীমকে হাত পা বেঁধে ধরে নিয়ে তার (আগুনের) ধারে কাছেই নমরূদ বাহিনী যেতে ব্যর্থ হচ্ছিল। তাই পারিষদ বর্গের পরামর্শ অনুযায়ী নমরূদী দল বিরাট এক চরককল তৈরী করে তাতে হযরত ইবরাহীমকে সংযুক্ত করে পাক দিতে থাকে। এটা তখনকার জামানায় ভারী বস্তুকে দূরে নিক্ষেপের একটি অভিনব কৌশল ছিল। হযরত ইবরাহীম আ.-কে পুড়িয়ে মারার জন্য তৈরি সেই ভয়বহ অগ্নিকুণ্ড দুপুরের প্রখর সূর্যের তাপে যখন আরো ভীষণ আকার ধারণ করে তখন ইসলাম প্রচারক হযরত ইবরাহীম আ. নমরূদী চড়ককলে পাক খাচ্ছিলেন আর নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করছিলেন ঃ

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

"নিশ্চয় আমি আমার মুখ সেই আল্লাহর দিকে ফিরালাম যিনি আকাশ-সমূহ এবং ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি অংশীদারগণের অন্তর্ভুক্ত নই।"–সূরা আল আনআম ঃ ৭৯

কিন্তু এরপরও তাঁর উপর আল্লাহর নিকট হতে কোনো সাহায্য আসলো না। ফেরেশতাগণ আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলো। ইয়া আল্লাহ ! তোমার দোস্ত তোমারই তাওহিদ রক্ষা ও প্রচারের জন্য কাফেরগণের চক্রান্তে ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। আপনি দয়া করে আমাদের আদেশ করুন, আমরা আমাদের পাখা দ্বারা একটা ঝাপটা মেরে সেই অগ্নিকুণ্ডকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে দেই। আল্লাহ বলেন, আমার দোস্ত আমার তাওহিদ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য ঐরূপ বিপদে নিপতিত হয়েছে তা আমি বিশেষভাবে জানি। তবে আমার দোস্ত তোমাদের নিকট থেকে যদি কোনোরূপ সাহায্য গ্রহণ করতে চায় তবে আমি আদেশ দিচ্ছি তোমরা গিয়ে তাঁকে সাহায্য কর। অমনি জিবরাইল আ. এসে হযরত ইবরাহীম আ.-কে বললেন, ইয়া খালিলুল্লাহ! নমরূদ দল আপনাকে ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করছে। আপনি হুকুম করুন। আল্লাহর হুকুমে আমার পাখার দ্বারা একটা ঝাপটা মেরে সেই অগ্নিকুণ্ডকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করি। হযরত ইবরাহীম আ. এরূপ সমূহ বিপদে ধৈর্যহারা না হয়ে জিবরাঈল আমীনকে বললেন, হে আল্লাহর ফেরেশতা জিবরাঈল! আপনি আমাকে এ বিপদ হতে রক্ষা করতে এসেছেন। কিন্তু আমার স্রষ্টা ও প্রেরক কি আমার

www.pathagar.com

এ বিপদ দেখতে পারছেন না ? আমি আল্লাহর কসম করে বলতে পারি যে, এ বিপদে যদি আমার প্রাণ শেষ হয়েও যায় তবুও আমি এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর সাহায্য গ্রহণ করবো না।

হযরত ইবরাহীম আ.-এর এ দৃঢ় জবাব শুনে জিবরাঈল আ. আশ্চর্য হয়ে আল্লাহর দরবারে দ্রুত ফিরে গেলেন এবং সমস্ত কথা বিবৃত করলেন। এদিকে ইবরাহীম আ. দোয়া পড়ছেন আর ঘুরপাক খাচ্ছেন। এমনসময় কাফেরগণ তাঁর বন্ধন রজ্জু তীক্ষ্ম অস্ত্রদ্বারা ছেদন করে দিলো। সাথে সাথে বায়ু বেগে শোঁ শোঁ শব্দে তিনি অগ্নিকুণ্ডের দিকে ধাবিত হতে লাগলেন। ইবরাহীম আ.-এর এ অবস্থা দেখে ফেরেশতাগণ চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

আল্লাহর আরশ কাঁপতে লাগলো। ইবরাহীম আ. যখনি সেই অগ্নিকুণ্ডের উপরে পড়বেন অমনি আল্লাহ রব্বুল আলামীন আগুনকে হুকুম দিলেন ঃ

يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ -

"হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের প্রতি শীতল ও শান্তিময় হয়ে যাও।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৬৯

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশ পাওয়ার সাথে সাথে ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ড পুষ্পোদ্যানে পরিণত হয়ে গেল। তখন যোহরের ওয়াক্ত ছিল।

হযরত ইবরাহীম আ.-এর পিতা মাতা উভয়ই ছিলেন তাই তিনি চার রাকাআত নামায আদায় করেন।

এজন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীন আখেরী যামানার নবীর উম্মতদের জন্য যোহরের নামায ফরয করে দিয়েছেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন, হে মোহাম্মাদ আমি ইবরাহীমের জন্য যেরূপ ভীষণ অগ্নিকুণ্ডকে পুষ্পোদ্যানে পরিণত করে দিয়েছিলাম, তদ্রূপ তোমার উম্মাতদের মধ্যে যোহরের নামায আদায়কারীগণের জন্য জাহান্নামের আগুন ফুলশয্যায় পরিণত করে দেব।

আসরের নামায

যখন হযরত ইউনুস আ. আল্লাহর আদেশের অপেক্ষা না করেই স্বীয় বাসভূমি পরিত্যাগ করে যাচ্ছিলেন তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর এরূপ ভুলের জন্যই ইউনুস আ.-এর উপরে অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁকে স্বীয় কুদরতের মহিমা অবগত করার বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে হযরত ইউনুস আ. সাগরের তীরে এসে সাগর পার হবার জন্য নৌকায়

www.pathagar.com

আরোহণ করলেন। যখন মধ্যস্থলে আসলেন তখন নৌকাখানি ঘুরপাক খেতে খেতে ডুবে যাবার উপক্রম হলো। বিপদ দেখে আরোহীগণ অনুমান করে বুঝলেন যে এ নৌকায় নিশ্চয় একজন দাস আছে, যে প্রভুর হুকুম ছাড়া পালিয়ে যাচ্ছে। তাই তারা লটারীর মাধ্যমে অপরাধীকে বের করে আনতে চাইলো। আল্লাহর কি আশ্চর্য মহিমা। যতবারই কোড়া (টোস) ফেলে না কেন ততবারই ইউনুস আ.-এর নাম ওঠে। সকলেই ইউনুস আ.-কে দোষী সাব্যস্ত করে সাগরে নিক্ষেপ করে। সাথে সাথে একটি বৃহৎ মাছ এসে হযরত ইউনুস আ.-কে গিলে ফেলে। হযরত ইউনুস আ. মাছের উদরস্থ হয়ে আল্লাহর স্মরণ করতে লাগলেন এবং স্বীয় ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়ে অন্ধকারময় মাছের পেটে বসে পড়তে লাগলেন ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ق اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

"হে আল্লাহ" তুমি ছাড়া আর কোনোই উপাস্য নেই। পবিত্রতা তোমারই, নিশ্চয়ই আমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।"

–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৮৭

আল্লাহর হুকুমে মাছের পেটে বেদনা আরম্ভ হয়ে গেলো। বেদনায় অস্থির হয়ে মাছ ছুটাছুটি করতে করতে একটি দ্বীপের নিকট গিয়ে হযরত ইউনুস আ.-কে উদগীরন করলেন। মাছের পেটের বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহর হুকুমে চার রাকাআত শোকরিয়া নামায আদায় করেছিলেন তিনি। এটি ছিল আসরের সময়। তাই আল্লাহ রব্বুল আলামীন উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য আসরের চার রাকাআত নামায ফরয করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি এ নামায যথানিয়মে আদায় করে থাকে তাকে আল্লাহ রব্বুল আলামীন দুনিয়ার পাপ কারাগার থেকে মুক্ত করে দিবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

মাগরিবের নামায

হযরত ঈসা আ. যিনি খৃষ্টান বিশ্বে আজ যীশুখৃষ্ট নামে পরিচিত তাঁর মোজেযা দেখে নিরক্ষর বেঈমানরা তাঁকে আল্লাহর পুত্র এবং তাঁর মাতা মরিয়মকে আল্লাহর স্ত্রী রূপে ধারণা পোষণ ও প্রচার করতে থাকে। হযরত ঈসা আ. বেঈমানদের এরূপ মিথ্যা অপবাদ শ্রবণ করে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করেন "হে রাব্বুল আলামীন ! তুমি জান আমি আমার জাতিকে একথা কখনো বলি না তারা মনগড়া এবং মিথ্যা করে এরূপ আমার দোষ রটনা করছে। আল্লাহ বলেন, "দোস্ত ঈসা, ওরা যা বলে বেড়াচ্ছে আমি সেই মিথ্যা অপবাদ থেকে তোমাকে পবিত্র করলাম।" এ আশ্বাসবাণী শ্রবণ করার সাথে সাথে হযরত ঈসা আ. দু' রাকাআত নামায আদায়

www.pathagar.com

করেছিলেন। কেননা তিনি দুটি দোষারোপ হতে মুক্ত হয়েছিলেন। প্রথম আল্লাহর পুত্র হওয়ার মিথ্যা অপবাদ থেকে এবং দ্বিতীয় আল্লাহর গুণ সম্পন্ন হওয়ার মিথ্যা অপবাদ থেকে। আর এক রাকাআত তার মাতা বিবি মরিয়ম পড়েন। কারণ তিনি আল্লাহর বিবি হওয়ার মিথ্যা অপবাদ থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন। তখন মাগরিবের ওয়াক্ত ছিল। তাই আল্লাহ রব্বুল আলামীন উক্ত তিন রাকাআত একত্র করে উম্মাতে মুহাম্মদীর উপর ফরয করে দিয়েছেন।

এশার নামায

এমনিভাবে এশার ওয়াক্তের নামায হয় যখন হযরত মূসা আ.-কে ফেরাউন দ্বিতীয় রামসিসের সেনাবাহিনী হত্যা করার জন্য তাড়া করেছিল তখন তিনি বনী ইসরাঈলের নিপীড়িত জনগণকে সাথে নিয়ে মিসর থেকে সিরিয়ায় পলায়ন করছিলেন। সামনে লোহিত সাগরের উত্তাল তরঙ্গমালা। আর পিছনে শত্রু পক্ষের বিরাট সামরিক বাহিনী। পালাবার কোনোই উপায় না দেখে হযরত মূসা আ. কায়মনোবাক্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে করুণ প্রার্থনা করতে লাগলেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করে বলেন, হে মূসা, তুমি তোমার হাতের লাঠিখানা সাগরের উত্তাল তরঙ্গের উপর (আঘাত করার ন্যায়) ফেলে দাও। মূসা আ. আল্লাহ রব্বুল আলামীনের আদেশে নিজের লাঠিখানা সাগরের উত্তাল তরঙ্গের উপরে ফেলে দিলেন। ফেলার সাথে সাথেই সাগরের এপার থেকে অপর পার পর্যন্ত একটি বিশাল রাস্তায় পরিণত হয়ে গেল। হযরত মূসা আ. রাস্তা পেয়ে তাঁর দলবল সাথে নিয়ে নিরাপদে এপার থেকে অপর পারে চলে গেলেন। ফেরাউনের সেনাবাহিনী ঐ রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করতে গেলে জলরাশি তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেললো। এভাবে ইসলামের ও আল্লাহর শত্রু ফেরাউন দ্বিতীয় রামসিস তাঁর বাহিনী সহ লোহিত সাগরের জলরাশীতে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেলে হযরত মূসা আ. ও বনী ইসরাঈলগণ আশ্বস্ত হলেন এবং শোকরিয়া স্বরূপ আল্লাহর উদ্দেশ্যে চার রাকাআত নামায আদায় করলেন। হযরত মূসা আ.-এর এ চার রাকআত নামায পড়ার কারণ হলো—

১. নিজে নিরাপদে লোহিত সাগর অতিক্রম করা।

২. তাঁর জাতি বনী ইসরাঈলদের নিয়ে অপর পারে নিরাপদে গমন করা।

৩. দুরাচার ফেরাউন দ্বিতীয় রামসিসের হাত হতে রক্ষা পাওয়া।

www.pathagar.com

৪. এবং ফেরাউন দ্বিতীয় রামসিসের তার দলবল সহ লোহিত সাগরে ধ্বংস হয়ে যাওয়া।

হযরত মূসা (আ) এ চারটি বিপদ হতে নাজাত লাভ করে চার রাকাআত শোকরিয়া নামায আদায় করেছিলেন। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সেই নামায উম্মাতে মুহাম্মদীর জন্য ফরয করে দিয়েছেন।

উম্মাতে মুহাম্মাদীর যারা এশার নামায আদায় করেন, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদেরকে চারটি বিপদ থেকে নাজাত দেন।

১. অসৎকাজের অনুতাপ হতে।

২. কবরের আজাবের বিপদ হতে।

৩. জাহান্নামের ভীষণ আজাব হতে এবং

৪. কিয়ামতের ভীষণ বিপদ হতে।

সালাতুল বেতর বা বেতর নামায

বেতর নামায তিন রাকাআত। হযরত নবী করীম স. মহাকাশ ভ্রমণ-কালে মি'রাজের রাতে এ নামায পড়েছিলেন। হযরত মূসা আ.-এর সাথে নবী করীম স.-এর দেখা হলে তাঁর জন্য এক রাকাআত নামায পড়ে দোয়া করতে বলেন। এ এক রাকাআতের সাথে নবী করীম স. নিজের জন্য এক রাকাআত পড়েন। এ সময় আল্লাহর তরফ থেকে হুকুম হয় আর এক রাকাআত পড়ার।–তারিখুল ইসলাম, ৪র্থ খণ্ড, নেছারউদ্দিন।

www.pathagar.com

৮. কুরআন ও হাদীসের যে সমস্ত আয়াত দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে সাবেত করা হয়েছে

ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা, রাত্রি এবং সকাল ৭টা, ৮টা, ১১টা ও দুপুর ১২টা, বিকাল ৫টা, ইত্যাদি সময় নির্ধারণী শব্দগুলো মানুষ তাদের কাজের সুবিধার জন্য চিহ্নিত করে নিয়েছে।

যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ বিশ্বজাহানের প্রভু তার নিকট এর কোনো মূল্য নেই। কারণ তিনি সময়ের উর্ধে। তাই তিনি এর প্রতি গুরুত্বও এতো দেননি। বৈজ্ঞানিকরাও তো অত্যন্ত পরিষ্কারভাবেই বলে দিয়েছেন প্রকৃতির প্রকৃত সময় (True time of Nature) আজও তাঁরা জানেন না। কাজেই সময়ের (point of time) প্রশ্ন এখানে বড় কথা নয়। শৃংখলা রক্ষার খাতিরে এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হুকুম অনুসারে কাজ করার জন্যই ঈমানদার মানুষেরা নামাযের উপরোক্ত নামে নামকরণ করেছেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে থাকেন। আর এজন্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে নামায আদায়ের তাগিদ দিয়ে এভাবে বলেছেন—

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ط اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ○ بنى اسرائيل : ٧٨

"নিয়মিতভাবে নামায আদায় করো সূর্য ঢলার পর থেকে রাতের অন্ধকার ঘনিভূত হওয়া পর্যন্ত। এবং আদায় করো প্রাতের নামায। বাস্তবিক প্রাতের নামায (ফেরেশতাদের) উপস্থিতির সময়।"

পরশমণি গ্রন্থের বিশিষ্ট গ্রন্থকার বলেন স্পষ্টভাবেই এখানে উল্লেখ আছেঃ

(১) সূর্য ঢলার পর যোহর, (২) সূর্য ডুবে যাওয়ার আগে আসর, (৩) সূর্য ডুবে যাওয়ার পর মাগরিব, (৪) রাতের অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে এলে এশা ও (৫) প্রত্যুষে ফজরের নামায পড়তে হবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো বলেছেন ঃ

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ○ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ○ الروم : ١٧-١٨

"তোমরা মহিমা ঘোষণা কর আল্লাহর নামে সন্ধ্যায় ও প্রাতে। আর আসমান ও যমীনে তাঁরই নাম ঘোষিত হচ্ছে অপরাহ্নে ও মধ্যাহ্নে।"

www.pathagar.com

এ আয়াতে কারীমায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আদেশ দিচ্ছেন সন্ধ্যায়, প্রাতে, রাতে, দ্বিপ্রহরে ও শেষ বেলায় নামায আদায় করার জন্য।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন আরো বলেন ঃ

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ - طه : ١٣٠

"এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে তোমার রবের হামদ সহ মহিমা বর্ণনা করো।"

জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, আমরা একরাতে হুযুর (স)-এর সাথে বসা ছিলাম। তিনি চাঁদের দিকে তাকালেন। ঐদিন ১৪ তারিখের চাঁদ ছিল। অতপর তিনি বললেন, তোমরা যেরূপ এ চাঁদটি দেখতে পাচ্ছো ঠিক সেরূপ অবিলম্বে তোমাদের রবকে দেখতে পাবে এবং আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে তোমাদের একটুও সন্দেহ হবে না। এজন্য তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে (ফজর ও আসর) কখনো নামায ছাড়বে না।

সূরা বাকারাতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন আরো বলেছেন ঃ

"হাফিযূ আ'লাস সালাওয়াতি ওয়াস সালাতিল উসৃস্তা।"-কিতাবুত তাফসীর ৪র্থ খণ্ড পৃ ঃ ৩২৯

উপরোক্ত আয়াতের সালাতুল উসৃস্তা শব্দ দুটি দ্বারা যে আসরের নামায বুঝানো হচ্ছে তার দলিল বুখারী শরীফের ৪১৭৩ নম্বর হাদীসটি। এ হাদীসটিতে হযরত আলী রা. বলেন, খন্দক যুদ্ধকালে একদিন নবী স. বলেছিলেন. মুশরিকরা আমাদেরকে যুদ্ধে ব্যস্ত করে রাখায় আমরা আসরের নামায সূর্য ডুবে যাওয়ার পূর্বে আদায় করতে পারিনি। আল্লাহ তাদের কবর, ঘরবাড়ী অথবা পেট আগুন দ্বারা ভর্তি করে দিন।

এভাবে সূরা বনী ইসরাঈল-এর ৭৮-৭৯ আয়াত, সূরা ত্বা-হা-এর ১৩০ আয়াত, সূরা আততুর-এর ৪৮-৪৯ আয়াত, সূরা ক্বাফ-এর ৩৯ আয়াত, সূরা দাহার-এর ২৫-২৬ আয়াত, সূরা রাআদ-এর ১৫ আয়াত, সূরা আল আনআম-এর ৫২ আয়াত, সূরা আলে ইমরান-এর ৪১ আয়াত, সূরা আরাফ-এর ২০৫ আয়াত, সূরা কাহফ-এর ২৮ আয়াত, সূরা মারয়াম-এর ১১ আয়াত, সূরা আন নূর-এর ৩৭ আয়াত, সূরা আহযাব-এর ৪২ আয়াত, সূরা সোয়াদ-এর ১৮ আয়াত, সূরা মু'মিন-এর ৫৫ আয়াত এবং সূরা ফাতাহ-এর ৯ আয়াতে নামাযের সময় সম্বন্ধে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

নামাযের সময় নির্ধারণী আয়াত সূরা হূদেও বর্ণিত হয়েছে। এখানে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ط اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ط ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ○

"অতপর তোমরা নামায কয়েম করো দিনের প্রথমার্ধে ও শেষার্ধে এবং রাতের প্রথমাংশে নিশ্চয়ই নেক কাজসমূহ বদ আমলসমূহকে দূর করে দেয়। স্মরণকারীদের জন্য এটা উপদেশ বাণী।"

(বুখারী শরীফ কিতাবুত তাফসীর ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৪২৯, সূরা হূদ ঃ ১১৪

নিশ্চয় উপরোক্ত আয়াতে ফজর, মাগরিব এবং এশার নামাযের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে।

বলাবাহুল্য, মুসলিম জাতি প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায যে সময়ে, যে নিয়মে আদায় করে আসছে তা আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর স্পেশাল দূত হযরত জিবরাঈল আ.-এর মারফত নবী করীম স.-কে হাতেকলমে (Practically) শিক্ষা দিয়েছিলেন। হাদীসে আছে এ নামায প্রশিক্ষণের সময় হযরত জিবরাঈল আ. প্রথম মৌখিকভাবে নবী করীম স.-কে ওয়াক্তিয়া নামায শিক্ষা দিতেন এবং নিজে ইমাম হয়ে নামায পড়াতেন এবং পরের দিন নবীকে ইমাম বানিয়ে নিজে মুক্তাদি হতেন। এভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হাতে কলমে দিবারাত্রের পাঁচ ওয়াক্ত নামায বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ স.-কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। আর নবী করীম স. শিখিয়েছেন উম্মাতে মুহাম্মদীকে।

বিজ্ঞানীরা বিশেষ করে সূরা হূদ-এর এ নামাযের সময় নির্ধারণী আয়াত নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করে বহু নতুন তথ্য উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছেন। বিজ্ঞানীরা যেহেতু বস্তু নিয়েই বেশী চিন্তা-ভাবনা এবং গবেষণা পরিচালনা করে থাকেন, তাই তাঁরা আল্লাহ রব্বুল আলামীন কেন মানুষকে উল্লেখিত ওয়াক্তে নামায আদায় করতে বললেন এ নিয়ে গবেষণা করা শুরু করেন। তাঁদের এ কাজে আরো উৎসাহ যোগায় মহানবী (স)-এর নিম্নলিখিত হাদীস দুটিও। প্রিয় নবী বলেছিলেন, "মহা প্রভু আল্লাহ তা'আলা একথা ঘোষণা করেছেন যে, মানুষ আমার থেকে উপকার গ্রহণ করবে বলে আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু তাদের কাছে কিছু পাবো বলে সৃষ্টি করিনি।" প্রিয় নবী আরো বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা 'বলেন, 'আমি নামাযকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছি, অর্ধেক আমার জন্য এবং অর্ধেক আমার বান্দাদের জন্য।' (নামায ও বিজ্ঞান ৭০ পৃঃ) বিজ্ঞানীরা চিন্তা করা শুরু করলেন। উপরোক্ত হাদীস দুটির গূঢ় রহস্য উদঘাটন করার জন্য

www.pathagar.com

তাদের মনে একথাটি বার বার নাড়া দিতে লাগলো, আমাদের কাছে কিছু পাওয়ার জন্য যখন আল্লাহ তাআলা আমাদের সৃষ্টি করেননি, তখন আমাদের ইবাদাতকে দুই ভাগ করে এক ভাগ আল্লাহ তা'আলার জন্য রাখার কারণ কী ? তবে কি কিয়ামতের দিনে আমাদের বিচার করার জন্য আল্লাহ তা'আলার ঐ ভাগ নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে এবং অন্য ভাগ পৃথিবীতে আমাদেরই স্বার্থের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ? যদি তাই হয় তাহলে নিশ্চয়ই এ পৃথিবীতে আমাদের স্বার্থের ওপর নামাযের একটা উপকারিতা আছে। এ উপকারিতা কি। তা উদঘাটন করার জন্য উক্ত বৈজ্ঞানিক ভূ-পৃষ্ঠ থেকে "সেলফ" (Straight Electromagnatic lines of Force) নামে যে বলরেখা বায়ুমণ্ডলে অবিরাম বিক্ষিপ্ত হচ্ছে তার উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রথমেই পৃথিবীর আবর্তন ও তার পরিক্রমনের কারণ উদঘাটন করেছেন এবং সেই সাথে প্রমাণ করে ছেড়েছেন যে, পৃথিবী সত্যই অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের ন্যায় চলমান।

বাংলাদেশের প্রবীন চিকিৎসা বিজ্ঞানী মমতাজ উদ্দিন সাহেব বলেন, পৃথিবী ঘুরছে, অবিরাম ঘুরছে। পৃথিবী ঘুরছে বলেই ভূ-পৃষ্ঠের উপর মানুষ বেঁচে আছে। পৃথিবী যদি না ঘুরতো তাহলে মানুষ কেন একটা প্রাণীও ভূ-পৃষ্ঠের উপর বেঁচে থাকতে পারতো না। কারণ পৃথিবী ঘুরবার জন্য তার সমস্ত ভূ-পৃষ্ঠ থেকে এক প্রকার বলরেখা অবিরাম বায়ুমণ্ডলে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। ঐ বলরেখাকে সেলফ (Self) বলে নামকরণ করেছি। এটা দিনের উভয় প্রান্তে রাতেরও কিছু অংশ জুড়ে বেশী শক্তিশালী। আর দিনের ঐ উভয় প্রান্তে রাতের কিছু অংশ জুড়েই সমস্ত নামাযগুলো পড়তে বলা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, পৃথিবী নিক্ষিপ্ত বলরেখা—যার নাম দিয়েছি সেলফ তার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করতে ঐ পৃথিবীর আবর্তন ও পরিক্রমণের বৈজ্ঞানিক কারণ হিসেবে যা বলেছি তা আমি নির্ভুল বলতে চাই। কারণ আমার দেয়া পৃথিবীর আবর্তন সূত্রের উপর ভিত্তি করে আবার তারই পরিক্রমণ এমন একটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি যা ডায়ানামিক-এর মত একটা মূল্যবান অংক শাস্ত্রেরও নির্ভুল ভিত্তি প্রস্তর। সূত্র ঃ নামায ও বিজ্ঞান ভূমিকা দ্রঃ

মানুষের শরীরে ইলেকট্রন অনবরত যোগ-বিয়োগ হচ্ছে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে পারবেন বিখ্যাত এ্যানামিষ্ট মিঃ হেনরী গ্রে-এর গ্রন্থের উনত্রিশতম সংস্করণ ৯০৩ পৃষ্ঠায়। মস্তিষ্কে এ ইলেক্ট্রনের উপস্থিতির আধিক্য ঘটলে মানুষের বিভিন্ন রোগ হয়। এ ছাড়া অল্প কথায় রাগা, তুচ্ছ ব্যাপারে তুলকালাম কাণ্ড ঘটানো, বদরাগ, উগ্র মেজাজ, বেশি সেন্টিমেন্টাল,

www.pathagar.com

ওস্তাদের চোখ রাঙ্গানীতে তার উপর চোখ তোলা, পিতামাতার শাসনদণ্ডের প্রতিবাদে তাদের উপর হস্তক্ষেপ করা, যাকে তাকে যখন তখন এক লাথিতে নদী পার করা, বাসের ভিড়ে পায়ে একটু ধাক্কা লাগলে তাকে জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলতে চাওয়া। এক চড়ে বত্রিশ দাঁত ফেলে দেয়া ইত্যাদি সবই মস্তিষ্কে ইলেক্ট্রনের অধিক্যের কেরামতি। অজুর সাথে নামায আদায় করলে মস্তিষ্কের তথা গোটা শরীরের ইলেক্ট্রনের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আর শরীরের এ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে সেলফ (Self) এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে থাকে। দিন রাতের প্রান্তে এবং রাতের একাংশে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে এ সেলফ (Self) খোদায়ী ব্যবস্থাপনায় তৈরি হয় বলে আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানুষের কল্যাণার্থে উপরোক্ত সময়ে নামায আদায় করার কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের এ কড়া নির্দেশ দেয়ার কারণ কি তা আজ মানুষ বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা একটু একটু করে উপলব্ধি করতে পারছে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ প্রিয়নবী স. কেন ফজর এবং আসরের নামায আদায়ের জন্য সবচেয়ে বেশি কড়াকড়ি করেছেন তাও আজ উদঘাটিত হয়েছে। প্রকাশ্যে গোপনে এক মানুষ অন্য মানুষের উপর যে অত্যাচার যুলুম ও অবিচার করে যাচ্ছে তার সঠিক বিচার করার জন্য মানুষের অজান্তে তাদের স্ব স্ব স্কন্ধে সংস্থাপিত অত্যাধুনিক টেলিভিশন-ক্যাসেট ফিট করে রেখেছেন দুজন আল্লাহর নিযুক্ত ফেরেশতা। বিজ্ঞানময় আল কুরআনে এদেরকে কেরামান কাতেবীন নামে অভিহিত করা হয়েছে। ফজরে ও আসরের ওয়াক্তে তাঁদের স্ব স্ব নেকী ও বদী রিপোর্ট নিয়ে তাদের প্রভুর নিকট ফিরে যায়। তারা যাতে ভালো রিপোর্ট নিয়ে ফিরে যেতে পারে সেজন্য প্রিয় নবী (স) ফজরে ও আসরে সঠিক সময়ে নামায আদায়ের প্রতি এতো অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তিনি যে সত্য সত্যই গোটা মানবজাতির জন্য সতর্ককারী ও রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছিলেন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আজ তা ধীরে ধীরে ধরা পড়ছে। আর তিনি শুধু মানুষকে সতর্ক করেই ক্ষান্ত হননি বরং তিনি নিজেও আল্লাহর অশেষ রহমতের পীযুশধারায় সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য সদা সতর্ক থাকতেন এবং সঠিক সময়ে ফরয নামায আদায়ের পর ব্যক্তিগত কাজ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় কাজের ফাঁকে ফাঁকে অতিরিক্ত নামায পড়তেন। তাহাজ্জুদ নামায, যাওয়ালের নামায, চাশ্‌তের নামায, এশরাক নামায, আওয়াবীনের নামায এবং ফজরের দু রাকাআত, যোহরের চার রাকাআত ও শেষে দু রাকাআত মাগরিবের দু রাকাআত সুন্নাত নামায নিয়মিত এবং আসরের ফরয নামাযের পূর্বে চার রাকাআত মাঝে মধ্যে পড়তেন। এগুলো সবই নফল নামায। প্রিয় নবী পড়তেন বলেই

www.pathagar.com

এগুলো আজ সুন্নাত নামে পরিচিত। এর কারণ আল্লাহর অধিক প্রিয়ভাজন হওয়া এবং দ্বিতীয় কারণ অধিক পরিমাণে 'সেল্‌ফ' (Self) দ্বারা শারীরিক সুস্থতা সংরক্ষণ। এখানে সংযুক্ত ভায়াগ্রামটির প্রতি লক্ষ করুন এবং নামাযের স্বাস্থ্যগত তাৎপর্য অধ্যায়ের বিশ্লেষণটি মনোযোগ সহকারে পড়ুন,

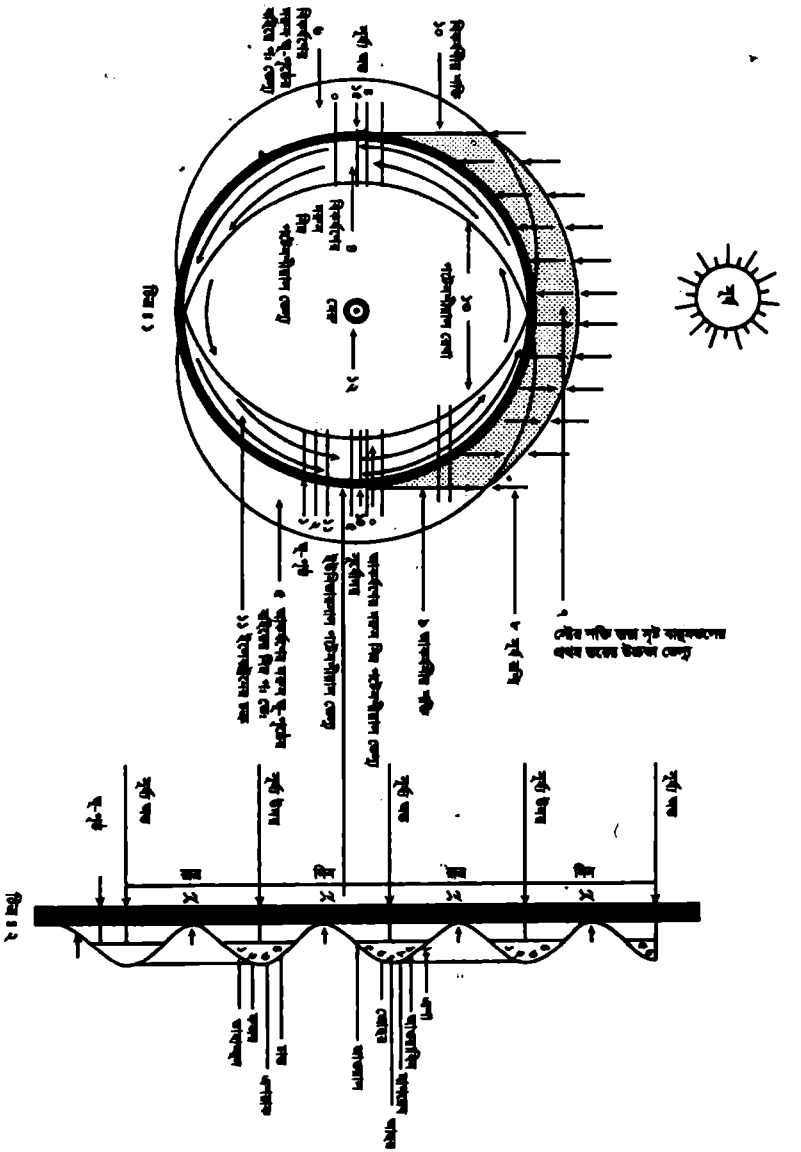

www.pathagar.com

তাহলে বুঝতে পারবেন নামায শুধু মানুষের পারলৌকিক কল্যাণই সাধন করে না, এর ইহলৌকিক কল্যাণও কত গুরুত্বপূর্ণ।

ভায়াগ্রামটিতে দিনের উভয় প্রান্তে রাতেরও একাংশ নিয়ে সমস্ত নামাযগুলো প্রদান করা হয়েছে। এ ভায়াগ্রামে দিন ও রাত সমান দেখান হয়েছে। ১নং চিত্রের চওড়া বৃত্তকে সরল রেখায় এনে ঐ ১নং চিত্রের মধ্যস্থ পটেনশীয়াল রেখাকে উক্ত সরল রেখার সাথে ঐ ১নং চিত্রের মতো দিন ১২টায় এবং রাত ১২টায় স্পর্শ করিয়ে এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় এটাকে (পটেনশীয়াল রেখাকে) ঐ একই সরল রেখার সমদূরবর্তী অবস্থানে নিয়ে এ পটেনশীয়াল তরংগে চিত্র অংকিত করা হলো।

এখন দৈনিক নামাযগুলো বার বার নির্ধারিত সময় মত পটেনশীয়াল তরংগ রেখার উপর বসিয়ে দেখা যায় যে, সমস্ত নামায যথার্থই দিনের উভয় প্রান্তে রাতেরও একাংশ জুড়ে সীমাবদ্ধ রয়েছে। এটাই সূরা হূদের ১১৪ আয়াত সহ নামাযের সময় বা ওয়াক্ত সংক্রান্ত এ পুস্তকের পূর্বোল্লেখিত মোট ১৮টি আয়াতের সার্বিক অর্থ। আর এখানেই (দিনের প্রান্তে রাতেরও একাংশ) ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বিক্ষিপ্ত বলরেখা সেলফ-এর জোর বেশি এবং শরীর থেকে ইলেকট্রন টেনে নেয়ার শক্তিও বেশি। এজন্য এখানের নামাযে (সেজদায়) শারীরিক উপকারিতাও সবচেয়ে বেশি।

❐

www.pathagar.com

৯. নামাযকে কতকগুলো বিশেষ নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ করার পটভূমি

নামাযকে কতকগুলো নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ করা হয়েছে। এ সমস্ত বিশেষ নিয়ম পালন করা ছাড়া নামায যে মোটেই সুসম্পন্ন হয় না তার প্রধান কারণও আছে। এ কারণ হলো, আল্লাহ সৃষ্ট মানবদেহের প্রত্যেকটি অংগ-প্রত্যংগের শোকরিয়া আদায়ও ইবাদাত। সেগুলো পূর্ণরূপে আদায় ছাড়া নামায যে সুসম্পন্ন হয় না তার কতিপয় দার্শনিক ও কুরআন-হাদীস সমর্থিত প্রমাণ নিম্নে পেশ করা হলো ঃ

নামাযের নিয়ম-কানুনগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মোস্তাহাব। তার ভিতর ফরযটিই আসল বা মূল। নামাযের ফরয ছাড়া অন্য নিয়ম-কানুনগুলো ভুলক্রমে ছেড়ে দিলেও নামায আদায় হতে পারে। কিন্তু ফরয ত্যাগ করলে আর কোনো অঙ্গেরই ইবাদাত (নামায) আদায় হওয়া মোটেই সম্ভব নয়।

আমরা জানি ইসলামী আইন অনুযায়ী নামাযের ফরয ১৩টি যথা ঃ

(১) জায়গা পাক, (২) পোশাক পাক, (৩) শরীর পাক (৪) সতর ঢাকা (৫) কেবলামুখি হওয়া (৬) নিয়ত করা। এ ছয়টি নামাযের বাইরের ফরয। এটা নামাযের বা ইবাদাতের পূর্বাবস্থা। এবং (৭) দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা। (৮) তাকবির বলা ও তাহরিমা বাঁধা (৯) কেরাত পড়া। (১০) রুকূ' করা। (১১) সিজদা করা। (১২) শেষ বৈঠক করা। (১৩) নামায শেষ করা। এ ৭টি (৬-১৩ =৭টি) নামাযের মধ্যকার ফরয এবং এগুলোই ইবাদাতের মূল বা আসল জিনিস। উল্লেখ্য নামাযের এই ফরয গুলির একটি বাদ গেলে নামায শুদ্ধ হবে না। কারণ প্রত্যকটি জিনিসের দুটি করে দিক আছে তার একটি ছেড়ে দিলে অপরটি মূল্যহীন হয়ে পড়ে। যেমন, আমরা ভাত খাই, কিন্তু আগুন না হলে ভাত রান্না করা যায় না। এখানে আগুন ও ভাতের মধ্যে খাওয়ার জন্য যেমন ভাতই আমাদের আসল এবং আগুন খাদ্য না হলেও তা একেবারেই পরিত্যাগ যোগ্য নয়। আগুন না হলে যেমন ভাত রান্না মোটেই সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে প্রথমোক্ত ৬টি ফরয যদিও তা ইবাদাতের মূল বা আসল না তবুও তা পরিত্যাগ করলে শেষোক্ত ৭টি মূল বা আসল ফরযগুলো নামায বা ইবাদাত আদায়ে পূর্ণতা দান করতে পারে না। কাজেই নামায বা ইবাদাত আদায়ের জন্য ১৩টি শর্তই অত্যন্ত জরুরী বা অপরিহার্য ফরয।

www.pathagar.com

নামাযের মধ্যকার ৭টি ফরয নামাযের মূল বা আসল হওয়ারও কারণ দার্শনিক ও দেহতত্ত্ববিদগণ উল্লেখ করেছেন। তাঁরা বলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ৭টি উপাদানে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন যেমন ঃ (১) হাড় (২) গোশত (৩) শিরা (৪) রক্ত (৫) চর্ম (৬) মস্তিষ্ক এবং (৭) মজ্জা। আর এ সাত প্রকার উপাদানে প্রত্যেকটির শোকরিয়া আদায়ের জন্য নামাযের ভিতর ৭ ফরয রাখা হয়েছে। পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দেয়া এ ৭টি উপাদানের কোনো একটি না হলে যেমন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না, অনুরূপভাবে নামাযের মধ্যকার ৭টি ফরযের কোনো একটি ফরয আদায় না হলে সে নামায কখনই গ্রহণ যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। ৭টি উপাদানে গঠিত মানবদেহের শোকরিয়া (নামায) আদায় করতে যে ৭টি ফরয প্রতিপালন করতে হয় তা নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো ঃ

১. কেয়াম বা দাঁড়িয়ে নামায পড়া ঃ মানুষের শরীরের ৭টি উপাদানের মধ্যে প্রথম উপাদান হাড় বা অস্থি। শরীরে হাড় আছে বলেই মানুষ দাঁড়াতে পারে এবং এ অবস্থায় মানুষ পার্থিব জীবনের বড় একটি অভাব পূরণ করতে পারে। এটা আল্লাহর একটি বিশেষ নেয়ামত। এ নেয়ামতের শোকরিয়া আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা মানুষের জন্য ফরয।

২. কেরাআত পড়া ঃ মানব শরীরের আর একটি বিশিষ্ট উপাদান রক্ত। রক্ত আছে বলেই মানুষ কথা বলতে পারে এবং বংশ বৃদ্ধি করতে পারে। মানুষের শরীরে যখন রক্তের স্বল্পতা দেখা দেয় তখন তার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে যায়। কণ্ঠ দিয়ে চিঁ চিঁ শব্দ বের হতে থাকে। বিশেষ করে বৃদ্ধ লোক এর জ্বলন্ত উদাহরণ। আর যখন শরীরে রক্তের স্বল্পতা দেখা দেয় তখন আর যৌবন থাকে না। মানুষ বার্ধক্যে পৌছে যায়। আর মানুষ যখন বার্ধক্যে পৌঁছে যায় তখন তার সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা থাকে না। তাই রক্ত মানুষের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দেয়া একটি বড় নেয়ামত। এ নেয়ামতের শোকরিয়া আদায়ের জন্য নামাযে কুরআন থেকে কেরাআত পড়া হয়।

৩. রুকূ' করা ঃ শিরা না হলে সমস্ত শরীরে রক্ত চলাচল করতে পারে না। আর সমস্ত শরীরে যদি ঠিকমত রক্ত চলাচল না করতে পারে তা হলে শরীরের ঐ সমস্ত অংগগুলো একেবারেই অকেজো হয়ে পড়ে এবং ইচ্ছা অনুযায়ী চলাচল করতে পারে না। এজন্য শিরা উপশিরা সুস্থ মানব দেহের জন্য একান্ত প্রয়োজন। তাই এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দেয়া মানুষের জন্য একটি অতীব মূল্যবান নেয়ামত বলতে হয়। এ নেয়ামতের শোকরিয়া আদয়ের জন্য নামাযে রুকূ' ফরয করা হয়েছে।

www.pathagar.com

৪. শেষ বৈঠক ঃ গোশ্‌ত আর একটি মানব দেহের অন্যতম উপাদান। এ গোশ্‌তের দ্বারা মানুষ অনেক উপায় উপভোগ করতে পারে। মানুষ যখন সারা দিন-রাত হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ে তখন আরাম বা বিশ্রামের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করলে কখনো শান্তি পাওয়া যায় না। তাই শুতে হয় অথবা বসে বসে বিশ্রাম নিতে হয়। কিন্তু শরীরে গোশত না থাকলে শুধু হাড্ডি ও শিরার উপর শুলে কি আরাম হতো ? আরাম তো হতোই না বরং শিরায় চাপ পড়ে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে মানুষ মারা যেতো। তাই মানুষের জন্য গোশত অত্যন্ত মূল্যবান আল্লাহর দেয়া এক নেয়ামাত। এ নেয়ামতের শোকরিয়া আদায়ের জন্যই নামাযে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শেষ বৈঠক বিশেষ করে ফরয করে দিয়েছেন।

৫. তাকবিরে তাহরীমা ঃ মানব দেহের সবচেয়ে মূল্যবান অংশ মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক ঠিক না থাকলে মানব দেহের কোনোই মূল্য থাকতো না। যার মস্তিষ্ক ঠিক নেই তার কোনো মূল্যই নেই। সে পাগল। আর এজন্যই যে পাগল তার জন্য নামায মাফ। শত অপরাধ করলেও বিচারক তার শাস্তি দেয় না। পাগল বলে ক্ষমা করে দেয়। উপরন্তু তাকে সুস্থ করার জন্য হয় পাবনার হেমায়েতপুরে অথবা ভারতের রাচীতে প্রেরণের হুকুম দেয়। মস্তিষ্ক ঠিক না থাকলে মানুষ যেমন নিজের উপকার করতে পারে না তেমনি সে দেশেরও কোনো উপকার করতে পারে না। এজন্য মস্তিষ্ক মানুষের অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। আল্লাহর দেয়া এ মূল্যবান সম্পদের শোকরিয়া আদায়ের জন্য নামাযে তাকবির এবং তাহরিমা ফরয ঘোষণা করা হয়েছে।

৬. অনুরূপভাবে সিজদার ফরজ আদায় করে মজ্জার শোকরিয়া এবং

৭. নামায শেষ করার ফরয আদায় করে চামড়ার শোকারিয়া আদায় করা হয়। চামড়া না থাকলে দেহের গোশত নষ্ট হতো এবং মানব দেহের চেহারার রূপ লাবণ্য বিনষ্ট হতো এবং দেহাভ্যন্তরের মূল্যবান যন্ত্রাংশ সমূহ ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হতো।

www.pathagar.com

১০. নামাযে নামাযীরা যা পড়েন

প্রতি ওয়াক্তে ফরয নামায আদায়ের পূর্বে অযু করা ও আযান দেয়া অবশ্য করণীয় এ অতীব প্রয়োজনীয় আযানের শব্দগুলো নিম্নরূপ ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহ বড়)- ২ বার

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ "(আমি সাক্ষ দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।)"-২ বার

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًرَّسُوْلُ اللّٰهِ "(আমি সাক্ষ দিচ্ছি যে মুহাম্মদ আল্লাহর প্রেরিত রসূল।)"- ২ বার

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ "(নামাযের জন্য এসো।)- ২ বার

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ "(যে কাজে কল্যাণ ও মঙ্গল সেই কাজের দিকে এসো)"- ২ বার

اَللّٰهُ اَكْبَرُ "(আল্লাহ বড়।)"- ২ বার

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ "(আল্লাহ ভিন্ন কোনোই মাবুদ নেই।)"- ১ বার

অযু ও তার দোয়া ঃ

অযুর শুরুতে পড়তে হয় ঃ

تَوَضَّوْا بِسْمِ اللّٰهِ অর্থাৎ ঃ "আমি মহান আল্লাহর নামে অযু করছি।"

জায়নামাযে দাঁড়ানোর দোয়া ঃ

اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

"নিশ্চয় আমি আসমান-যমিন সৃষ্টিকারীর দিকে মুখ করলাম এবং আমি কখনো মুশরিকদের দলভূক্ত নই।"

তাকবীর ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ –"আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।"

www.pathagar.com

ছানা

سُبْحَنَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبٰرَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

"হে আল্লাহ! আমরা তোমারই গুণগান করছি। তোমার বরকতপূর্ণ নাম এবং তোমারই গৌরব সবচেয়ে উচ্চ। তুমি ছাড়া কেউই মা'বুদ নেই।"

আউযুবিল্লাহ ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○

"বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্টকারিতা হতে তোমারই (আল্লাহর) সাহায্য চাচ্ছি।"

বিসমিল্লাহ ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

"সর্বদাতা করুণাময় আল্লাহ তা'আলার নামে আরম্ভ করছি।"

সূরা আল ফাতিহা ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ○ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○

"সারা জাহানের পালনকর্তা মহান আল্লাহর জন্যই সমগ্র ও সর্বপ্রকার তারীফ প্রশংসা। তিনি অত্যন্ত দয়াময় ও মেহেরবান। তিনি বিচার দিনের একমাত্র মালিক। যেদিন মানুষের যাবতীয় কর্মের বিচার করা হবে এবং প্রত্যেককে তার কর্মের ফল ভোগ করতে হবে। (হে মালিক) আমরা কেবল তোমারই ইবাদাত করি এবং কেবল তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সহজ সোজা সঠিক পথ দেখাও। তাদের পথ, যারা তোমার অনুগ্রহ ও পুরস্কারপ্রাপ্ত। আর যারা অভিশপ্ত ও ভ্রান্তপথে পরিচালিত নয়। হে আল্লাহ! আমাদের দোয়া কবুল কর।"

কুরআনের অন্য সূরা বা কয়েকটি আয়াত ঃ

এরপর কুরআনের কয়েকটি আয়াত সংযুক্ত করে পড়তে হয়। তবে সাধারণত কুরআনের ছোট পরিপূর্ণ একটি সূরাই নামাযে পড়া হয়ে থাকে। কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াতই অমৃতে পরিপূর্ণ। তাতে রয়েছে

www.pathagar.com

মানব জীবন পরিচালনার দিকনির্দেশনা, অমূল্য উপদেশ, শিক্ষা এবং সত্য পথের দিকে উদাত্ত আহবান। সূরা ফাতিহায় যে সহজ ও সোজা পথের জন্য দোয়া করা হয়। তাতে সেই সোজা পথেরই হেদায়াত ও বিবরণ দেয়া হয়েছে।

রুকূ'র তাসবীহ ঃ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمُ –"আমার মহান প্রতিপালক অতীব পবিত্র।"

তাসমি ঃ

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه –"আল্লাহর প্রশংসা করলে তিনি তা শুনতে পান।"

তাহমীদ ঃ

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ –"হে আমার প্রতিপালক, তোমারই সমস্ত প্রশংসা।"

সেজদার তাসবীহ ঃ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى –"আমার উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।"

তাশাহুদ আত্তাহিয়াতু ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ـ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

"সমুদয় প্রশংসা, সকল দৈহিক ইবাদাত এবং সর্ব আত্মিক আরাধনা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য নির্দিষ্ট। প্রেরিত পুরুষ (রসূল) আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কৃপা এবং অনুগ্রহ তোমারই উপর অবতীর্ণ হোক। এবং আমাদের ও ধর্মপরায়নের প্রতি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অনুকম্পা অবতীর্ণ হোক। আমি সাক্ষ প্রদান করছি যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন ভিন্ন আর কোনোই ইলাহ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ দান করছি যে, হযরত মুহাম্মাদ স. নিসন্দেহে আল্লাহর বান্দা ও রসূল।"

নামাযের দরূদ ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ

www.pathagar.com

اِبْرٰهِيْمَ ـ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

"হে আল্লাহ! মুহাম্মদ স.-এর উপর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর কৃপা বর্ষণ করুন। যেরূপ ইবরাহীম আ.-এর উপর কৃপা বর্ষণ করেছিলেন। নিশ্চয়ই তুমি বিজ্ঞ এবং প্রশংসনীয়। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ স.-এর উপর, তাঁর বংশধরগণের উপর অনুগ্রহ করুন যেরূপ ইবরাহীম আ.-এর উপর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর অনুগ্রহ অবতীর্ণ করেছিলেন। নিশ্চয় তুমি বিজ্ঞ এবং প্রশংসিত।"

দোয়া মাসূরা ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّاِنَّهٗ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

"হে আল্লাহ! আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে, যারা জন্ম লাভ করেছে এবং-করবে এরূপ মু'মিন নর-নারীক, মুসলমান পুরুষ এবং মুসলমান নারীকে এবং যারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে তাদের সকলকে তোমার অনুকম্পায় ক্ষমা কর, হে সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাময়।"

সালাম ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ـ

"তোমাদের প্রতি শান্তি এবং আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক।"

দোয়া কুনূত ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ ـ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ ـ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ـ

"হে আল্লাহ। তোমার সকাশে সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং তোমার সকাশে ক্ষমা চাচ্ছি। তোমারই প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও নির্ভর করছি।

www.pathagar.com

আমরা তোমারই মহত্ব প্রকাশ করছি এবং তোমারই নিকট কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমরা কৃতঘ্ন নই। যারা তোমার অবাধ্য, তাদের নিকট থেকে আমরা দূরে অবস্থান করি এবং আমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট নই। হে প্রতিপালক! আমরা তোমারই বন্দেগী করছি। তোমারই ইবাদাতের জন্য চেষ্টিত আছি। আমরা তোমারই কৃপা প্রার্থী। তোমার শাস্তিকে আমরা ভয় করি এবং নিশ্চয় কাফেরগণের জন্য দণ্ড নির্ধারিত।।

মুনাজাত ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ - وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - بِرَحْمَتِكَ يَاَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ -

"হে প্রভু! আমাদেরকে ইহ-পরকালের কল্যাণ কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে উদ্ধার কর এবং তোমার সৃষ্টির সর্বোত্তম মুহাম্মদ মোস্তফা স.-এর প্রতি, তাঁর বংশধর এবং সাহাবীদের প্রতি তোমার অনুকম্পা বর্ষিত হোক।"

❐

www.pathagar.com

১১. নামাযে পঠিত জিনিসসমূহের (দোয়াসমূহের) তাৎপর্য

সর্বপ্রথম "আযান" সম্বন্ধে ভেবে দেখুন। দৈনিক পাঁচবার আপনাকে কি বলে ডাকা হয়। ভেবে দেখুন এটা কত বড় শক্তিশালী ডাক। এ ডাক প্রত্যহ পাঁচবার আপনাদেরকে একথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, পৃথিবীতে যতোসব খোদায়ী দাবীদার দেখা যাচ্ছে, তারা সকলেই মিথ্যাবাদী। আকাশ ও পৃথিবীতে মাত্র একজনই খোদায়ী ও প্রভুত্বের অধিকারী এবং কেবল তিনিই ইবাদাতের বা উপাস্যের যোগ্য। তাঁরই আদেশ নিষেধ মেনে চলা উচিত। আসুন, আমরা সকলে মিলে একত্রিত হয়ে তাঁরই ইবাদাত (দাসত্ব) করি। ইবাদাতেই আমাদের সকলের জন্য ইহকালের ও পরকালের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত।

এ মর্মস্পর্শী আওয়াজ শুনে কে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে পারে ? যার অন্তরে বিন্দুমাত্র ঈমান আছে, এত বড় নির্ভীক সাক্ষ্য এবং এত স্পষ্ট আহবান শুনে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকা তার পক্ষে কোনো মতেই সম্ভব নয় এবং প্রকৃত প্রভু ও মালিকের দরবারে হাজির হয়ে তাঁর সম্মুখে মাথানত না করেও সে কোনো মতেই থাকতে পারে না।

এ ডাক শুনেই আপনি উঠে পড়েন এবং সর্বপ্রথমেই আপনি চিন্তা করে দেখেন আমি কি পবিত্র, না অপবিত্র ? আমার জামা কাপড় পাক কি না ? আমার অযু আছে কি ? অন্য কথায় আপনার সুস্পষ্ট অনুভূতি থাকে যে উভয় জাহানের বাদশাহের দরবারে হাজিরা দেয়ার বিষয়টি পৃথিবীর অন্যান্য সকল বিষয় থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। অন্যান্য কাজ তো সকল অবস্থাতেই করা যায়, কিন্তু এ মহান দরবারে শুধু দেহ ও কাপড়-চোপড়ের পবিত্রতাই যথেষ্ট নয়। অতিরিক্ত অযু একান্ত অপরিহার্য। এরূপ পবিত্রতা ছাড়া এখানে হাজিরা দেয়া ভীষণ বেয়াদবী। এ অনুমতির সাথেই আপনি প্রথমে পবিত্র হওয়ার কথা চিন্তা করেন এবং তারপর অযু করা আরম্ভ করেন। এ অযুর সময়ে যদি আপনি প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগ ধোয়ার সময় এবং অযু শেষ করার পর হযরত নবী করীম স.-এর শিখানো দোয়াসমূহও পাঠ করেন এবং আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে যথাযথরূপে স্মরণ করেন। তাহলে শুধু যে আপনার অংগ-প্রত্যংগই ধোয়া হবে তা নয় বরং আপনার অন্তরকেও ধৌত (পবিত্র) করা হবে।

www.pathagar.com

এরপর আপনি নামাযের জন্য দাঁড়ান। আপনার মুখ থাকে পবিত্র কেবলার দিকে। আপনি পাক-পবিত্র হয়ে সমগ্র জাহানের বাদশাহের দরবারে হাজির হন। সর্বপ্রথমে আপনার মুখ হতে বের হয় ঃ আল্লাহু আকবর—আল্লাহ সবচেয়ে বড়।

মনে ও মুখে এ বিরাট অঙ্গিকার উচ্চারণ করে আপনি দুনিয়া এবং দুনিয়ার যাবতীয় জিনিস হতে নিজকে সম্পর্কচ্ছেদ করার প্রতীক হিসেবে কান পর্যন্ত দুই হাত তোলেন এবং আপনার বাদশাহের সম্মুখে হাত বেঁধে দণ্ডায়মান হন। এরপর নিরতিশয় বিনয় সহকারে আপনি আরজ করেন, 'সানা'-এর মাধ্যমে—হে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন! আমি তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করছি তোমারই প্রশংসা সহকারে। 'তোমার নামের বরকত ও মাহাত্ম্য সত্যই অতুলনীয়। তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ, তোমার সম্মান সকলের উপরে। তুমি ভিন্ন কোনোই মা'বুদ নেই। (আউযু কেন পড়া হয় সে সম্পর্কে নবীর হাদীস সহীহ আল বুখারী হাদীস ৫৭৩ দেখুন।)

আউযুবিল্লাহর মাধ্যমে বলে থাকেন অভিশপ্ত মরদুদ শয়তানের কবল হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই এবং বিসমিল্লাহির মাধ্যমে বলেন মেহেরবান দয়াময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নামে শুরু করছি। শুরু হয় সূরা ফাতিহা ও কুরআনের অংশ পঠনের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সম্মান প্রদর্শন, সঠিক সরল পথে চলার জন্য সাহায্য প্রার্থনা এবং ঐশী সংবিধান ও এ সংবিধান অতীতে অবমাননা করার জন্য বিশ্ব জাতিসমূহের করুণ পরিণতি ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন।

মূলত সূরা ফাতিহা করুণ আবেদন পূর্ণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট একটি দরখাস্ত স্বরূপ। আমরা শিক্ষিত সমাজ যেমন উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো কিছু চাওয়া ও পাওয়ার জন্য "জনাব বিনীত নিবেদন এই যে" বা "I beg to state that" ইত্যাদি করুণ আবেদনে নিবেদনে পরিপূর্ণ দরখাস্ত পেশ করে থাকি, সূরা ফাতিহাও অনুরূপ বা তার চেয়েও অধিক তাৎপর্যময় শব্দ ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ একটি দরখাস্ত স্বরূপ। যার প্রতিটি শব্দের মধ্যে রয়েছে মানবজাতির জন্য বিরাট শিক্ষণীয় বিষয়, যেমন ঃ

১নং শিক্ষা

সূরা ফাতিহার শুরুই হচ্ছে "আলহামদুলিল্লাহ" এর মাধ্যমে। মানুষ যাতে উপকারীর প্রতি কৃতঘ্ন না হয়ে কৃতজ্ঞ হয় সে জন্য নামাযে দাঁড়িয়ে

www.pathagar.com

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সম্মুখে বিনীতভাবে আগেই স্বীকার করে নেয়া —সমস্ত প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য একমাত্র তুমিই আল্লাহ, অন্য কেউ নয়। দিনের সূর্যের কিরণ, রাতে চন্দ্রের স্নিগ্ধ আলোকচ্ছটা, ঋতুবৈচিত্রের মনোরম দৃশ্য, বিশ্বজাহানের নির্মাণ কৌশল, মানবদেহের প্রতিটি অমূল্য জীবন্ত যন্ত্রাংশ প্রদান এবং উপভোগ করার জন্য হাজারো রকমের নেয়ামত প্রদান ইত্যাদির জন্য দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মাধ্যমে শুরু হয় মানুষ ও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মধ্যে সেতুবন্ধন ও নিবীড় সম্পর্ক।

মানুষ যেহেতু সর্বক্ষণই অভাবী তাই সে সর্বক্ষণই কারো না কারো নিকট থেকে কিছু না কিছু সাহায্য সহযোগিতা পেতে চায়। তারপর যারই নিকট থেকে কিছু সাহায্য পেয়ে থাকে তারই গুণ-গান ও প্রশংসা করে পঞ্চমুখে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আল্লাহ "রব" হিসেবে তিনিই মানুষের যাবতীয় অভাব পূরণ করে থাকেন কিন্তু তা দেন কারো না কারো বা কিছু না কিছুর মাধ্যমে। আর মানুষ অজ্ঞতাবশত সেই মাধ্যমকেই প্রকৃত দাতা বলে মেনে নেয়। এভাবে অজ্ঞ মানুষেরা যারই মধ্যে জীবন ধারণের কোনো উপায় উপকরণ দেখতে পেয়েছে তখন তারই নিকট মাথা নত করেছে। এরই ফলে গাভী দুধ দিয়ে দেবতা হলো আর নিম ও তুলসী গাছের উপকারিতা দেখে তার গোড়ায় মাথা ঠেকিয়ে মানুষ সিজদা করলো। এভাবে জীব-জন্তু, গাছ-পালা, চাঁদ-সূর্য, পাথর, পীর-ফকীরের মাজার, গায়েবী দরগাহ, গায়েবী মসজিদ ইত্যাদি বহু কিছুর মধ্যে আল্লাহর রবুবিয়াতের অংশ রয়েছে বলে মানুষ মনে করেছে। মনে করেছে ঐসব স্থানে হাজত দিলে বা মানত করলে বালা মসিবতের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। এ ধরনের জাহেলী ধারণা যাদের মধ্যে রয়েছে তারা প্রকৃত ব্যাপার বুঝতে ভুল করেছে। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, রব বা প্রতিপালক হিসেবে আল্লাহই সবকিছুকে প্রতিপালন করেন তবে তা করেন, কারো না কারো বা কোনো কিছুর মাধ্যমে। সেই মাধ্যম গুলোর তালিকার মধ্যে রয়েছে পিতা-মাতা, গাভী, গাছ-পালা, ডাক্তার, কবিরাজ, ঔষধ-পত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক ও তার অন্তর্গত আল্লাহভীরু জ্ঞান সম্প্রদায় ইত্যাদি হাজারো রকমের ব্যবস্থাপনা। কিন্তু মানুষ ভুল করে ঐ মাধ্যম গুলোকেই রব বলে ধরে নিয়েছে—প্রকৃত রবকে বাদ দিয়েই। আর এটাই হচ্ছে শিরক। যেমন আমরা জন্মের পর পরই মায়ের মাধ্যমে দুধ পাই কিন্তু সে দুধ তৈরির মূল মালিক "মা" নয়, আল্লাহ রব্বুল আলামীন। কাজেই মায়ের মাধ্যমে দুধ পেয়ে "আলহামদুলি আম্মী" বলা সঠিক হবে না। বলতে হবে, "আল হামদুলিল্লাহ"। অনুরূপভাবে সূর্যের কিরণ থেকে

www.pathagar.com

উপকার পেয়ে "আলহামদু লিশশামস্" বলা ঠিক হবে না। বলতে হবে "আল হামদুলিল্লাহ।" অর্থাৎ উপকার করার বা প্রতিপালন করার মূল মালিক যেহেতু আল্লাহ রব্বুল আলামীন সেহেতু যে কোনো মাধ্যম থেকেই উপকার পেয়ে বলতে হবে "আলহামদুলিল্লাহ। মানুষ যাতে এ ব্যাপারে ভুল না করে সে জন্যেই প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সূচনালগ্নে বলা হয় "আলহামদুলিল্লাহ।"

মানুষ যার মাধ্যমে সাহায্য, উপকার বা মুক্তি পায় যদি তারই চূড়ান্ত প্রশংসা করে তবে সে কাজটা কেমন হয় তার দুটি উদাহরণ দিচ্ছি–দেখুন।

১. মনে করুন কোথাও একটি ঝড়ে ভাঙ্গা স্কুল মেরামতের জন্যে স্কুল কর্তৃপক্ষের আবেদন ক্রমে সরকারের তরফ থেকে ২০,০০০/- হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর হলো। আর মঞ্জুরীকৃত টাকা স্কুল কর্তৃপক্ষ পেলেন এক ব্যাংকের ক্যাশিয়ারের হাত থেকে। এ সাহায্য পাওয়ার পর স্কুল কর্তৃপক্ষ যদি ক্যাশিয়ারের হাত থেকে টাকা পেয়ে তাঁকেই মূল দাতা মনে করে, তারই প্রশংসা বা গুণ-গান করে, তবে সে প্রশংসা বা গুণ-গানটাও ঠিক হবে না তেমনি মানুষ কারো নিকট থেকে সাহায্য পেয়ে যদি তারই চূড়ান্ত প্রশংসা করে তবে সে প্রশংসাটাও ঠিক হবে না। সরকারের মঞ্জুরী ছাড়া যেমন ব্যাংকের ক্যাশিয়ার স্কুলের একটি টাকাও দিতে পারে না ঠিক তেমনি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মঞ্জুরী ছাড়া কেউ কাউকে এক বিন্দু পরিমাণও সাহায্য করতে পারে না।

২. অনুরূপভাবে একজন ডাক্তারের প্রচেষ্টায় কোনো লোকের গুরুতর রোগ আরোগ্য হওয়ায় যদি উক্ত লোকটি ডাক্তার মুক্তিদাতা হিসেবে প্রশংসা করে তবে ভুল করা হবে। কারণ ডাক্তার সাহেব যে জ্ঞান ও যে ঔষুধের মাধ্যমে লোকটির রোগ ভালো করলো সেই জ্ঞান ও ঔষধের মৌলিক উপকরণ যেমন ডাক্তার সাহেবের নয় এবং যিনি ঔষুধ তৈরি করেছেন তাঁর নয়। বরং স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামীনেরই। কারণ তিনি এ পৃথিবীর সবকিছু বৃথা সৃষ্টি করেননি বরং মানুষের শেফা ও কল্যাণের জন্য করেছেন। আর এজন্যেই যে কোনো মাধ্যম থেকে সাহায্য, উপকার ও মুক্তি পেয়ে বলতে হবে "আলহামদুলিল্লাহ" সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য। কিন্তু মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে এমন যে, মানুষ কাউকে মাত্র সাহায্য করলে তার বিনিময়ে সে কিছু না চাইলেও একটু প্রশংসা চায়।

এ চাওয়ার অর্থই হলো—যা পাওনা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের তা পেতে চাওয়া, যা চাওয়ার মধ্যেই নিহিত রয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের

www.pathagar.com

রুবুবিয়াতের দাবীদার হওয়া। আর সেই দাবী নীরবে মেনে নেয়াই হচ্ছে শির্ক। এ শির্ককে বলা হয় "শিরকে খফি" বা গোপন শির্ক। এ শিরকীর মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছেন বহু আল্লাহে বিশ্বাসীও। যাদের সম্পর্কে সূরা ইউসুফে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلاَّ وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ـ

"এদের অধিকাংশই আল্লাহকে মানে কিন্তু মানে এমনভাবে যে, তাঁর সাথে অন্যেরাও শরীক।"–সূরা ইউসুফ ঃ ১০৬

অর্থাৎ বহু ঈমানদার লোকই আছে যারা শিরকীর কাজ করছেন। তারা প্রতিমার পূজা করে মুশরিক নয়, তারা আল্লাহর রুবুবিয়াতের অংশ অন্যের মধ্যে রয়েছে বলে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে ধরে নেয় বা বিশ্বাস করে। ফলে তারা আল্লাহর প্রশংসার পরিবর্তে মানুষের বা কোনো শক্তির কিংবা কোনো বস্তুর প্রশংসায় হয় পঞ্চমুখ। এ ভুল থেকে উদ্ধার করার জন্যেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন নামাযের শুরুতেই শিক্ষা দিচ্ছেন। "আলহামদুলিল্লাহ।" অর্থৎ যিনিই এ বিশ্বজাহানের একচ্ছত্র মালিক তথা রব্বুল আলামীন। তিনিই হচ্ছেন চূড়ান্তভাবে প্রশংসা পাওয়ার হকদার এবং তিনিই হচ্ছেন 'রব'।

২নং শিক্ষা

"রব্বিল আলামীন " (জগতসমূহের প্রতিপালক।)

"রব" এমন একটি আরবী শব্দ যার হুবহু প্রতিশব্দ বাংলায় নেই। এটা একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। যার বাংলা অর্থ বলতে হলে অনেক গুলো শব্দ বলতে হবে। যথা 'রব' অর্থ অনঅস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দানকারী এবং অস্তিত্ব দানের সাথে সম্পর্ক যুক্ত আনুসঙ্গিক যাবতীয় কাজগুলোর ব্যবস্থাপক যথা প্রভু-প্রতিপালক, পর্যবেক্ষক, সংরক্ষক, পরিচালক, অভিভাবক, মুরব্বি, মনিব, মালিক, আইনদাতা, শাসনকর্তা, রাজা-বাদশাহ ইত্যাদি যা অস্তিত্ব দানের সাথে সম্পর্ক যুক্ত কার্যকলাপ তার সবগুলো গুণ বুঝানোর জন্যেই আরবীতে এক কথায় বলা হয় 'রব'।

'রব' শব্দের আরো পরিষ্কার ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, প্রতিটি জিনিসই যার অস্তিত্ব আছে তার ধ্বংসও আছে। আর ধ্বংস আছে তখনই যখন তাকে টিকিয়ে রাখার শক্তি যা সর্বক্ষণই প্রত্যেকটি অস্তিত্ববান জিনিসের প্রতি কার্যকর রয়েছে তা যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো জিনিসের উপর থেকে তুলে নিলে সে আর এক মুহূর্তের জন্য টিকে থাকতে পারে না। সেই শক্তি ও সেই ধরনের উপাদান যা প্রতিটি জিনিসকে টিকিয়ে রাখার জন্যে যা প্রয়োজন,

www.pathagar.com

তা যার হাতে আছে এবং যিনি তার যথাযথ ব্যবহার করে সবকিছুকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত টিকিয়ে রাখছেন তাকেই বলা হয় 'রব'।

টিকিয়ে রাখার উপায়-উপকরণ কথাটা শুনতে যত ছোট তার অর্থ তত ছোট নয়, বরং এর ব্যাখ্যা এতো ব্যাপক যে, তা মানুষের সাধ্য নেই তা বলে শেষ করতে পারে বা লিখে শেষ করতে পারে। তবুও ইশারা-ইংগিতে যেনো কিছুটা উপলব্ধি করা যায় সেজন্যে অতি সংক্ষেপে কিছু বলছি, যেমন ঃ

১. মানুষকে টিকিয়ে রাখার জন্যে প্রয়োজন তার খাদ্য, নিশ্বাস-প্রশ্বাসও মানবদেহের আভ্যন্তরীন মেশিনগুলো সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখা। তার জন্যে প্রয়োজন বায়ু, বায়ুর মধ্যে পরিমিত গ্যাসীয় পদার্থ, বায়ুর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ ও চাপ, জমিনের উপর দিয়ে চলা ফেরার জন্যে জমিনকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দেয়া, ইত্যাদি হাজারো ব্যবস্থাপনা চালু রয়েছে মানুষের পিছনে।

২. জীব-জানোয়ার যারা চাষাবাদ করে খেতে পারে না তাদের জন্যে বিনা চাষের খাদ্য ব্যবস্থা রাখা, যারা লেপ কাঁথা তৈরী করতে পারে না তাদের গায়ে ঘন পশম দিয়ে এবং পশমকে তাপ অপরিবাহি করে পশমের মাধ্যমে লেপ কাঁথার প্রয়োজন মেটানো, যাদের চোখ নেই (যেমন উঁই পোকা) তাদের অন্ধ অবস্থায় বাঁচার ব্যবস্থা করা, মাছ যেমন শীতের পানিতে বাস করতে পারে যেন সর্দি কাশিতে আক্রান্ত না হয় তেমন ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বহু ধরনের ব্যবস্থাপনা কার্যকর রাখা।

৩. আকাশের বা মহাশূন্যের মধ্যে পৃথিবী সহ যত গ্রহ-উপগ্রহ ও জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী রয়েছে তাদের প্রত্যেকটিকে এমন যুক্তিসংগত দূরত্বে রাখা এবং তাদের প্রত্যেকটিকে এমন নিজস্ব আকর্ষণ শক্তি দেয়া যেনো চ্যালেঞ্জারের মতো ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয় বা স্কাইলারের ন্যায় একটা আরেকটার মধ্যে ঢুকে না পড়ে অর বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা রাখা ইত্যাদি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ব্যবস্থা যিনি তাঁর সৃষ্টির প্রতি সার্বক্ষণিকভাবে কার্যকর রেখেছেন তিনিই হচ্ছেন 'রব্বুল আলামীন'। এমন যিনি 'রব' তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা অন্য কারোর জন্য নয়।

৩ নং শিক্ষা

"আর রাহমানির রাহীম" দাতা দয়ালু। যিনি আমাদের 'রব' তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও দাতা। কেমন করে তা দেখুন—

www.pathagar.com

আমরা যখন অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় পৃথিবীতে আসতে বাধ্য হচ্ছি তখন দয়ালু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের জন্য মায়ের ও পিতার বুকে অঢেল স্নেহ মায়া-মমতা এবং আমাদের স্বাস্থ্যের উপযোগী করে খাদ্য সরবরাহ করে থাকেন। মানুষ যদি শুধুমাত্র এ দুধ তৈরির বিষয়টি নিয়েই চিন্তা-ভাবনা করে, তবে তার জীবন শেষ হয়ে যাবে কিন্তু দুধ তৈরির খোদায়ী রহস্য কেউ উদঘাটন করতে পারবে না। একবার ভেবে দেখুন, যে শিরা-উপশিরাগুলোতে দুদিন আগে লাল রং-এর রক্ত প্রবাহিত হয়েছে সেই শিরা-উপশিরাগুলোই এক নির্দষ্ট সময়ে সাদা রং দুধে ভর্তি হয়ে পড়ে আর সে দুধ যেনো তার সন্তান পান করতে পারে সে জন্যে সমস্ত দুধের শিরাগুলোর মুখ একই স্থানে এনে তা নির্দিষ্ট বহির্গমন শিরার সাথে সংযোগ করে দেয়া হয়েছে এবং তা এমন কৌশলে সংযোগ করে দেয়া হয়েছে যে, সন্তান মুখ দিয়ে চুষলেই দুধ তার গালের মধ্যে চলে আসবে। এ ছাড়াও দুধটা প্রথম দিকে অত্যন্ত পাতলা ও লঘুপাক হয় যাতে ছোট বাচ্চার পরিপাক যোগ্য হয়। অতপর যতই সন্তান বড় হতে থাকে ততই তার পাকস্থলীকে সবল করে গড়ে তোলার জন্যে তার একমাত্র খাদ্য দুধকে ক্রমেই গাঢ় করে দেয়া হয়। এতে পাকস্থলীও ক্রমে ক্রমে সবল হয়ে ওঠে। শুধু কি তাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় বিচারক এবং পরম করুণাময় তার একটি ক্ষুদ্র প্রমাণ নিম্নোক্ত ঘটনাটি ঃ

হযরত ওমর রা.-এর খেলাফত কালে হযরত আলী রা.-এর নিকট এক বিচার এলো। একই ঘরে একই সময়ে দু'জন নারী দুটো সন্তান প্রসব করেছে—তার একটি ছিলো কন্যা, অপরটি ছিলো পুত্র। কন্যা সন্তানের মালিক তার মেয়েটিকে হঠাৎ করে পুত্র সন্তানের সাথে বদল করে ফেলেছে যা তার মা টের পায়নি। কিন্তু পরে তার (কন্যার) চেহারা দেখে পুত্র সন্তানের মা অভিযোগ করলো যে, আমাদের ছেলেকে তুমি বদল করে নিয়েছো। শেষ পর্যন্ত এর জন্যে মামলা দায়ের হলো। বিচার গেলো হযরত আলী রা.-এর কাছে। তিনি উভয়ের স্তনের দুধ নিয়ে পরীক্ষা করে বলে দিলেন সন্তান সত্যই তারা বদল করেছে। হযরত ওমর ফারুক রা. হযরত আলী রা.-কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি করে বিচার করলে ? জবাবে হযরত আলী রা. বললেন, আল্লাহ বলেছেন, "মিরাসী ভাগের বেলায় মেয়েদের দ্বিগুণ পুরুষের জন্য" এর থেকে ইংগিত পাওয়া যায় পুরুষ সন্তানের দুধ হবে মেয়ে সন্তানে দুধের ২ গুণ গাঢ়। যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক। আল্লাহর এ ইংগিত অনুযায়ী দুধ

www.pathagar.com

পরীক্ষায় দেখলাম যার দুধ গাঢ় তাকে পুত্র সন্তান দিয়েছে এবং যার দুধ পাতলা তাকে কন্যা সন্তান দিয়েছে।

এখানেই শেষ নয়। তিনি যে অত্যন্ত দয়ালু দাতা তার বড় প্রমাণ পিতা মাতার অন্তরে দেয়া মহব্বত বা স্নেহ, মায়া-মমতা। দেখুন যে মা একদিন অন্যের সন্তানের পেশাব পায়খানা দেখে নাকে মুখে কাপড় গুঁজে হুয়াক হুয়াক করতে করতে পালাতো বা নাক শিটকাত এবং ঘৃণায় দূরে সরে যেতো সেই মায়েরই মন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এমন করে দিলেন যে, (শুধুমাত্র নিজের) সন্তানের পেশাব পায়খানা পরিষ্কার করার বেলায় মা সম্পূর্ণ মেথরানী স্বভাবের হয়ে পড়লো এবং তাতে তার বিন্দুমাত্রও অস্বস্তি বোধ হয় না। মানব সন্তানের প্রতি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এটা একটা মস্তবড় রহমত।

আবার দেখুন, মানব সন্তান যখন বড় হয় তখন তাদের অভাব মেটানোর জন্য কত হাজারো রকমের নেয়ামত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দান করে থাকেন। হাজারো রকমের ফল-মূল, খাদ্য শস্য, উপভোগ করার জন্য কথা, নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী, মনের খোরাক এবং স্বামী-স্ত্রীর প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসা জোসনাময় রজনী এবং পাখীর কলরব ও ভোরের পবিত্র দৃশ্যাবলী, চাঁদ-সুরুজ, গ্রহ নক্ষত্র, জোয়ার ভাটা, অমাবস্যা-পূর্ণিমা, ঋতুর পরিবর্তন, দিন-রাত, বায়ু, পানি, বায়ুর মধ্যে অক্সিজেন ও অন্যান্য গ্যাসীয় পদার্থ, মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়, তুফান, বিজলীর ঝলক, মেঘের ডাক, পাহাড়-পর্বত, ঘনবন, বনের হরিণ-হরিণী, হরেক রকমের গাছ, লতা-পাতা, বহু ধরনের প্রাণী, নানা ধরনের শিলা-পাথর, বিভিন্ন প্রকার ধাতু, ধাতুর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার শক্তি সম্ভার, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি এর কয়টার নাম বলবো ? এভাবে সারা জীবন ধরে মানুষ যত প্রকার জিনিসের নাম করতে পারবে তার সবটুকুই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দান ও দয়া।

আপনি চেয়ে দেখুন, কোনো দিকে আপনার নজর পড়েছে ? যার দিকেই নজর পড়ে তারই কথা চিন্তা করুন। দেখবেন তার গায়েই লেখা আছে "আর রাহমানুর রাহিম" তিনি দয়ালু দাতা। দেখুন, রাস্তার দিকে তাকান দেখছেন, কয়েকটা গরু ছাগল বাঁধা রয়েছে আর কিছু হাঁস-মুরগী চরছে। এবার বেশী নয় শুধু এ কয়টা জীবের প্রতি লক্ষ করুন, দেখুন আপনার প্রতি দয়া প্রদর্শনের নিয়ামতই ঐগুলোর সৃষ্টি কি না। চেয়ে দেখুন গাভীর প্রতি। আপনি তার দুধ খাবেন, তার গোশ্ত খাবেন, তার হাড় দিয়ে সার তৈরি করবেন, তার গোবর সারের কাজে লাগাবেন, জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করবেন, চামড়া দিয়ে জুতা, সুটকেস, মানিব্যাগ ইত্যাদি ধরনের

www.pathagar.com

কত মূল্যবান জিনিস তৈরি করবেন। আর বকরী ও হাঁস মুরগীগুলো যারা শৃগালকে শত্রু ও আপনাকে বন্ধু মনে করে। কিন্তু শৃগাল তার কয়টা হাঁস-মুরগী নষ্ট করে আর আপনি তো তার সবকটাই জবাই করে খেয়ে ফেলেন। তবুও তারা আপনাকে শত্রু মনে করে না। আপনার ঘর ছেড়ে পালায় না। এটাও কি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দয়া নয় ? সবই দয়ালু দাতা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মানব জাতির প্রতি দয়া ও করুণা। আর এ অবদানের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের নিকট কোনো টাকা পয়সা বা ধন সম্পদ চান না। চান যেটা, তা হচ্ছে এ অবদানের স্বীকৃতি ও সম্মান। কিন্তু মানুষ কত অকৃতজ্ঞ ও নেমকহারাম যে রবের দেয়া এ অঢেল নেয়ামত উপভোগ করে ও দাতার প্রতি এতটুকু কৃতজ্ঞতা (শোকরিয়া) প্রকাশ করতে চায় না বরং একশ্রেণীর কৃতঘ্ন মানুষ তার রবকেই অস্বীকার করে বসে। কিন্তু একজন ভাবুক নাস্তিক তখনই বুঝতে পারে তার রবের করুণা ও দয়ার মূল্য যখন তার একটি কিডনী বা চক্ষু নষ্ট হয়ে যায়। লক্ষ কোটি টাকা দিলেও হারানো এ অমূল্য জিনিসের মত অরিজিনাল কিডনী বা চক্ষু পাওয়া যায় না। ঐরূপ আর উপভোগ করা যায় না যেরূপ ইতিপূর্বে সে তার রবের দেয়া জিনিস উপভোগ করতো। এখন প্রশ্ন হলো —আল্লাহ তাঁর নাফরমান বিদ্রোহী বান্দাদের আহার যোগান কেন ? এর জবাব, আল্লাহ শুধু তাঁর রবুবিয়াতের দায়িত্ব পালন করার জন্যই তার আহার যোগান এবং জীবিত রাখেন যদি সংশোধিত হয়ে যায় এ আশায়।

৪ নং শিক্ষা

"মালিকি ইয়াওমিদ্দীন" বিচার বা প্রতিফল দিবসের মালিক আল্লাহ যদি "আর রাহমানির রাহিম" বলে আর কিছু না বলতেন তাহলে মানুষ মনে করতো "যত পার করো পাপ খোদা করবেন মাফ" কেননা তিনি রহীম ও রহমান। এ ধারণাকে চেক (Cheeck) দেয়ার জন্যই আল্লাহ সাথে সাথে বললেন, আমি রহীম রহমান ঠিকই কিন্তু সেই সাথে আমি 'মালকি ইয়াওমিদ্দীন'ও বটে। পরকালের প্রতিফল দিবসের আমিই মালিক। সেদিন কারো মধ্যে কোনো অপরাধ পাওয়া গেলে তাকে ছাড়া হবে না। তাকে তার প্রতিফল অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

এখন প্রশ্ন হলো—বিচার দিবসের সত্যিই কি প্রয়োজন আছে বা সত্যিই কি পরকালে বিচার হবে ? অথবা আদৌ কি বিচার করার প্রয়োজন ছিল ? অথবা হওয়া উচিত ? মরে গেলেই তো সকল ঝামেলা শেষ হয়ে গেলো। মাটির দেহ মাটিতে পচে গলে নিঃশেষ হয়ে গেলে বা আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেলে তার আবার বিচার হবে কেমন করে ?

www.pathagar.com

যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের 'রব' অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দানকারী সেহেতু উক্ত পচে গলে যাওয়া বা ভস্ম হয়ে যাওয়া অণু-পরমাণু গুলো একত্রিত করে আবার মানুষের রূপ দিয়ে প্রাণ সঞ্চার ও জীবন্ত করতে পারবেন। ইথারে যেমন নাচ-গান, খেলা-ধুলা এবং সংবাদের খবরাদি ভেসে বেড়ায়, রেকর্ড হয়ে থাকে মানুষের সকল কর্মের তালিকাও আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নির্দেশে সংরক্ষিত হয়ে রয়েছে—যাকে আরবীতে "আমলনামা" বলা হয়ে থাকে। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দুজন স্পেশাল কর্মচারী মানুষের এ আমলনামা সংরক্ষণ করছেন যাদেরকে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে "কিরামান কাতিবিন" বলে অভিহিত করা হয়েছে। মানব কাঠামোর অভ্যন্তরে যে আত্মারূপ মানুষ এ পার্থিব জীবনে কর্ম করে গেলো তা যাচাই বাছাই এবং পরিমাপ ও বিচারের দিন হলো "আখেরাত" ঐদিন আমাদের পার্থিব জীবনের ২৪ ঘন্টার দিন নয়। এদিন হযরত আদম আ. হতে কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবে তাদের প্রত্যেকের চুলচেরা বিচার করতে যত সময় লাগবে ততো সময় ধরে একটা দিন। যেখানে এক এক জন মানুষকে সারা জীবনের বিচারের জন্যে কারো ক্ষেত্রে হয়ত হাজার বছর সময়ও লেগে যেতে পারে। আর এভাবে প্রত্যেকের হিসাব নিতে যত সময় প্রয়োজন হবে তত সময় নিয়েই হবে সেই দিনটি।

এমন একটা চূড়ান্ত বিচারের দিন হওয়া বা থাকা যে একান্ত প্রয়োজন তা আপনি একটু নিরপেক্ষ মন নিয়ে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন ।

ধরুন একজন অপরাধী সারা জীবন ধরে অপরাধ করেছে এবং বহু লোককে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। এখন এ পার্থিব জীবনে তাকে সঠিকভাবে বিচার করতে হলে তাকে বহুবার হত্যা করা উচিত হবে। কিন্তু এ জীবনে একবার মারলে আর জীবিত করা যায় না। আর যায় না বলেই এ পৃথিবীর একজন ন্যায়বান বিচক্ষণ বিচারক তার সঠিক ন্যায় বিচার করতে পারেন না। অথবা ওকালতির কঠিন প্যাঁচে, দলীয় করণে, টাকার প্রলোভনে, শহীদের ইয়াতীম ছেলে মেয়ের ছেলেহারা মায়েরা এবং বিধবা নারীরা কপট বিচারকের নিকট থেকে ন্যায় বিচার পেলো না এ জীবনে। তাই যদি চলে বা চলতে দেয়া হয় তবে এ মহাবিশ্ব বহু পূর্বেই বিশৃংখলা জনিত কারণে শেষ হয়ে যেতো। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তা করতে বা হতে দেবেন না। বিবেকও এটা দাবী করছে যে, অপরাধীর ন্যায়বিচার হওয়া উচিত। আর উচিত বলেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন এমন একটা দিনের ব্যবস্থা করে রেখেছেন যে দিন প্রত্যেক ব্যক্তির সঠিক সুষ্ঠ বিচার করা যেতে পারে। আর এজন্যই তিনি "মালিকি ইয়াওমিদ্দীন।"

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত, একটা লোক এমন একটা জনহিতকর কাজ করে গেল যার দ্বারা এ পৃথিবীর মানুষ যুগ যুগ ধরে উপকৃত হতে থাকলো। এর প্রতিদান তার পাওয়া উচিত কি না ?

বিবেক অবশ্যই বলবে হ্যা, এমন মহৎ ব্যক্তির অবশ্যই প্রতিদান দেয়া উচিত। কিন্তু সে তো এ পৃথিবী ছেড়ে বহু পূর্বেই কবর বা শ্মশানবাসী হয়েছে। কি করে তার প্রতিদান দেয়া যাবে। "আত্মা" যেহেতু অমর তাই সে আলমে বরযখে বা মধ্যবর্তী অবস্থানকালে বিচার দিবসে যাতে লজ্জিত না হন এজন্য তার কর্ম তালিকায় নেকী বা পুন্য জমা হতে থাকে যতদিন পর্যন্ত পৃথিবী ধ্বংস হয়ে সেই ইয়াওমুদ্দীন না আসে। বলা বাহুল্য, যেহেতু ইয়াওমুদ্দীন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একটিই মাত্র নির্ধারণ করে রেখেছেন সেহেতু পৃথিবী ধ্বংস না হওয়া অবধি তিনি কোনো মানুষের চূড়ান্ত বিচারে বসবেন না। আর এ জন্য শেষ বিচারের দিন না আসা পর্যন্ত মানুষের কর্মের দ্বারা সমাজের মানুষ যে ভাবে উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেই অনুযায়ী মানুষের আমলনামায় নেকী বা বদী যোগ হতে থাকবে।

'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন" সেই আমলনামার উপর ভিত্তি করে মানুষের সঠিক সুষ্ঠ ন্যায়বিচার করবেন এবং তার প্রতিফল দান করবেন। এ দান তার কর্ম অনুযায়ী হয় মহা সুখময় স্থান জান্নাত হবে, না হয় মহা দুঃখময় স্থান জাহান্নাম হবে। সেদিন ঘুষের টাকা হয়ে যাবে অচল। উকিলি প্যাঁচের সকল প্যাঁচ কেটে ইয়া নাফসী ইয়া নাফসী রব উঠবে। বিচারক আসামীর কাঠগড়ায় কয়েদীর ন্যায় দণ্ডায়মান হবে এবং দেশের সকল প্রেসিডেন্ট দর্প চূর্ণ হয়ে ভূলুণ্ঠিত হবে এবং ইয়া নাফসী ইয়া নাফসী বলে চিৎকার করতে থাকবে। মালিকি ইয়াওমিদ্দীনের করুণা লাভের জন্য উৎসুক নয়নে ঘর্মাক্ত হয়ে চেয়ে থাকবে।

৫নং শিক্ষা

"ইয়্যা কানা'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন" আমরা তোমারই দাসত্ব করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য চাই।

এখন দেখা যাক "মালিকি ইয়াওমিদ্দীন" বলার পরপরই কেন ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন" বলা হলো। এর কারণ এই যে, যারাই পরকালের বিচার ও প্রতিফল দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হবে তাদেরই অন্তরে একটা ভয় সৃষ্টি হবে যে, তাহলে মালিকি ইয়াওমিদ্দীন" এর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায়টা কি ? তখন তার মন থেকেই একথা বেরিয়ে

www.pathagar.com

আসবে যে, ইয়্যা কানা'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন। হে আল্লাহ আমরা তো তোমারই দাসত্ব করি এবং ভবিষ্যতেও তোমারই হুকুম মেনে চলবো বা তোমারই দাসত্ব করবো এবং আমাদের যাই কিছু প্রয়োজন হয় তা একমাত্র তোমারই নিকট চাই এবং ভবিষ্যতেও আমাদের যখন যা প্রয়োজন হবে তা তোমারই নিকট চাইবো। আর আমরা যদি এভাবে সারা জীবন তোমারই দাসত্ব করি এবং যদি কোনো ব্যাপারেই আর কারো দাসত্ব না করি এবং কখনো আর কারো আল্লাহ বিরোধী হুকুম না মানি আর যদি কোনো ব্যাপারেই দুনিয়ার কারোর মুখাপেক্ষী না হই একমাত্র তোমারই মুখাপেক্ষী হই তাহলে তুমি "মালিকি ইয়াওমিদ্দীন" হওয়ায় আমাদের কোনো ভয়ও নেই এবং কোনো ক্ষতিও নেই।" না'বুদু ও নাস্তাঈন" শব্দ দুটি এভাবে পাশাপাশি আনার অর্থ হলো এই যে, যেহেতু চেয়ে পাওয়ার মধ্যেই রয়েছে দাসত্বের প্রবণতা আর যেহেতু আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাস হওয়া বা অন্য কারো হুকুম মেনে চলার অর্থই হলো আল্লাহর ইবাদাতের রাস্তা থেকে সরে শিরকী রাস্তায় পা বাড়ানো। আর মুসলমান যেহেতু বিশ্বাস করে যে, আমরা যা পাই তা যার মাধ্যমে পাই না কেন, প্রকৃত দেনেওয়ালা একমাত্র আল্লাহই। কাজেই যা চাওয়ার দরকার তা অন্যের নিকট চেয়ে লাভ নেই। তাই যিনিই মূল দাতা তারই নিকট চাইবো। আর তা যার থেকে পাই, তাঁরই হুকুম মেনে চলাটাই হচ্ছে মুক্তির দাবী। তাই একমাত্র তাঁরই হুকুম মেনে চলবো। হ্যাঁ তবে মনে রাখতে হবে যে, সাহায্য আল্লাহ করেন কিন্তু করেন কিছু না কিছুর মাধ্যমে। কিন্তু অজ্ঞ লোকেরা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে ঐ মাধ্যমকেই প্রকৃত দাতা মনে করে এবং আল্লাহর হুকুমের পরিবর্তে ঐসব মাধ্যমগুলোর হুকুম মেনে চলে। ফলে তারা আর আল্লাহর দাস থাকে না—দাস হয়ে পড়ে ঐ সব সাহায্যদাতা মাধ্যমগুলোর।

তাই এ দুষ্ট প্রবণতাকে বন্ধ করার জন্যেই আল্লাহ বলেন, যেহেতু তোমরা সাহায্য পাওয়ার কারণেই সাহায্যদাতার দাসত্ব কর তাই সাহায্য চাও একমাত্র সেই রবের নিকট যিনি প্রকৃত সাহায্যদাতা। তাহলে তোমরা প্রকৃত রবের দাসত্ব করতে পারবে। এ অনুভূতি মানুষের মধ্যে জাগ্রত করে দেয়ার জন্যেই 'না'বুদু' ও 'নাস্তাঈন' শব্দ দুটি পাশাপাশি আনা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত ঃ আল্লাহ রব্বুল আলামীনের হুকুম দুই প্রকারের। যথা ঃ

১. এমন হুকুম যা মানলে বা মানতে গেলে কারো স্বার্থে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না এবং কারো হুকুমের সাথে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় না। সাধারণত এ ধরনের হুকুমগুলো আমরা মানি। মানতে পারি।

www.pathagar.com

২. আবার এমন কিছু আল্লাহর হুকুম রয়েছে যা মানতে গেলে কারো না কারো স্বার্থে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং কারো না কারো হুকুমের সাথে বিরোধ বাধে। দেখা যায় এ ধরনের হুকুমগুলো আমরা মানি না কারণ তা মানার মত কোনো পরিবেশ এ সমাজে নেই। যেমন আল্লাহ রব্বুল আলামীন যতবার বলেছেন নামায (সালাত) আদায় কর ততবার বলেছেন যাকাত দাও। কিন্তু যেহেতু নামায পড়তে স্বার্থ হানির কোনো কিছু নেই সেহেতু নামায অনেকেই পড়ে কিন্তু যেহেতু যাকাত দিতে গেলে স্বার্থে বাঘাত সৃষ্টি হয় অর্থাৎ পকেট থেকে টাকা বের করতে হয় সেহেতু যত লোক নামায ফরয হওয়ার কারণে নামায পড়ে তত লোক যাকাত ফরয হওয়ার কারণে যাকাত যে দেয় তা নয়। ঠিক তেমনিভাবে সুদ, ঘুষ, যৌতুক ইত্যাদি ধরনের অনেক কিছুই হারাম হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু তা লোভনীয় এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ বিজড়িত তাই নামায পড়েও অনেকে ঐ সব অবৈধ কার্যকলাপ ত্যাগ করতে পারে না। এ ছাড়া যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম ও শক্তিধরদের হুকুমের মধ্যে বিপরীতমুখী দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় তখন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আল্লাহর হুকুম বাদ দিয়ে অনেকেই শক্তিধরদের হুকুম মেনে চলে।

যেমন আল্লাহর হুকুম হলো সমাজে সুদ থাকতে পারবে না, সেখানে শক্তিধরদের হুকম হলো সুদ থাকতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে একই ব্যাপারে যখন আমরা দুই বিপরীতমুখি হুকুমের সম্মুখীন হই তখন আমরা অনেকেই আল্লাহর হুকুম বাদ দিয়ে শক্তিধরদের হুকুমকেই মেনে নিই। এরূপ ক্ষেত্রে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দাসত্ব করা হয় না। দাসত্ব করা হয় তার, যার আইন ও হুকুম মেনে চলি। এ ধরনের কোনো ক্ষেত্রে মানুষ যতই বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হোক না কেনো সে যেন আল্লাহ ছাড়া আর কারোর দাসত্ব না করে এবং আল্লাহর বান্দা হয়ে যেন আর কারো মুখাপেক্ষী না হয় সেই অনুভূতি সৃষ্টি করার জন্যেই "না'বুদু" ও নাস্তাঈন" শব্দ পাশাপাশি ব্যবহার করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে আল্লাহর বান্দা হতে হলে সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহরই হুকুম মানতে হবে। তাহলেই "মালিকি ইয়াওমিদ্দীন" এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে, নইলে নয়।

কিন্তু এমন কিছু ক্ষেত্র রয়েছে, যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হুকুম মানার পথে বিরাট রকমের বাধার সৃষ্টি হয়। সেসব ক্ষেত্রে যেনো হাজারো বাধার সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও এবং মারধর খেতে হলেও কিংবা জানমাল সবকিছু বিসর্জন দিয়ে হলেও যেন আল্লাহর হুকুমের বিপরীত কোনো হুকুম না মানি সে শিক্ষাও রয়েছে "না'বুদু" ও "নাস্তাঈন" শব্দ

www.pathagar.com

দ্বয়ের মধ্যে। এ ধরনের ক্ষেত্রগুলো বুঝানোর জন্যে আমি একটা উদাহরণ পেশ করছি, যার থেকে বুঝতে সহজ হবে যে, কোন্ কোন্ ধরনের ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম পালন করা কষ্টকর।

দেখুন আমরা প্রত্যহ যখন নামাযে কম করে হলেও অন্তত ৪০ বার আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে বলি যে, 'ইয়্যাকা না'বুদু' আমরা তোমারই দাসত্ব করি, সেখানে আমরা সত্যই কি বুঝি যে, দাসত্ব করার অর্থ কি ? দাস হলে তাকে অবশ্যই দাস স্বভাবের হতে হবে। যেমন মনে করুন, কোনো ব্যক্তি ২০ জন চাকর রাখলো। তাদের বলে দিলো তোমরা আমার অমুক জমিটা চাষ করবে। সেখানে গমের আবাদ করবো। আমি তোমাদের জন্যে সেখানেই থাকা-খাওয়ার ইত্যাদি যাবতীয় ব্যবস্থা করবো এবং উপযুক্ত বেতন দেব। চাকরগুলো সেখানে গিয়ে যদি দেখে যে, তার মালিকের জমি অন্যে জোর করে দখল করে সেখানে তামাকের চারা লাগিয়েছে। ঐ চাকরগুলো সেখানে হাল চাষ করতে গেলে জবরদখলকারী ধমক দিয়ে বললো "হাল গরু রাখ এবং আমার সাথে আমার লাগানো তামাকের চারার গোড়ায় পানি ঢাল।" চাকরগুলো যদি তাই করা শুরু করলো। তখন তাতে প্রকৃতপক্ষে দাসত্ব করা হয় কার ? তাদের মূল মালিকের না জবরদখলকারীর ? এ প্রশ্নের জবাবে প্রত্যেকেই বলবে তাদের দাসত্ব মূল মালিকের হয় না, হয় জবরদখলকারীর। অনুরূপভাবেই আমরা যদি প্রতিটি সামাজিক ক্ষেত্রে মূল মালিকের হুকুমের পরিবর্তে আল্লাহর যমিন জবরদখলকারীর হুকুম মেনে চলি অর্থাৎ আল্লাহ বললেন চুরি করলে তার হাত কেটে দাও যদি আমরা সেখানে জবরদখলকারীর হুকুম মত চুরির উত্তম ট্রেনিং লাভের জন্যে বড় বড় চোরদের সাথে ৬ মাস জেলখানায় ট্রেনিং ক্যাম্পে রাখার ব্যবস্থা করি ; এভাবে আল্লাহ বললেন সুদ হারাম সেখানে আমি সারা জীবন সুদের টাকা খেয়ে সুদের হিসেব করে যা বেতন পেলাম তা দিয়েই সংসার চালালাম, হজ্জ করলাম, যাকাত দিলাম ইত্যাদি নেক কাজ করলাম ; আল্লাহ বললেন জেনার শাস্তি স্বরূপ সঙ্গেসার কিংবা ১০০ দোররা মার আর জবরদখলকারীর হুকুম হলো উভয়ের সম্মতিতে ব্যাভিচার হলে কোনো অপরাধ নেই। এভাবে আল্লাহর হুকুমের সাথে যেখানেই বেদখলকারীর হুকুম দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে সেখানেই জবরদখলকারীর হুকুম যদি মানি তাহলে কি 'ইয়াকা না'বুদু' বলে আল্লাহর কাছে যা স্বীকার করি তা বাস্তবে পালন করা হয় ? মোটেই না। সত্যিকারের মূল মালিকের হুকুম মত যদি ঐ চাকরগুলো জবরদখলকারীর তামাকের চারার শিকড় সমেত তুলে ফেলে দিত তবেই তার মূল মালিকের

www.pathagar.com

হুকুম মানা হতো। হ্যাঁ তবে তা করতে গেলে তাদের (ঐ চাকরদের) অবশ্যই সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হতো। তাদের মারধরও খেতে হত। কিন্তু তারা যদি মূল মালিকের হুকুম মানতে গিয়ে মার খেত তবে মূল মালিক কি শুধু দূরে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখতেন ? তা কিছুতেই না।

তিনি তৎক্ষণাত তাঁর চাকরদের সাহায্যে এগিয়ে আসতেন। এতে কিছু মারধর খেতে হলেও মূল মালিকের দাসত্ব করা হত এবং মূল মালিকের নিকট বেতন পাওয়া যেত। কিন্তু বেদখলকারীর হুকুম মত তামাকের চারার গোড়ায় পানি ঢাললে তাতে মূল মালিকের বেতন পাওয়া যায় না। এ ধরনের ক্ষেত্রে আল্লাহর বান্দাদের কি করতে হবে তা বলতে গিয়ে আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا ○

"তারা (আমার বান্দারা) যেন আমার দাসত্ব করার ক্ষেত্রে অন্য আর কাউকে আমার সাথে শরীক না করে।"–সূরা আল কাহ্‌ফ ঃ ১১০

অর্থাৎ আমার হুকুমের সাথে যারই হুকুম বিরোধ সৃষ্টি করবে তারই হুকুম না মেনে আল্লাহর হুকুম মানবে। চিন্তা করুন, যারা প্রত্যহ কমপক্ষে নামাযে ৪০বার আল্লাহর নিকট ওয়াদা করে যে, আমরা সামগ্রিক জীবনে তোমারই হুকুম মেনে চলবো সেখানে আল্লাহর সাথে ওয়াদা করে যদি সামগ্রিক জীবন যাপনের ক্ষেত্রে বেদখলকারীর হুকুম মেনে চলি তাহলে কি আল্লাহর সাথে মুনাফেকী করা হয় না ? এবং এতেই কি মালিকি ইয়াওমিদ দীনের হাত থেকে রেহাই মিলবে ? তা মিলবার কথা নয়।

এখন প্রশ্ন হলো, তাহলে বেদখলকারীর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায়টা কি ? তার জবাব হচ্ছে জিহাদী আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামী সমাজ তৈরি করা—যেন আল্লাহর হুকুম মানতে পারার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। যেমন নবী করীম স. বদর, উহুদ, খন্দক, ইত্যাদি জিহাদে অংশ গ্রহণ করে সেরূপ একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন।

৬নং শিক্ষা

"ইহ্‌দিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম"–'দেখাও আমাদের সরল সোজা পথ।' পূর্ববর্তী আয়াতে আমরা যখন না'বুদু বলে আল্লাহর নিকট শপথ গ্রহণ করেছি যে, "হে আল্লাহ আমরা তোমারই দাসত্ব করবো।" তখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এটা জানার যে, কোন্ পথে চললে তাঁর পুরোপুরি দাসত্ব করা হবে।

www.pathagar.com

অতপর যখনই তার মনে প্রবল আকাংখা সৃষ্টি হবে আল্লাহর দাসত্ব করার পথ চেনার, তখনই সে বিনীতভাবে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে একথা বলে যে, হে আল্লাহ! তুমি "ইহ্‌দিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম" সরল সোজা পথ দেখাও এবং সিরাতের বা রাস্তার ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য বলা হলো নিম্নের অংশটুকু।

৭নং শিক্ষা

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ○ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○

"আমাদেরকে সেই সরল সোজা পথ দেখাও যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছিলে—তাদের পথ, যাদের উপর গযব পড়েনি এবং যারা পথ ভ্রষ্ট হয়নি।"

ভাষা বিজ্ঞানী ও গবেষকগণ অবশ্যই লক্ষ্য করে থাকবেন সূরা "ফাতেহার" সিরাত শব্দের পূর্বেও সুনির্দিষ্ট আরটিকেল (Definite Article) "আল" শব্দ যোগ করা হয়েছে এবং মুস্তাকীম শব্দের পূর্বেও "আল" শব্দ যোগ করা হয়েছে। ফলে এর টানা অর্থ দাঁড়ালো একমাত্র পথ যা একমাত্র সঠিক পথ।

এখন প্রশ্ন হলো, এ পথটা চিনবো কি করে ? এরই জবাবে বলা হয়েছে সেই পথটা হচ্ছে তাদের পথ যাদেরকে আল্লাহ নেয়ামত দান করেছিলেন। আর নেয়ামত হলো ইহলৌকিক ও পারলৌকিক এবং বিশ্বজগত সম্বন্ধে সুস্পষ্ট সঠিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ। আর সেই মহাজ্ঞান হচ্ছে 'নবুওয়াতী' জ্ঞান। সেটা নবী-রসূলগণ লাভ করেছিলেন।

অতএব সে সরল সোজা পথ কোনো পীর ফকিরেরও পথ নয় আবার লেলিন বা মাওসেতুং-এরও পথ নয়। সে পথ আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রদর্শিত চূড়ান্ত নবুওয়াতী পথ যা দিয়ে তিনি তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ দূত বা ইনিস্ট্রাকটারকে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।

এ বুঝগুলো মানুষের অন্তরে বদ্ধমূল করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই সূরা ফাতেহাকে আল্লাহপাক নামাযে নিত্য পাঠ্য করে দিয়েছেন।-(খন্দকার আবুল খায়ের সাহেবের সূরা ফাতেহার ব্যাখ্যা দ্রঃ)।

তারপর রুকূ'তে গিয়ে বলে 'সুবহানা রব্বিয়াল আজীম'-পবিত্র আমার পরোওয়ারদেগার যিনি বড়, যিনি মহান। কিন্তু তিনি কেমন বড়, কেমন মহান, মাতা-পিতার ন্যায় তোমার নিকট বড় মহান না তোমার পীরের

www.pathagar.com

ন্যায় ? ঠাকুরের ন্যায় না তোমার রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট-এর ন্যায় মহান ? তা সঠিকভাবে প্রকাশের জন্য নামাযী তার সর্বশ্রেষ্ট অঙ্গ তার মস্তিষ্ককে একেবারে ভূলুণ্ঠিত করে দিয়ে বলে 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা' পবিত্র আমার প্রভু পরোয়ারদিগার যিনি সমস্ত বড় সমস্ত মহানের মহান।' তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁর উপরে কোনো শক্তি নেই। এভাবে নামাযের ছত্রে ছত্রে নামাযী রব্বুল আলামীনেরই সর্বশ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে থাকেন এবং অবনত মস্তকে তাঁর প্রশংসা করে থাকেন। আর যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বদ্রষ্টা ও সবকিছু শ্রবণকারী সেহেতু নামাযী একথার সত্যতা স্বীকার করে বলে সামিআল্লা হুলিমান হামীদা। অর্থাৎ আল্লাহ এ সমস্ত প্রশংসা শুনছেন।

তারপর নামাযী আত্তাহিয়্যাতু পাঠের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ভাবে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সাথে কথোপকথন করে থাকেন এবং তাঁর সাথে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে থাকে। যার দরুন নামাযী ধীরে ধীরে এমন শক্তির অধিকারী হয়ে থাকেন যে, বিশ্বের প্রতিটা সৃষ্টি তাঁর অনুগত হয়ে আসে তাঁর কথায় ওঠে, তাঁর কথায় বসে। বনের হিংস্র বাঘ-ভাল্লুক এবং পানির হাঙ্গর-কুমির তার একান্ত অনুগত হয়ে যায়। ইসলামের ইতিহাসে এর অসংখ্য প্রমাণ আছে।

আল্লাহ বলেন, মানুষ যখন আমার আদেশ নিষেধ অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা করে তখন তার মুখ আমার মুখ হয়ে যায়, তার হাত আমার হাত হয়ে যায়, তার পা আমার পা হয়ে যায়। অর্থাৎ সে এমন ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় যা সাধারণ মানুষের নেই। তাই সাধারণ মানুষ ভুল করে তাকে আল্লাহর আসনে বসানোর চেষ্টা করে, তাঁর মাজারে গিয়ে মাথা ঠেকায় এবং তাকে হাদী বা মুক্তি দাতা হিসেবে গণ্য করে থাকে। এটা নিসন্দেহে ভুলপথ, শিরকীর পথ। এ পথে চললে জাহান্নাম অবশ্যম্ভাবী যদি আল্লাহ ক্ষমা না করেন।

তারপর নামাযী যার মাধ্যমে ক্ষমা লাভ ও সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারলো তাঁর উপর তাঁর বংশধরের উপর সালাম ও শান্তি বর্ষণের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট আকুল আবেদন জানিয়ে এবং নিজের স্বীয় পিতা-মাতা, বংশধর মু'মিন নারী ও পুরুষ এবং মুসলমান নারী ও পুরুষ সে মৃত হোক আর জীবিতই হোক সবার জন্যই ক্ষমা ভিক্ষা করে সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করেন।

www.pathagar.com

১২. নামায মুমিনদের জন্য মি'রাজ

"মি'রাজ শব্দের আভিধানিক অর্থ নৈকট্য লাভ, সাক্ষাত এবং কথোপকথনের উপকরণ। বিশেষ করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত এবং কথোপকথন করাকে মি'রাজ বলে। নবী মুহাম্মাদ স. সশরীরে আল্লাহর আহবানে সাড়া দিয়ে মি'রাজে গিয়েছিলেন "বুররাক" ও 'রফরফের' মাধ্যমে, নামাযী তাঁর নামাযের মাধ্যমে রূহানীভাবে আল্লাহর দরবারে পৌছায় এবং তাঁর সাথে কথাবার্তা বলে থাকেন এবং ভাবের আদান প্রদান করে রূহানী শক্তি বা আত্মিক শক্তি লাভ করে থাকেন। হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম স. বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামায আদায় করতে দাঁড়ায় সে তখন প্রতিপালকের সাথে কথা বলে। সুতরাং তখন ডান দিকে থুথু নিক্ষেপ করবে না। বরং প্রয়োজন দেখা দিলে বাম দিকে অথবা পায়ের নীচে থুথু নিক্ষেপ করবে।-বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড কিতাবু মাওয়াকিতুস সালাত, পৃঃ ২৩৯ হাদীস নং ৫০০।

নবী করীম স. এরশাদ করেছেন, নামাযে দণ্ডায়মান অবস্থায় মু'মিন যখন বলে, "আল হামদুলিল্লাহ" আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রতিত্তরে বলেন "হামেদানী আবদী"। বান্দা যখন বলে "আর রাহমানির রাহীম" আল্লাহ রব্বুল আলামীন একইভাবে উত্তর দেন, "আসনা আলাইয়া আবদী"। বান্দা যখন বলে "মালিকি ইয়াওমিদ্দীন" আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন "মাজ্জাদানী আবদী"। বান্দা যখন বলে "ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন" আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন "হাযাল আয়াতু বাইনি ওয়া বাইনা আবদী ওয়ালী আবদি মা সালাহু"। বান্দা যখন বলে, "ইহদিনাস সিরাত্বাল মুস্তাক্বীম..... দ্বল্লিন"। আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন হাযা লি আবদী, ওয়ালি আবদী মা-সা আলা"।

হযরত মোজাদ্দেদ আলফেসানী র. বলেন, হাকীকতে সালাত একটি উচ্চ মোকাম এবং বেলায়েত সমাপ্তকারী মুসল্লির উপর তার অবস্থা প্রকাশ হয়ে থাকে। ইসলামের মধ্যে নামায সকল ইবাদাতের সমষ্টি এবং সর্বপ্রকার নেক আমল হতে শ্রেষ্ঠ। শবে মি'রাজে যে যে অবস্থা রসূলুল্লাহ স.-এর অর্জিত হয়েছিল তাঁর নামাযের মধ্যে তাঁর অবস্থা অনুরূপ হতো।

মুসল্লী যখন প্রথম তাকবীর 'আল্লাহু আকবর' বলে তখন দুজাহানের এলাকা হতে হাত উঠিয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজির হয় এবং

www.pathagar.com

তাঁর শান ও আযমতের মোকাবেলায় নিজেকে অত্যন্ত নগণ্য ধারণা করে মাহবুববে হাকীকী আল্লাহ তাআলার নিকট নিজেকে কুরবান করে দেয়। কুরআন শরীফ পড়ার সময় মুসল্লী কখনো বা শ্রোতা কখনো বা বক্তা হিসেবে আল্লাহ তা'আলার সাথে কথাবার্তা বলতে থাকে। রুকূ'র সময় অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করার সুযোগ পেয়ে থাকে। তারপর তাসবীহ পড়ে আল্লাহর আযমত ও জালাল প্রকাশ করে দণ্ডায়মান হয়। তারপর যথাসাধ্য বিনয় ও নম্রতার সাথে একমাত্র প্রাণের মাহবুব ও মকছুদ আল্লাহ তা'আলার সামনে মস্তক মাটিতে রেখে কাতরতা ও দীনতা প্রকাশ করে তাঁর দয়ার ভিখারী সেজে বসে। নিজ জীবনের কৃত রাশি রাশি গোনাহসমূহ ও আল্লাহ তা'আলার অগণিত ইহসান ও নেয়ামতসমূহের শোকর গুজারীর পূর্ণ অক্ষমতা বুঝতে পারে এবং পরক্ষণেই করুণাময় আল্লাহ তা'আলার রহমতের আশায় পাগলপারা হয়ে পুনরায় "আল্লাহু আকবার" বলে মস্তক মাটি হতে উঠিয়ে ফেলে। তারপর এরূপ নগণ্য জঘন্য গোনাহগার বান্দার প্রতি যে আল্লাহ তা'আলার কি পরিমাণ ইহসান ও কতদূর ভালোবাসা তার বিষয় ক্ষণকাল ভেবে তার মনপ্রাণ বেকারার হয়ে পড়ে ও মাহবুবের রহমত ও মাগফিরাতের আশায় পুনরায় মস্তক মাটিতে লুটিয়ে দেয়। তাঁর প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে মনের আবেগ ও ভক্তি বাড়তে থাকলে অবশেষে রসূলুল্লাহ স. মি'রাজের সময় আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করে যেরূপ বাক্যালাপ করেছিলেন, দয়াময় আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে সে বাক্যালাপের সুযোগ "আত্তাহিয়াতু" পড়ার সময় তাঁকে প্রদান করেন। সেজন্য নামাযকে ঈমানদারের মি'রাজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে নামাযে পূর্ন শান্তি লাভ করে শান্তি ও রহমতের অংশ সঙ্গী মুসল্লীও ফেরেশতাগণকে বিলিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে "আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহ" বলে নামায হতে বের হয়ে পড়ে (ছিরাজুছ ছালেকীন, দায়েরায় হাকীকাতে সালাত, আবদুল খালেক এম. এ. পৃষ্ঠা ৩৯৭ ইষ্ট বেঙ্গল বুক সিণ্ডিকেট ঢাকা)।

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ স.-এর মি'রাজে গমনকালে যেমন কতগুলো ধাপ বা অধ্যায় ছিল অনুরূপ অধ্যায় আছে নামাযির নামাযের মাধ্যমে মি'রাজে গমন কালে। নামাযী যখন আযানের আহবান শোনার সাথে সাথে পার্থিব যাবতীয় কাজকর্ম ফেলে রেখে জামায়াতে শামিল হওয়ার জন্য মসজিদের দিকে ধাবিত হন তখন সে এসেই প্রথমে অজু করার নিয়ত করে। নিখিল বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি জীবন মরণের একমাত্র মালিক আল্লাহ রব্বুল আলামীন শাহানশাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে দরখাস্ত পেশ

www.pathagar.com

করতে নামাযী নিজেকে পাক-পবিত্র হওয়ার জন্য অজু করে। পানির দ্বারা নামাযী বস্তুভিত্তিক অপবিত্রতা থেকে নিজেকে পবিত্র করে এবং অযুর দোয়া দ্বারা নামাযী তাঁর অন্তরের যাবতীয় কলুষিত জিনিসকে ঝেড়ে মুছে পূত-পবিত্র করে নেয়। এটা নামাযীর মি'রাজে গমনের প্রথম ধাপ বা স্তর। এরপর নামাযী জায়নামায রূপ বুররাক বা রফরফে আরোহণ করে বলে যে, নিশ্চয় আমি আসমান-যমিন সৃষ্টিকারীর দিকে মুখ করলাম এবং আমি কখনই মুশরিক লোকদের দলভুক্ত নই। এটি নামাযীর মি'রাজ গমনের দ্বিতীয় ধাপ। তৃতীয় ধাপে নামাযী সানা পড়ার মাধ্যমে মহান আল্লাহর গুণগান করে এবং "আউযুবিল্লাহ' পড়ার মাধ্যমে মি'রাজের পথে চলতে গিয়ে যাতে বিতাড়িত জ্বীন শয়তান, নফস শয়তান ও মানব শয়তানের দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়, মনের একাগ্রতা না হারায়, স্রষ্টা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে উপস্থিত হয়ে নবী স. যে যে কথাবার্তা বলছেন এবং আল্লাহ তা'আলা শুনামাত্র তার যে জবাব দিয়েছেন—এটা সম্বন্ধে সে যাতে সচেতন থাকেন, সে জন্য নামাযী স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে এ ব্যাপারে সাহায্য ভিক্ষা করে মি'রাজের শেষ স্তরের কার্য শুরু করে 'বিসমিল্লাহ' পড়ার মাধ্যমে। এবং নামায শেষে সে উপস্থিত মুসল্লি এবং তাদের সাথে অবস্থান রত কার্যলিপিকার ফেরেশতাদের সালাম জানিয়ে নামায রূপ মি'রাজ শেষ করে। 'সালাম' দেয়াটাই প্রমাণ করে যে, নামাযী এখানে ছিল না। অন্য কোথাও ছিল। আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য মি'রাজে গিয়েছিল। তাই আগন্তুকের ন্যায় মসজিদের নামাযের মজলিসে উপস্থিত হয়ে সকলকে সালাম দেয়া অবশ্য করণীয় হয়ে দাঁড়ায়। 'আস্ সালাতু মি'রাজুল মু'মিনিন' একথার তাৎপর্য এখানেই।

www.pathagar.com

১৩. মানব সংস্কারে নামাযের ব্যর্থতার কারণ

মানব সংস্কারে নামায তখনই ব্যর্থ হয় যখন নামাযী মানুষের সাথে নামাযের সত্যিকার অর্থে কোনো যোগসূত্র থাকে না। আর যেহেতু নামাযী মানুষের সাথে নামাযের কোনো প্রকৃত যোগসূত্র থাকে না—নামাযী নামাযে কী পড়ছে, কোথায় দাঁড়িয়ে পড়ছে, কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, কি ওয়াদা করছে, সে সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না, না বুঝে মন্ত্র পড়ার ন্যায় সূরা কালাম পড়ে থাকে। তারা শুধু লোক দেখানো নামায পড়ে থাকে। এদের ওপর তাই নামায কোনো আছর করতে পারে না। তাই নামাযে তাদের কোনো উপকারও হয় না। তাদেরকে সংস্কার করতে পারে না। এ শ্রেণীর নামাযী সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল আলামীন সূরা 'মাউনে' উল্লেখ করেছেন এবং তাদের পরিণতি সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

একটু ভেবে দেখুন, যে ব্যক্তি দৈনিক পাঁচবার আযানের ধ্বনি শোনে এবং চিন্তা করে দেখে যে, কত বড় কথা সেই আযানেই ঘোষণা করা হয়েছে এবং তা দ্বারা কত বড় মহান বাদশাহর নিকট হাজির হবার জন্য আহবান জানাচ্ছে। প্রতিবার আযান শুনে যে ব্যক্তি মনে মনে অনুতপ্ত হয়ে নিজের সকল কাজকর্ম ছেড়ে সারাজাহানের মালিক ও প্রভুর দরবারে হাজির হয়। প্রতি নামাযের পূর্বে অযু করে নিজের দেহ ও মনকে পবিত্র করে নেয় এবং বারবার নামাযে উল্লেখিত রূপে সূরা ও দোয়া মনোযোগ সহকারে পাঠ করে, প্রকৃতপক্ষে তার হৃদয় মনে আল্লাহর ভয় না জেগে পারে না। আল্লাহর হুকুম অমান্য করতে তার লজ্জা না হয়ে পারে না। পাপ ও অন্যায় কাজের কালো চিহ্ন নিয়ে আল্লাহর দরবারে বারবার হাজির হতে তার অন্তরাত্মা নিশ্চয়ই কেঁপে উঠবে। নামাযে আল্লাহর দাসত্ব এবং তাঁর আনুগত্য করে চলার কথা বলা এবং আল্লাহকে বিচার দিনের মালিক বলে বার বার স্বীকার করার পর কোনো মানুষ বাহির দুনিয়ায় নিজের কাজকর্মের মধ্যে ফিরে এসে মিথ্যা কথা বলা, বেঈমানী করা, পরের হক আত্মসাৎ করা, ঘুষ খাওয়া ও দেয়া, সুদ খাওয়া ও দেয়া, অন্য মানুষকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়া, নির্লজ্জতা, ব্যভিচার ও অন্যায় প্রভৃতি কাজ কিছুতেই করতে পারে না কিংবা এগুলো করার পর পুনরায় আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে এসব কথা মুখে স্বীকার করার দুঃসাহস করতে পারে না। আপনি জেনেবুঝে দৈনিক অসংখ্যবার আল্লাহর সামনে স্বীকার করেন, "হে আল্লাহ ! আমি কেবল তোমার দাসত্ব করি এবং তোমারই নিকট

www.pathagar.com

সাহায্য প্রার্থনা করি" এটা স্বীকার করে আপনার পক্ষে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর দাসত্ব করা এবং অন্য কারোর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা কেমন করে সম্ভব হতে পারে ? একবার এসব স্বীকার করে তার বিরোধিতা করলে পুনরায় আল্লাহর সামনে হাজির হতে আপনার মন আপনাকে তিরস্কার করবে, লজ্জায় আপনার মাথা নত হয়ে পড়বে। আবার বিরোধিতা করলে আরো বেশি লজ্জা হবে এবং বিবেক আপনাকে আরো বেশি দংশন করবে। সমস্ত জীবনভর দৈনিক পাঁচবার করে নামায পড়া সত্ত্বেও আপনার কাজ কর্ম ও চরিত্র ঠিক না হওয়া এবং আপনার জীবনে আমুল পরিবর্তন সূচিত না হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। এ জন্যই আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআনে বলেছেন ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ط

"নিশ্চয় নামায মানুষকে লজ্জাহীনতা, অশ্লীলতা ও সর্বপ্রকার পাপকার্য হতে বিরত রাখে।"–সূরা আনকাবুত ঃ ৪৫

আল্লাহ মিথ্যা নয়, তাঁর পাক কালাম আল কুরআনের কথাও মিথ্যা নয়। কিন্তু মানুষের মন ও চরিত্র সংশোধন ও সংস্কার করার জন্য এতবড় উপায় থাকা সত্ত্বেও এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া সত্ত্বেও যদি কারোর চরিত্র ঠিক না হয়, যদি কেউ পাপ পথ হতে বিরত না থাকে তবে বুঝতে হবে যে, আসলে নামাযী মানুষ প্রকৃতভাবে নামায আদায় করে না। লোক দেখানো নামায পড়ে সমাজে সে নামাযী পরহেজগার রূপে পরিচিত হতে চায়, নামাযকে সে তার ব্যবসার প্রসারতা লাভের জন্য, অধিক ধনী হওয়ার একটি অমোঘ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। এ সমস্ত কপট নামাযী সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিশ্ববাসীকে সতর্ক করে দিয়েছেন। একথা আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখা দরকার যে, পানি ও সাবান কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করে থাকে বটে, কিন্তু তাতে কয়লার ময়লা দূর হয় না। আর পানি ও সাবান দ্বারা কয়লার ময়লা দূর না হলে সে জন্য পানি ও সাবানের দোষ দেয়া যায় না—দোষ কয়লারই। অতএব নামাযের দ্বারা কোনো কপট, নির্বোধ ও অলস লোকের চরিত্রের কোনো সংস্কার না হলে তার জন্য তার নামায দায়ী হতে পারে না—দায়ী ও দোষী সেই নামাযী স্বয়ং নিজেই।

❐

www.pathagar.com

১৪. নামায ও কুরআন

নামায ও কুরআন একে অন্যের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একের সাথে অন্যের সুনিবীড় সম্পর্ক। কুরআন ছাড়া নামায হয় না। আবার নামায ছাড়া কুরআনের আসল উদ্দেশ্য পূর্ণভাবে সাধিত হয় না। তাই বলা হয়ে থাকে নামায ও কুরআন একে অন্যের অভাবে পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

মানব জাতির ঐশী পরিচালনা বিধি আল কুরআন যা স্বয়ং মানুষকে বিশ্বজাহানের স্রষ্টা আল্লাহ রব্বুল আলামীন প্রদত্ত, তাঁর মনোনীত রসূল (ঐশী টেকনিশিয়ান বা প্রশিক্ষক)-এর নিকট প্রেরিত। যার আলোকে তিনি মানুষ জাতিকে সঠিকভাবে পরিচালিত হয়ে অভীষ্ট লক্ষে পৌছার কলা-কৌশল শিখিয়ে থাকেন একেবারে হাতে কলমে—নিজের জীবনে এর প্রতিটি বিধান নিখুঁতভাবে বাস্তবায়ন করে।

মানব জাতির পরিচালন বিধি আল কুরআনের প্রথম অবতারিত "ইকরা" সূরাটি দিয়ে। যার প্রতিপাদ্য বিষয়ই তিনটি জিনিসকে কেন্দ্র করে (১) আল্লাহ (Allah) (২) মানুষ (Man) এবং (৩) জ্ঞান (Knowledge)। আর আল্লাহ, মানুষ ও জ্ঞান এ তিনটির সমন্বয় সাধনই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য। নামায মানুষকে আল্লাহর বিধি বিধান মেনে চলার উপযোগী করে তোলে। আর গোটা আল কুরআনটিই পরিপূর্ণ একটি ঐশী সংবিধান গ্রন্থ।

www.pathagar.com

১৫. নামাযে কুরআন তেলাওয়াত করার বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক কারণ

আল্লাহ কোনো কিছু বৃথা করেন না। যুক্তিবিদ্যাও একথার সমর্থনে বলে কার্যকারণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা। আল্লাহ রব্বুল আলামীন কর্তৃক নামাযে কুরআন তেলাওয়াত ফরয ঘোষণার পিছনে অবশ্যম্ভাবী কারণ নিহিত রয়েছে। মানুষের সর্বশেষ পরিচালন কৌশল ও বিধি বিধান কী তা প্রতিটি মানুষকে জানিয়ে দেয়াই আল্লাহর মুখ্য উদ্দেশ্য। যাতে সে পরে এ অজুহাত তুলতে না পারে যে, রব্বুল আলামীন কেমনভাবে আমাদের সামগ্রিক জীবন তোমার পসন্দসই সহজ সরল পথে চালাবো তা তো তুমি আমাদের জানিয়ে দাওনি কেউ তো আমাদের একথা বলে দেয়নি যে, এ পথ তোমার পসন্দসই ও মনোনীত পথই এবং এ পথ তোমার পসন্দসই ও মনোনীত পথ নয়। তুমি তো এমন কাউকে পাঠিয়ে দিয়ে আমাদের সতর্ক করে দাওনি যে, তোমার মনোনীত পথে না চললে এমন কঠোর শাস্তি দিবেন। অতএব তুমি কোন্ অজুহাতে আমাদের বিচার করে এ শাস্তি দিতে যাচ্ছো ? আল্লাহ রব্বুল আলামীন শেষ বিচারের দিনে মানুষ যাতে এ অজুহাত দেখিয়ে কৃত অপরাধ থেকে মুক্ত হতে না পারে সে জন্যই নামাযে কুরআন তেলাওয়াত ফরয করে দিয়েছেন। যার ছত্রে ছত্রে রয়েছে উপদেশ সতর্কবাণী ও মানুষের জীবন পথের নিখুঁত দিক নির্দেশনা এবং ঐশী নির্দেশনার অবমাননাকারী ও প্রতিপালনকারীদের জন্য রয়েছে রোমহর্ষক ও চিত্তহরণকারী পরম দুঃখ ও সুখের স্থান জাহান্নাম ও জান্নাতের নিখুঁত বর্ণনা।

www.pathagar.com

১৬. কুরআন যে সত্য সত্যই আল্লাহর বাণী তার সপক্ষে আধুনিক বিজ্ঞান

কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো, আল কুরআন যে সত্য সত্যই আল্লাহর বাণী তার সপক্ষে এমন কি প্রমাণ আছে যে নামাযের ন্যায় একটি তাৎপর্যপূর্ণ জিনিসে তা পাঠ করতে হবে ? বিজ্ঞানের এ চরম উৎকর্ষের দিনে মানুষ এ নিয়েও বিস্তর চিন্তা-ভাবনা ও গবেষনা চালিয়ে যাচ্ছে। এবং নতুন নতুন বিস্ময়কর তথ্য উদঘাটন করছে। ফরাসী বিজ্ঞানী মরিস বুকাইলী, এ্যালেস্টার ডি প্যানেল এবং মার্কিন বিজ্ঞানী ডঃ রাশাদ খলিফা কুরআন নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছেন। ফরাসী বিজ্ঞানী মরিস বুকাইলী তাঁর থিসিস গ্রন্থ "দ্যা বাইবেল দ্যা কুরআন এণ্ড দ্যা সায়েন্স" এর আলোচনায় এক পর্যায়ে বলেছেন—

> "আমার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল কুরআনের প্রতিটি বাক্য বিচার-বিশ্লেষণ করা এবং সমালোচকের দৃষ্টিতে কুরআনের অসারতা প্রমাণ করা। কিন্তু যতই কুরআন পড়া শুরু করলাম দেখতে পেলাম বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় কি সঠিকভাবেই না কুরআনে তুলে ধরা হয়েছে। একটা বিষয় আমার কাছে সবচেয়ে বেশী অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছিল—আজকের যুগের যেসব বৈজ্ঞানিক সত্য এত চিন্তা-গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পাচ্ছি, মুহাম্মদ স. সেই যুগে বসে কি করে সেসব বিষয় জানতে পারলো, প্রকাশিত করতে পারলো। সেযুগে এসব বিষয়ে তো কোনো ধারণাই থাকার কথা নয়।"—পৃষ্ঠা ১২০

বৈজ্ঞানিকদ্বয় তাঁদের থিসিস গ্রন্থের আরেক পর্যায়ে বলেছেন, বিশ্ব সৃষ্টি রহস্য, জ্যোর্তিবিজ্ঞানের নানা তথ্য, পৃথিবী, জীব-জন্তু, গাছপালা সৃষ্টি এবং মানুষের জন্মের নানা প্রক্রিয়া সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এত অসংখ্য বক্তব্য রয়েছে যে, সন্ধানী পাঠক মাত্রই বিস্মিত না হয়ে পারবেন না। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত এসব বিষয় সংক্রান্ত বক্তব্যের প্রায় সব-গুলোই যেখানে মিথ্যা কিংবা ভ্রান্তিপূর্ণ সেখানে চৌদ্দশ (১৪০০) বছর পূর্বেকার মহাগ্রন্থ আল কুরআনের এতদসংক্রান্ত তথ্য ও বক্তব্য এতটা সঠিক হয় কিভাবে ? মরিস বুকাইলী এবং এ্যালেস্টার ডি প্যানেল ক্যাথলিক খৃস্টান হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের থিসিস গ্রন্থের ১২০ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত বিষয়-সমূহের আলেচনায় না বলে পারেননি যে—

www.pathagar.com

"Where as momentous errors are to be found in the Bible, I could not find a single error in the Quran.I had to stop and ask myself; if a man was the auther of the Quran how could he have written facts in the seventh century A.D. that today are shown to be in keeping with modern scientific knowledge .....?

বৈজ্ঞানিকদ্বয় আরো বলেছেন, মুহাম্মদ স.-এর উপরে ঐশী মহাগ্রন্থ আল কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়টিতে ফ্রান্সের রাজা ছিলেন ভাগেবার্ট (৬২৯-৬৩৯ খৃঃ)। কোনো মানুষই যদি এ কুরআনের রচয়িতা হয়ে থাকেন তাহলে তার পক্ষে কিভাবে এতসব বিষয়ের এ রকম সঠিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্য ও সত্য তুলে ধরা সম্ভব যা আজ আমরা এত শত বছর পর জানতে পারছি ? এ আলোচনায় ফরাসী বৈজ্ঞানিকদ্বয় অমুসলিম বিশ্বে প্রচলিত এ ভ্রান্ত ধারণাও খণ্ডন করেছেন যে, মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এসব বিষয় পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে। তিনি এর সত্যতা খুঁজতে গিয়ে নিজে তাসখন্দ সফর করেন এবং সেখানে যাদুঘরে সংরক্ষিত হযরত ওসমান রা.-এর সময়ের কুরআনের সাথে বর্তমান সময়ের কুরআনের প্রতিটি আয়াত ধরে ধরে মিলিয়ে নিয়েছেন। দেখেছেন, এ তের শত বছরেও ঐশী মহাগ্রন্থ আল কুরআনে কোনো রকম ভ্রান্ত কিংবা নতুন কোনো শব্দ অনুপ্রবেশ করেনি।

কুরআন হযরত মুহাম্মাদ স.-এর লেখা বলে অধুনা একদল লোক যে প্রচারণা চালায় তিনি সেই ভ্রান্তিও খণ্ডন করেছেন এবং ইতিহাসের প্রমাণপঞ্জী তুলে ধরে বলেছেন হযরত মুহাম্মদ স. ছিলেন নিরক্ষর। সেই নিরক্ষর লোকটির দ্বারা কিভাবে সে সময়কার আরবের এরকম একটি সর্বোৎকৃষ্ট সাহিত্যকর্ম রচিত হতে পারে ? শুধু কি তাই ? সেই নিরক্ষর লোকটির পক্ষেই বা কিভাবে সম্ভব বিজ্ঞানের প্রাকৃতিক রহস্যাবলীর এমন সব সত্য ও নির্ভুল তথ্য তুলে ধরা যা সে সময়ের কোনো লোকের চিন্তারও অগোচরে থাকার কথা, এবং সেসব দুরূহ বিষয় সংক্রান্ত সত্য ও তথ্যের বর্ণনায় কোথাও একবিন্দু ত্রুটি কিংবা বিচ্যুতি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর ?

(How could a man from Illiterate become the most important auther in terms of literary merit in the whole of Arabic Literture ? How could he then pronounce truth of scientific nature that no other human bieng could possibly have devoloped at the time and all this with outonce making the slightest error in this pronouncements on the subject ?)

www.pathagar.com

বৈজ্ঞানিকদ্বয় তাঁদের পাঠকদের বারবার করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁদের এ থিসিস গ্রন্থ সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানের সত্য ও তথ্যের নিরীখে নিরপেক্ষ গবেষকের দৃষ্টিভংগি নিয়ে রচিত হয়েছে। তাঁরা তাঁদের সুদীর্ঘকালের পরীক্ষা-নিরীক্ষা গবেষণায় যে সত্য খুঁজে পেয়েছেন, তাই তাঁদের থিসিস গ্রন্থে তুলে ধরেছেন মাত্র। সেই নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণ ও গবেষণার শেষ সিদ্ধান্ত হচ্ছে একটাই আর তাহলো সপ্তম শতাব্দীতে জীবিত কোনো মানুষের পক্ষেই শত শত বছর পরে আবিষ্কৃত বিজ্ঞানের এতসব প্রতিষ্ঠিত বিষয় ও সত্য বিচিত্র জ্ঞান ও তথ্য বুঝতে পারা ও প্রকাশ করা আদৌ সম্ভব নয়। ঐশী মহাগ্রন্থ আল কুরআন সত্যই যে আল্লাহর কালাম, আল কুরআন যে সত্যই কোনো মানুষের রচনা নয়। আমাদের কাছে এটাই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

আমেরিকার কম্পিউটার মেশিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালো ঐশী মহাগ্রন্থ আল কুরআনের উপর। তরুন মিসরীয় বিজ্ঞানী ডঃ রাশাদ খলিফা আমেরিকার গবেষণাগারে অত্যাধুনিক কম্পিউটার মেশিন নিয়ে ঐশী মহাগ্রন্থ আল কুরআনের রচনাবলীর উপর গবেষণা চালাতে গিয়ে হতবাক হন। তিনি দেখতে পান ঐশী মহাগ্রন্থ আল কুরআন সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক ভাবে গাণিতিক সূত্রের উপর লেখা । এ তরুণ বিজ্ঞানী অপরিসীম পরিশ্রম করে কুরআনের ১১৪টি সূরার প্রতিটি অক্ষরের সংখ্যা গণনা করেন। এ সংখ্যাগুলো কম্পিউটারে ফেলে তিনি যেসব চাঞ্চল্যকর তথ্য পান, তার খানিকটা অংশ শুনুন ঃ

শুরুতেই কুরআন শরীফের প্রথম আয়াত بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-এর কথায় আসা যাক। এতে মোট অক্ষর রয়েছে ১৯টি। তরুন বিজ্ঞানী দাবী করেন, সমগ্র কুরআনেই এ সংখ্যাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—'ইসম' শব্দটি কুরআনে ১৯ বার ব্যবহৃত হয়েছে। 'বিসম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তিনবার। আর এ দুটির পুনরাবৃত্তির গুণনের সংখ্যাই হলো "আর রহমান" শব্দটির পুনরাবৃত্তির সংখ্যা অর্থাৎ ৫৭। এখানেই শেষ নয়। আররহীম শব্দটি আল্লাহর গুণবাচক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ১১৪ বার। এটাই হলো কুরআনের মোট সূরার সংখ্যা। এ সংখ্যাটিও ১৯ দ্বারা সম্পূর্ণভাবে বিভাজ্য।

"আল্লাহ" শব্দটি সমগ্র কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে ২,৬৯৮ বার। এ সংখ্যাটিও ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য। আবার বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম" পুরো আয়াতটি মোট ব্যবহৃত হয়েছে ১১৪ বার। সূরা তাওবায়

www.pathagar.com

"বিসমিল্লাহ" ব্যবহার করা হয়নি। তার জন্য পরিপূরক হিসেবে সূরা নমলে তা দুবার ব্যবহৃত হয়েছে, প্রথমে একবার ও সূরার ত্রিশতম আয়াতে আরেকবার। ১১৪ সংখ্যাটি ১৯ দিয়ে বিভাজ্য।

এ গবেষণার ফলে হরফে নূরানীয়াহগুলো সম্পর্কে বিস্ময়কর তথ্য পাওয়া গেছে। (কুরআন শরীফের ২৯টি সূরা প্রথমে আলিফ-লাম-মীম, ইয়া-সীন, হা-মীম, নূন, ত্ব-হা, ছোয়াদ প্রভৃতি ধরনের অক্ষর দিয়ে শুরু করা হয়েছে। এ শব্দগুলোর গূঢ়তত্ত্ব মানুষ অবগত নয়। এদেরকেই হরফে নূরানীয়াহ বলা হয়। কম্পিউটারের সাহায্যে হিসেব করে দেখা গেছে যে সমস্ত সূরায় এ হরফগুলো ব্যবহার করা হয়েছে, সে সমস্ত সূরায় এদের পুনরাবৃত্তির সংখ্যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য। যেমন সূরা ক্বাফ-এ ক্বাফ অক্ষরটি এসেছে ৫৭ বার যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য। এমনিভাবে এ ক্বাফ অক্ষরটি সূরা আশ শুরা সূরাতেও হরফে নূরানীয়াহ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাতেও অক্ষরটির পুনরাবৃত্তি হয়েছে ৫৭ বার।

এমনিভাবে ছোয়াদ অক্ষরটি সূরা আল আরাফ, সূরা ছোয়াদ ও সূরা মারইয়ামে হরফে নূরানীয়াহ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং এ তিনটি সূরার প্রত্যেকটিতেই ছোয়াদ অক্ষরটি পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে ১৫২ বার করে। এ সংখ্যাটিও ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। তেমনি করে সূরা "কালাম" শুরু হয়েছে নূন" অক্ষরটিকে হরফে নূরানীয়াহ হিসেবে ব্যবহার করার মাধ্যমে। এ সূরাতেও অক্ষরটির পুনরাবৃত্তির সংখ্যা ১৩৩ যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য।

সূরা ইয়াসীনে 'ইয়া' ও 'সীন' দুটি অক্ষরই ২৮৫ বার করে ব্যবহৃত হয়েছে। এ সংখ্যাটিও ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। অনুরূপভাবে সূরা 'ত্ব' ও 'হা' দুটো অক্ষরই ৩৪২ বার করে পুনরাবৃত্তি হয়েছে। এ সংখ্যাটিও ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। হরফে নূরানীয়াহ বিশিষ্ট অন্যান্য সূরাগুলোর ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য।

এ হিসেবগুলো সম্পর্কে বিজ্ঞানী মন্তব্য করেন ঃ মনে করুন আপনি যখন তেলাওয়াত করেন কুল হুআল্লাহু আহাদ তখন "আল্লাহ শব্দটি গণনা করা হলো। আবার যখন পড়েন পরবর্তী আয়াত আল্লাহুস সামাদ তখন আল্লাহ শব্দটি এখানেই গণনা করা হবে। অর্থাৎ সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ইচ্ছা হলো কুরআনে 'আল্লাহ' শব্দটির বারবার ব্যবহারের সংখ্যা কুরআনের প্রথম আয়াত অর্থাৎ বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম-এর অক্ষরগুলোর সংখ্যা দিয়ে বিভাজ্য হবে।

www.pathagar.com

অনুরূপভাবে তিনি আরো বলেন, যারা ঈমান আনেনি, কুরআনের বিভিন্ন সূরার বারোটি জায়গায় তাদের নাম এসেছে। এর ভিতর এগারোটি আয়াতে তাদেরকে কওমে লূত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কেবল মাত্র একটি জায়গায় ব্যতিক্রম—সেটি হলো সূরা ক্বাফ-এর ত্রয়োদশ আয়াত। এখানে তাদেরকে "ইখওয়ানে লূত" বলে উল্লেখ করা হয়। কম্পিউটার বলে, যদি এখানেও ইখওয়ানের পরিবর্তে 'কওম' শব্দটি ব্যবহৃত হতো, তবে সূরা ক্বাফ এ হরফে নূরানীয়াহ ক্বাফ অক্ষরটির ব্যবহার ৫৭ বারের স্থলে ৫৮ বার হয়ে যেতো। যাকে ১৯ দিয়ে নিঃশেষে ভাগ করা যেতো না। অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আলামীন এদিকে লক্ষ রেখেই এখানে 'কওম'-এর পরিবর্তে ইখওয়ান শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এমনি করে আধুনিক বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তিবিদ্যার আবিষ্কারগুলোকে ব্যবহার করে আজ চিরশাশ্বত ঐশী মহাগ্রন্থ আল কুরআনের আলৌকিকত্বের নির্ভেজালতা এবং মহানত্ব অহংকার দর্পি মানুষ আবারো জানতে পারলো—মাথানত করতে বাধ্য হলো ঐশী মহাগ্রন্থ আল কুরআনের রচয়িতা বিশ্বজাহানের একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে।

এ গবেষণা কম্পিউটার মেশিন.কে মোট কতবার হিসেব সম্পাদন করতে হয়েছে এ প্রশ্ন করলে জবাবে বিজ্ঞানী বলেন ঃ একশত তেষট্টি কেটেলিন বার অর্থাৎ একশ তেষট্টির ডানে সাতাশটি শূন্য বসালে যত সংখ্যা হয় ততবার।

সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হলো, আল্লাহ রব্বুল আলামীন কিন্তু কুরআনের এ অসাধারণত্বের কথা কুরআন শরীফেই বলে দিয়েছেন এ সেই গ্রন্থ যার আয়াতগুলোকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করা হয়েছে —অতপর বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে একজন মহা বিজ্ঞানীর পক্ষ থেকে যিনি সবকিছুই জানেন।–(ইত্তেফাক ১২-১০-৮১, মিসর সাময়িকি আখেরু সায়াহ আখবারুল আলামিন ইসলামী ১৯-১-৭৬ সংখ্যা)।

মূলত আল্লাহ রব্বুল আলামীন সকল বিজ্ঞানীর বিজ্ঞানী এবং 'মানব' নামক এই অদ্ভুত সৃষ্টির স্রষ্টা। জীবন্ত রোবট এই মানব জাতির স্রষ্টাই ভালো জানেন একে কিভাবে অপারেট বা পরিচালনা করতে হবে এবং কিভাবে পরিচালনা করলে সঠিক লক্ষ্য স্থলে সে পৌছাতে পারবে—ক্রাশ হবে না বা ধ্বংস হবে না যেমন মার্কিন বিজ্ঞানীদের প্রিয় 'চ্যালেঞ্জার' এবং রাশিয়ার 'ভাইকিং' ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। আপনারা হয়তো জেনে থাকবেন যে, যে কোনো বিজ্ঞানী নতুন কোনো যান সৃষ্টি করলে বা কোনো

www.pathagar.com

যান অত্যাধুনিকায়ন করলে তার সাথে এর পরিচালনার বিধি সম্বলিত একটি 'বুকলেট' প্রদান করে থাকেন এবং সাথে সাথে একজন ইনষ্ট্রাক্টর পাঠিয়ে থাকেন। এজন্য যে, যাতে সে হাতে কলমে শিক্ষা দিতে পারেন কেমন করে একে পরিচালনা করতে হবে। মানব স্রষ্টা মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ রব্বুল আলামীন যুগে যুগে মানব জাতিকে পরিচালনা করার জন্য এরূপ ১০৪ খানা বুকলেট প্রদান করেছেন এবং সেই সাথে বহু ইনষ্ট্রাক্টরও পাঠিয়েছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে এ সমস্ত ইনষ্ট্রাক্টরদেরকে নবী বা রসূল বলা হয়ে থাকে।

মানব জাতির ক্রম উন্নতির সাথে সাথে তার পরিচালনা বিধিও আল্লাহ রব্বুল আলামীন সংস্কার করেছেন, যেমন মটর বিজ্ঞানী, প্লেন বা রকেট বিজ্ঞানীগণ করে থাকেন। আগেকার পরিচালনার নিয়ম-কানুন বা টেকনোলজি দ্বারা যেমন আজকের দিনের উন্নত মটর, প্লেন বা রকেট পরিচালনা করা যায় না। অনুরূপভাবে বর্তমান কালের এ উন্নত মানুষের পরিচালনা তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল বা বাইবেলের পরিচালনা কৌশল দ্বারা পরিচালিত হতে পারে না। আল্লাহ রব্বুল আলামীন এ অত্যাধুনিক মানুষের পরিচালার জন্য অত্যাধুনিক পরিচালনা বিধি 'আল কুরআন' প্রদান করেছেন। মানুষ জাতি যাতে কুরআনের এ অত্যাধুনিক পরিচালন বিধি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে বিজ্ঞ হয়ে স্বীয় জীবনকে সঠিক পথে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করতে পারে সেজন্য মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ রব্বুল আলামীন প্রত্যহ পাঁচবার নামায প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কুরআন তেলাওয়াত করাকে অবশ্য করণীয় করে দিয়েছেন। বলাবাহুল্য যে, কলি যুগের মানুষের জন্য এটাই চূড়ান্ত পরিচালনা বিধি। এরপরে আর কোনো নবী-রসূলও আসবেন না এবং যবুর, ইঞ্জিল বা আল কুরআনের ন্যায় ঐশী পরিচালন বিধিও আসবে না।–আল কুরআন

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

১৭. আযান ও নামায

আযানের সাথে নামাযের একটি বিশেষ যোগসূত্র রয়েছে। কারণ, নামায যেহেতু সকল নর-নারীর উপর জামায়াতে আদায় করা ওয়াজিব ঘোষণা করে দেয়া হয়েছে। সেহেতু তাদের প্রত্যেককে নামাযের সঠিক সময় সম্বন্ধে অবগত হয়ে মসজিদে একত্রিত হওয়া জরুরী। সাংসারিক জীবনে বিভিন্ন কাজকর্মে নিয়োজিত মানুষেরা এতোই ব্যতিব্যস্ত থাকে যে, সময় সম্বন্ধে অনেক সময় জ্ঞান থাকে না। কর্মে বিভোর থাকার কারণে অনেক সময় নামায কাযা হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। অথচ জামায়াতের সাথে নামায আদায় করার এতই গুরুত্ব রয়েছে যে, রহমতের নবী স. এত রহমদিল হওয়া সত্ত্বেও বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, মুনাফিকের জন্য ফজর ও এশার নামাযের চেয়ে অন্য কোনো নামায কঠিন নয়। তারা যদি এ দু' ওয়াক্তের নামাযের সওয়াব জানতো, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা এ (দু'ওয়াক্ত) নামাযে আসতো। আমি সংকল্প করেছিলাম মুয়ায্যিনকে আযান দেয়ার আদেশ করবো, এরপর কাউকে ইমামতী করতে বলবো এবং যারা এখনো নামাযে শরীক হয়নি আমি আগুন দিয়ে তাদের ঘরগুলো জ্বালিয়ে দেবো। কিন্তু তাদের পরিবার-পরিজনের কথা ভেবে আমার এ ইচ্ছা ত্যাগ করি।–সহীহ আল বুখারী হাদীস নং ৬১৭।

এ হাদীস থেকে এটাই প্রমাণিত হলো যে, আযানের মাধ্যমে মুসলমানকে ইসলামে অবশ্য পালনীয় একটি বিশেষ অনুষ্ঠান 'নামাযের' দিকে আহবান করা হচ্ছে অথচ সে এটাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে পরিত্যাগ করে। এজন্য তার বিরুদ্ধে জিহাদ। তাহলে বুঝা গেলো আযান শ্রবণ করে তার অবমাননা করা বিদ্রোহের সামিল। আর এ বিদ্রোহ তখনই প্রমাণিত হচ্ছে যখন সে নামাযের জন্য জামায়াতে হাজির হচ্ছে না। অতএব আযান ও নামাযের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে। নবী করীম স. আরো বলেন, যে মুসলমান আযানের আহ্বান কানে যাবার পরও মসজিদে নামাযে হাজির হওয়ার জন্য আসে না সে আমার দল ভুক্ত নয়। বরং সে মুনাফিক। মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, 'আযান' নবুওয়াতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কেননা আযানের দ্বারাই ইসলামের অন্যতম বিশিষ্ট ইবাদাত নামাযের প্রতি লোকদেরকে আহবান করা হয়ে থাকে। উপরন্তু আল্লাহর নামের মাধ্যমে তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এটা

www.pathagar.com

একা অন্যতম প্রকৃষ্ট সুযোগ। আযানের ধ্বনি শ্রবণের ফলে শয়তানও বিশেষ অস্বস্তি বোধ করে থাকে।–মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ঃ পৃঃ ২২৪।

হযরত জাবির রা. বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ্ স.-কে এরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি নামাযের আযানের ধ্বনি যখনই শয়তানের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তখনই সে সেখান থেকে পলায়ন করতে থাকে। এমনকি সে রাওহা নামক স্থানে পৌছার পর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

–মিশকাত শরীফ আযান অধ্যায় দ্রঃ।

এ হাদীস বর্ণনাকারী স্পষ্টত বর্ণনা করেছেন যে, রাওহা নামক স্থানটি পবিত্র মদীনা শহর হতে ৩৬ (ছত্রিশ) মাইল দূরে অবস্থিত। শয়তান মসজিদে নববীর আযানের ধ্বনি শ্রবণের ভয়ে এতদূরে চলে যেত।

–মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব, পৃঃ ২২৬।

হাদীসে অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ আযানের ধ্বনি শ্রবণের সাথে সাথেই শয়তান পেরেশান ও ভীত বিহ্বল হয়ে সেখান থেকে পলায়ন করে এবং সে সদা সর্বদা এজন্যই ভীত সন্ত্রস্ত থাকে যাতে তার কর্ণকুহরে আযানের ধ্বনি প্রবিষ্ট না হতে পারে। আযান শেষ হওয়ার পর সে আবার প্রত্যাগমন করে এবং তাকবীরের সময় আবার পশ্চাদপসরণ করে থাকে। অতপর তাকবীর শেষে আবার সে নামাযীর কাছে গমন করে এবং ওয়াসওয়াসা দিতে শুরু করে। এ সময় সে নামাযীদের অন্তরে পুরাতন কথা ও স্মৃতি জাগিয়ে দিতে থাকে। এমনকি নামাযী কত রাকাআত নামায আদায় করেছে সেখানেও সন্দেহের সৃষ্টি করে থাকে।

–মিশকাত শরীফ আযান অধ্যায় দ্রঃ।

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী র. এ প্রসঙ্গে বলেন, "আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আযানের ধ্বনির মধ্যে শয়তানের নিমিত্তে এমনই এক ভীতিপ্রদ প্রভাব বিদ্যমান রেখেছেন, যা সে কিছুতেই বরদাশত করতে পারে না। এজন্য সে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। প্রকৃতপক্ষে, আযান নামায হতে কোনো বিচ্ছিন্ন জিনিস নয় বরং আযান নামাযের পূর্ব প্রস্তুতি স্বরূপ।"

–আশআমাতুল লুম'আত ১ম খণ্ড পৃঃ ১৭৬।

নামাযের জন্য আযানের প্রচলন কখন থেকে শুরু হয়, তা হাদীস বিশেষজ্ঞ সুপণ্ডিত গবেষক আলেমদের বর্ণনা হতে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। তাদের অভিমত এই যে, মহানবী স. পবিত্র মক্কা শরীফ হতে হিজরত করে মদীনায় আসার পরেই আযানের প্রচলন আল্লাহর নির্দেশে ইসলামের

www.pathagar.com

একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। (ফতহুল বারী আযান শুরুর অধ্যায় দ্র ঃ) এ সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সূরা আল মায়েদার ৫৮ আয়াত এবং সূরা আল জুমায়া ৯ আয়াত ও তাদের শানেনুযূল এবং মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব নামক গ্রন্থের ২১৯ পৃষ্ঠার আযানের গুরুত্ব অধ্যায়।

www.pathagar.com

১৮. নামায ও জামায়াত

জামায়াতের সাথে নামাযের একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। আর এজন্যই জামায়াতের সাথে নামায আদায় করা অবশ্যকরণীয় করা হয়েছে।

–বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬০৮

হাদীসে আছে, একদা কয়েকজন লোককে নামাযের জামায়াতে অনুপস্থিত দেখে রসূলুল্লাহ স. বললেন—আমার ইচ্ছা হয় যে, অন্য কাউকে ইমাম বানিয়ে নামায পড়াতে আদেশ করি এবং তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়ে আসি যারা জামায়াত হতে পশ্চাদপদ হয়েছে। অন্য হাদীসে আছে, নবী করীম স. বলেছেন, যদি তাদের ঘরের মধ্যে মেয়েরা ও সন্তান সন্ততি না থাকতো তবে আমি এশার নামায পড়াতাম এবং আমার যুবকগণকে তাদের ঘরের যাবতীয় বস্তু জ্বালিয়ে দিতে আদেশ করতাম।

–সিরাজুছ ছালেকীন পৃ ঃ ৪০৫-৪০৬

উপরোক্ত হাদীসগুলোর দ্বারা জামায়াতের সাথে নামায পড়ার গুরুত্বই প্রকাশ পেয়েছে। এ গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে একদা নবী করীম স. বলেছিলেন, জামায়াতে নামায পড়া একাকী নামায পড়া অপেক্ষা ২৭ গুণ শ্রেষ্ঠ।–বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৬০৯ ও ৬১০

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, জামায়াতে নামায পড়া একা নামায পড়া অপেক্ষা পঁচিশ গুণ সওয়াব বেশি। আর নামাযীর সংখ্যা যত বেশি হবে সেই সংখ্যা অনুপাতে সওয়াবও ততোধিক হবে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, যদি দশ হাজার মুসল্লী হয় ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদি চল্লিশ হাজারও হয় (তথাপি সংখ্যা অনুপাতে সওয়াব হবে। জামায়াতের নিম্নতম সংখ্যা দুই) (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ১০১০ ও ১০১১)। জামায়াতের সাথে নামায আদায় করার গুরুত্ব অধিক বলেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর মানব পরিচালন বিধি আল কুরআনে বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

"হে ঈমানদারগণ যখন তোমাদেরকে জুম'আর নামাযের জন্য আহ্বান করা হয় তখন ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ রেখে আল্লাহর স্মরণের জন্য দ্রুত

www.pathagar.com

ধাবিত হও, এটা তোমাদের জন্য উত্তম, অবশ্য যদি তোমরা বুঝ।"
–সূরা আল জুমুআ ঃ ৯

বলাবাহুল্য যে, এটা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্যই প্রযোজ্য।

আবু হুরাইরা রা. বলেন, তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছেন, লোকেরা যদি আযান দেয়ার ও (নামাযের) প্রথম কাতারে দাঁড়াবার ফযীলত জানতো এবং এ সাথে একথাও জানতো যে, লটারীর সাহায্য ছাড়া তা লাভ করা সম্ভব নয় তাহলে অবশ্যই তারা লটারীর সাহায্য নিত। আর তারা যদি জানতো প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়ার ফযীলত কত বেশি তাহলে অবশ্যই তারা ওয়াক্তের প্রথম ভাগেই (নামাযের জন্য) আসতো। আর তারা যদি জানতো এশা ও ফজরের (জামায়াতে) পড়ার সওয়াব কত বেশি তাহলে অবশ্য তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও (জামায়াতে) আসতো।

–সহীহ আল বুখারী পৃঃ ২৮০ হাদীস ৫৮০।

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, ঘরে এবং বাজারে নামায পড়ার চেয়ে (মসজিদে) জামায়াতের নামাযে পঁচিশ গুণ সওয়াব বেশী। কোনো এক ব্যক্তি যখন ভালো করে অযু করে মসজিদের দিকে বের হয় এবং একমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যেই সে মসজিদে যায়, তখন তার প্রত্যেকটি পদক্ষেপের জন্য তার একটি পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং তার একটি গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। নামায পড়ে সে যতক্ষণ মুসল্লায় অবস্থান করে ফেরেশতাকুল তার জন্য ততক্ষণ এ বলে দোয়া করে ঃ "হে আল্লাহ! তাকে তোমার রহমত দান কর, তার প্রতি অনুগ্রহ কর। আর তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষায় থাকে, সে ততক্ষণ নামাযের মধ্যে আছে বলে গণ্য হয়।–বুখারী হাদীস নং ৬১১।

আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম স. বলেন, যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে দূরে বাস করে লোকদের মধ্যে (দূর থেকে এসে জামায়াতে নামায পড়ার কারণে) তারই সওয়াব বেশি হয়। আর এর চেয়ে যে আরো দূরে থাকে তার সওয়াব আরো বেশি হয়। যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে তার চেয়ে ঐ ব্যক্তির সওয়াব বেশি যে ইমামের সাথে নামায পড়ার জন্য অপেক্ষা করে।–বুখারী, ৬১৩, ৬১৪

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী করীম স. বলেছেন, সাত প্রকার লোককে আল্লাহ নিজের আরশের ছায়ায় আশ্রয় দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। এ সাত প্রকার লোক হচ্ছে ঃ (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক, (২) যে যুবক তার প্রভুর (আল্লাহর) ইবাদাত করতে

www.pathagar.com

করতে বড়ো হয়েছে, (৩) যে ব্যক্তির মন মসজিদের সাথে বাঁধা, (৪) যে দুটি লোক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালোবাসে তারা আল্লাহর উদ্দেশ্যেই মিলিত হয়, আবার আল্লাহরই উদ্দেশ্যে বিচ্ছিন্ন হয় (৫) যে ব্যক্তি মর্যাদাসম্পন্ন রূপসী নারীর আহ্বানকে এই বলে প্রত্যাখান করে যে, আমি আল্লাহকে ভয় করি (৬) যে ব্যক্তি এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত কি খরচ করছে তা তার বাম হাত জানতে পারে না এবং (৭) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রুধারা বইতে থাকে।–বুখারী হাদীস নং ৬২০

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, মুনাফিকের জন্য ফজর ও এশার নামযের চেয়ে অন্য কোনো নামায কঠিন নয়। তারা যদি এ ওয়াক্তের নামাযের সওয়াব জানতো, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা এ (দু ওয়াক্তের) নামাযে আসতো। আমি সংকল্প করেছিলাম মুয়ায্যিনকে আযান দেয়ার আদেশ করবো এরপর কাউকে ইমামতী করতে বলবো এবং যারা এখনো নামাযে শরীক হয়নি আমি আগুন দিয়ে তাদের ঘরগুলো জ্বালিয়ে দেব। (কিন্তু তাদের পরিবার পরিজনের কথা ভেবে আমার এ ইচ্ছা ত্যাগ করি।–বুখারী, হাদীস নং ৬১৭

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, কোনো ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় যতবার মসজিদে যাতায়াত করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ততোবারের মেহমানদারীর সামগ্রী তৈরী করে রাখেন।–হাদীস নং ৬২২

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন রসূল (স) রোগাক্রান্ত ছিলেন এবং তাঁর রোগের তীব্রতা বেড়ে গেলো তখন আমার ঘরে তাঁর রোগ-সেবার জন্য স্ত্রীদের নিকট অনুমতি চাইলেন। তাঁরা সকলেই অনুমতি দিলেন। (নামাযের সময় হলে) তিনি দুজন লোকের উপর ভর করে নামাযের জন্য বের হলেন, তাঁর পা দুটি মাটিতে হেঁচড়ে চলছিল। তিনি আব্বাস এবং অপর এক ব্যক্তির উপর ভর দিয়ে চলছিলেন। উবাইদুল্লাহ বলেন ঃ আয়েশা আমার কাছে যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, আমি ইবনে আব্বাসের কাছে সে কথা ব্যক্ত করলে তিনি আমাকে বললেন, যে ব্যক্তির নাম আয়েশা বলেননি তুমি জান সে ব্যক্তি কে ছিলেন ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, অপর ব্যক্তি ছিলেন আলী ইবনে আবু তালিব।–বুখারী, হাদীস নং ৬২৫

উপরোক্ত আলোচনা ও হাদীস থেকে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নামায জামায়াতে আদায় করা কতো জরুরী এবং তাৎপর্যপূর্ণ।

www.pathagar.com

১৯. জামায়াতে নামায আদায় করার এতো গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ার কারণ

আল্লাহ বলেন ঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ص

"আর তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৩

জামায়াতে নামায পড়া মানুষকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে রক্ষা করে এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠায় একটি সুশৃংখল বাহিনীতে পরিণত করে, যে বাহিনীর গতি, ইতিহাস সাক্ষ দেয় একদা তারা হয়েছিল অপ্রতিরোধ্য। রোমানদের এ পৃথিবীর যে বিশাল ভূ-খণ্ড দখল করতে লেগেছিল যত শতক মুসলমানদের লেগেছিল ততো দশক। এর একমাত্র কারণ হলো, নামায মানুষকে যে ঈমানী শক্তি দান করে এবং জামায়াতে নামায আদায় করার দরুন মুসলমান ইমাম বা নেতার প্রতি যে আনুগত্য ও শৃংখলার শিক্ষা পায় তাই তার কর্মজীবনে সোনালী ফসল প্রদান করে। বলাবাহুল্য যে, জীবনের সর্বক্ষণ নিজেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বান্দা মনে করা, অনুগত গোলামের ন্যায় প্রভুর অধীন হয়ে থাকা এবং প্রভুর হুকুম পালনের জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকার নামই হচ্ছে "ইবাদাত"। আর জামায়াতের সাথে নামায পড়া মানুষকে এ ইবাদাতের জন্যই প্রস্তুত করে। এরূপ ইবাদাতের জন্য মানুষের মধ্যে যতগুলো গুণের প্রয়োজন, জামায়াতের সাথে নামায আদায় করলে তার সবই তার মধ্যে সৃষ্টি হয়। দাস হওয়ার অনুভূতি, আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং তাঁর মানব পরিচালন-বিধি ঐশী গ্রন্থ আল কুরআনের প্রতি ঈমান, পরকালের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস, আল্লাহভীতি, আল্লাহকে আলেমুল গায়েব বলে স্বীকার করা, তাঁকে সব সময়ই নিজের কাছে অনুভব করা, আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য সর্বদা নিজেকে প্রস্তুত রাখা, আল্লাহর হুকুমগুলো ভালো করে জানা—জামায়াতের সাথে নামায আদায় করলে এসব এবং এ ধরনের বহুগুণই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় এবং সে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের খাঁটি বান্দা রূপে গড়ে ওঠে।

একটু চিন্তা করলেই আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে, মানুষ নিজে যতই শক্তিশালী ও গুণসম্পন্ন হোক না কেন, অন্যান্য মানুষ যতক্ষণ তার সহযোগী ও সাহায্যকারী না হবে ততক্ষণ সে আল্লাহর বন্দেগীর

www.pathagar.com

'হক' পরিপূর্ণ রূপে আদায় করতে পারে না। মানুষ যাদের সাথে দিবা-রাত্র জীবন যাপন করে সবসময় যাদের সাথে একত্রে কাজ করে, আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ফরমাবরদারী করার ব্যাপারে তারা যদি পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা না করে, পরস্পর একতাবদ্ধ না হয় তবে সে কিছুতেই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের হুকুম পালনে সমর্থ হয় না।

মানুষ এ দুনিয়াতে একাকী আসেনি। একাকী থেকে সে কিছু করতেও পারে না। সে পাড়া প্রতিবেশী ও সহকর্মী এবং জীবন-পথের সঙ্গী-সাথীদের সাথে নানাভাবে জড়িত। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের হুকুম আহকামও কোনো নিঃসঙ্গ শুধুমাত্র একটি মানুষের জন্যই নয় বরং সকল মানুষের জন্য জীবনের সকল প্রকার সম্পর্ক সম্বন্ধ সঠিকভাবে বজায় রাখার জন্যই তা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের তরফ থেকে এসেছে। এক্ষণে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের হুকুম পালনের ব্যাপারে যদি সবাই পরস্পরকে সাহায্য করে, সহযোগিতা করে তবেই তারা এক সাথে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের হুকুম পালনকারী হতে পারে। পক্ষান্তরে সকলে মিলেই যদি আল্লাহর নাফরমানি শুরু করে কিংবা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক যদি এমন হয় যে, আল্লাহর আদেশ পালনে পরস্পর সহযোগিতা না করে, তবে একজন লোকের পক্ষে সঠিকভাবে নিয়মিত আল্লাহর হুকুম পালন করা এবং আল্লাহর বিধান অনুসারে কাজ করা একেবারেই অসম্ভব।

আপনারা যদি বিশেষ মনোসংযোগ সহকারে (Observation out look) কুরআন পাঠ করেন, তাহলে অবশ্যই জানতে পারবেন যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন কেবল আপনাকেই আল্লাহর অধীন ও অনুগত হতে এবং আল্লাহর হুকুম পালন করে চলতে বলেননি। বরং সে সাথে আপনাকে এ আদেশও দেয়া হয়েছে, আপনি সমগ্র দুনিয়াকে আল্লাহর অধীন ও অনুগত করে দিবেন, দুনিয়াতে আল্লাহর আইন জারী করবেন। কেননা আল কুরআনে আছে ঃ

اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ط

"আমি মানুষকে পৃথিবীতে আমার খলিফা বা প্রতিনিধি করে প্রেরণ করেছি।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৩০

আর এ কারণেই মানুষ দুনিয়ার যেখানে যেখানে শয়তানের আইন চলছে তা বন্ধ করে দেবে এবং সে স্থানে এক লা-শরীক আল্লাহর আইনের রাজত্ব কায়েম করবেন। আপনার প্রতি আল্লাহ রব্বুল আলামীন এই যে বিরাট খেদমতের আদেশ দিয়েছেন একজন লোকের পক্ষে এ কাজ সমাধা

www.pathagar.com

করা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। এ মতে বিশ্বাসী কোটি কোটি মুসলমানও যদি হয়, আর তারা পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে জীবন যাপন ও চলাফেরা করতে থাকে এবং তাদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ বা সম্পর্ক না থাকে তাহলে তারাও শয়তানের সুশৃংখল ও সুপ্রতিষ্ঠিত শক্তিকে কিছুতেই পরাজিত করতে পারে না। এ কারণেই আল্লাহর সৈনিক মুসলমানদের দলবদ্ধ হওয়া ও পরস্পরকে সাহায্য করা, একে অন্যের পৃষ্ঠপোষক ও সমর্থক হয়ে দাঁড়ান এবং সকলে মিলে একই উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য সম্মিলিতভাবে সংগ্রাম সাধনা করা একান্ত অপরিহার্য। জামায়াতে প্রতিদিন পাঁচবার নামায আদায় করলে মানুষের মধ্যে এই মনোভাব গড়ে ওঠে।

একটু গভীরভাবে লক্ষ করলে এটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, এত বড় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মুসলমানদের কেবল মিলিত ও একতাবদ্ধ হওয়াই যথেষ্ট নয়, তাদের মিলিত হতে হবে একটি সঠিক পন্থা (System) অনুসারে। অর্থাৎ এমনভাবে মুসলমানদের একটি জামায়াত গঠন করতে হবে, যাতে করে তাদের পরস্পরের মধ্যে সঠিক আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, যে সম্পর্কের মধ্যে থাকবে না কোনো দোষ বা ত্রুটি। সেই সাথে তাদের মধ্যে মত, লক্ষ, উদ্দেশ্য এবং কর্মনীতির পূর্ণ ঐক্য বর্তমান থাকে। তাদের মধ্যে একজন ইমাম বা নেতা (আমীর) হওয়া দরকার। তাদের মধ্যে সেই ইমাম বা নেতার ইশারা-ইংগিত অনুসারে কাজ করার অভ্যাস ও স্পৃহা থাকা চাই। তাদেরকে ইমাম বা নেতার হুকুম কেমন করে প্রতিপালন করতে হবে, আর তা কতদূরইবা করতে হবে এবং কোন্ কারণ ঘটলে নেতার বিরোধিতাও করা যেতে পারে তাও হৃদয়ঙ্গম করে ভালো করে বুঝে নেয়ার জন্য নামাযের মাধ্যমে নামাযীরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলী একথাগুলো মনে রাখুন এবং জামায়াতের সাথে নামায আদায় করলে এসব গুরুত্বপূর্ণ ভাবধারা নামাযীদের মধ্যে কেমন করে জেগে ওঠে তা একটু অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে বিচার করে দেখুন।

www.pathagar.com

২০. জামায়াতের সামরিক গুরুত্ব

আযান শোনা মাত্রই সকল প্রকার কাজকর্ম কায়কারবার পরিত্যাগ করে আল্লাহর ঘর মসজিদের দিকে যাওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। কাজেই আযানের সাথে সাথেই মুসলমানদের নিজ নিজ কাজ ত্যাগ করা এবং একই কেন্দ্রের (মসজিদ) দিকে সকলের অগ্রসর হওয়া একটি বিরাট সৈন্যবাহিনীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সৈন্য শিবিরে "বিউগলের" (Whistle) আওয়াজ হওয়ার সাথে সাথে প্রত্যেকটি সৈনিক বুঝতে পারে যে, সেনাপতি সকলকে ডাকছেন। এ সময় সকলের মধ্যে একই ভাবের উদয় হয়। সেই ভাব হচ্ছে সেনাপতির নির্দেশ পালনের কর্তব্য ও দায়িত্ব। একথা মনে হওয়ার সাথে সাথে সকলে একই কাজ করে, অর্থাৎ যে যেখানে আছে সেখান থেকে সে আওয়াজ শোনামাত্রই নির্দিষ্ট স্থানের দিকে দৌড়াতে থাকে। সৈন্যদের জন্য এ পন্থা (System) কেন গ্রহণ করা হলো ? প্রথমত এ জন্য যে, সৈনিকের মধ্যে সেনাপতির তথা সর্বময় কর্তার হুকুম পালন করার এবং হুকুম পালনের জন্য প্রস্তুত থাকার অভ্যাস সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত সে সাথে এ ধরনের সকল অনুগত সিপাহীদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী দল গঠিত হবে এবং সেনাপতির আদেশ পাওয়া মাত্র একই সময় একটি নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হওয়ার অভ্যাস সৃষ্টি হবে। এ অভ্যাসটি এজন্য দরকার যে, হঠাৎ কোনো জরুরি অবস্থা (Emergency period) দেখা দিলে যাতে করে সকল সিপাই একই আওয়াযে একই স্থানে হাজির হয়ে কর্তব্য পালন করতে পারে। বলাবাহুল্য, প্রত্যেক সৈনিক ব্যক্তিগতভাবে যদি খুব বড় বাহাদুর হয় কিন্তু প্রয়োজনের সময় ডাক দিলে অবিলম্বে উপস্থিত হয়ে যদি লড়াই করতে না পারে তাহলে তাতে বাহাদুরীর কোনোই মূল্য থাকে না। ডাক দেয়া মাত্র সৈন্যগণ যদি একত্র না হয় বরং নিজ ইচ্ছামত এক এক দিকে চলে যায়, তবে এ ধরনের হাজার বীর সৈনিককে শত্রুপক্ষের পঞ্চাশটি সৈনিকের একটি শৃংখলাবদ্ধ দল নাস্তা-নাবুদ করে দিতে পারে—যেমন দিয়েছিল নবী করীম স.-এর নেতৃত্বে নামাযী, মুত্তাকী, আল্লাহর সৈনিক গণ বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে। মুষ্টিমেয় জামায়াতবদ্ধ মুসলিম ফৌজের কাছে লক্ষ লক্ষ পারস্য ও রোমান সৈনিকগণ নির্মমভাবে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

আর এ কারণেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন সমস্ত মুসলমানকে আযান শোনা মাত্রই সকল কাজকর্ম কায়কারবার পিছনে ফেলে রেখে নিকটস্থ

www.pathagar.com

মসজিদে গিয়ে হাজির হবার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে করে ইমামের নেতৃত্বে ইমামের সঠিক পরিচালনায় এবং প্রশিক্ষণে একটি শক্তিশালী ইলাহী সেনাবাহিনী পরিণত হতে পারে। বলাবাহুল্য, দুনিয়ার সকল প্রকার সৈনিকের তুলনায় এ ইলাহী সেনাদের কর্তব্য অনেক বেশী, অনেক কঠোর। কারণ অন্যান্য ফৌজের পক্ষে বহুকাল ধরে হয়ত যুদ্ধ করার প্রয়োজন পড়ে এবং কবে কোন্ সময় যুদ্ধ বাধবে সে জন্য বহু পূর্ব হতেই এতসব ট্রেনিং দেয়া হয়। কিন্তু এ ইলাহী ফৌজকে প্রতিটি মুহূর্তেই শয়তানী শক্তির সাথে লড়াই করতে হয় এবং প্রত্যেকটি মুহূর্তেই সেনাপতি বা সর্বময় কর্তার আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। তাই একটি হাদীসে বলা হয়েছে, "স্বীয় কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধই বড় যুদ্ধ।" আর এ কারণেই খোদায়ী সৈনিকদের সদা প্রস্তুত থাকতে হয় এবং মানব শত্রু ও স্বীয় সকল শত্রুর বিরুদ্ধে সদা সর্বদা লড়াইয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। আর এ সার্বক্ষণিক যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য প্রস্তুতি স্বরূপ দিবারাত্র পাঁচবার মসজিদে উপস্থিত হয়ে সেনাপতি ইমামের নেতৃত্বে শারীরিক ও আন্তরিক ঈমানী প্যারেড-পিটিতে অংশগ্রহণ করতে হয় "আযান" স্বরূপ বিউগল গর্জন করে উঠার সাথে সাথে। বলাবাহুল্য, মুয়াযযিন ঠিক সেনাবাহিনীর সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড (Second in command) হিসেবে কাজ করে থাকেন। প্রধান সেনাপতিরূপ ইমাম যদি জামায়াতরূপ সেনাবাহিনী পরিচালনায় অসমর্থ হন কিংবা শাহাদাত বরণ করেন তখন সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড রূপ মুয়াযযিন সাথে সাথে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং অভিষ্ট লক্ষ অর্জনে এগিয়ে যাবেন।

স্মর্তব্য, মসজিদের মেহরাব মুসলিম সেনাবাহিনীর অস্ত্রাগার। আপনারা যখন সারি বেঁধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ান, তখন মনে হয় যেনো একটি বিরাট সেনাবাহিনী বাদশাহের সম্মুখে কর্তব্য পালনের জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়ানোর এবং একত্রে তালে তাল মিলিয়ে উঠা বসা করায় এবং হাত-পা একসাথে চালনা করায় নামাযীদের মনে ঐক্যের ভাব সৃষ্টি হয়। আর এ ঐক্য যে কোনো সাফল্যের চাবিকাঠি। তাই আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন ঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ص

"তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৩

এটা বলে ঐক্যের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

www.pathagar.com

'জামায়াত' নামাযীকে শারীরিক একতা বিধান করার সাথে সাথে 'ঈমানী একতা' বিধানও করে থাকে। যেমন লক্ষ করুন ঃ নামাযীরা জামায়াতে শামিল হয়ে একই ভাষায় একই মহান সত্তার নিকট আর্জি জানায় ঃ "ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তায়ীন"—হে আল্লাহ! আমরা কেবল তোমারই ইবাদাত করি এবং কেবল তোমারই কাছে সাহায্য চাই। "ইহদিনাস সিরাতল মুস্তাকিম"—হে আল্লাহ!, আমাদেরকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত কর। "রব্বানা লাকাল হামদ"—হে আল্লাহ! সকল তারীফ প্রশংসা একমাত্র তোমারই জন্য। আসসালামু আলাইনা ওয়া আ'লা ইবাদিল্লাহিস সালেহীন"—আমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপরেও। তারপরে নামায শেষ করে ঃ "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ"—তোমার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। এর অর্থ এই যে, নামাযীরা প্রত্যেকেই পরস্পর কল্যাণকামী এবং সকলে মিলে একই মালিকের কাছে সকলের কল্যাণের জন্য দাবী করছে। কোনো নামাযী এখানে একাকী নয়। তাদের কেউই কেবল মাত্র নিজের জন্য কল্যাণ কামনা করে না। বরং সকলের মুখে এই দোয়া যে, হে আল্লাহ! আমাদের সকলেরই প্রতি তোমার অনুগ্রহ ও কল্যাণ বর্ষিত হোক। সকলকে একই সহজ ও সোজা পথে চলার তাওফিক দাও। সকলের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক।

নামায এভাবে সকল নামাযীর অন্তরকে (Mind) পরস্পরের সাথে মিলিয়ে দেয়, সকলের মনে একই খেয়াল ও একই চিন্তাধারা জাগ্রত করে। তাদের পরস্পরের মধ্যে গভীর ভালোবাসা, ঐক্য ও কল্যাণাকাংখা সৃষ্টি করে, যেটা মুসলিম জাতিকে একটি শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত করে। আবু বকর, খালেদ, মূসা, তারেক এবং গাজী সালাহুদ্দীনের ন্যায় বিশ্ববিখ্যাত মহান বীরের জন্ম দেয়। ইতিহাস সাক্ষ দেয়—এ সমস্ত বিশ্ববিখ্যাত মহান মুসলিম বীরেরা মুমূর্ষু অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে ও অশ্বপৃষ্ঠে বসে ইসলামী আইন অনুযায়ী নামায আদায় করেছেন। মূলত নামায মানুষকে আল্লাহর সত্যিকারের বান্দা করে গড়ে তোলে। আর আল্লাহ রব্বুল আলামীনের বান্দা হয়ে যারা এ সাম্রাজ্যের নাগরিকের মর্যাদা লাভ করেন তারা আল্লাহ প্রণীত প্রতিটি আইন অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করায় আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হয়ে যায়। আর মানুষ যখন আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হয়ে যায় তখন সমস্ত সৃষ্টি তার অধীন হয়ে যায়। সে লাভ করে এক অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা—যাঁর কাছে সকল শক্তিই মাথানত করতে বাধ্য হয়। তাই তারা হয়ে ওঠে অপরাজেয় ও দুর্বার গতি সম্পন্ন। মূলত

www.pathagar.com

ওয়াক্তীয়া জামায়াত, সপ্তাহের জুমআর নামাযের জামায়াত, তারাবীর নামাযের জামায়াত, ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার নামাযের জামায়াত এবং সর্বোপরি হজ্জের আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনের জামায়াত আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের তাওহীদী সৈনিকদের বার্ষিক সামরিক মহড়া স্বরূপ। মহড়ায় সামরিক বাহিনী যেমন তাদের শৌর্য-বীর্য শৃংখলা ও শান-শওকত প্রদর্শন করে শত্রুকে ভীতি প্রদর্শন করার মাধ্যমে দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের চক্ষুকে শীতল করে থাকে, আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁর বাহিনী উপরোক্ত উপায়ে মহড়া প্রদর্শন করে থাকে।

❐

www.pathagar.com

২১. সমাজ সংস্কারে জামায়াতের গুরুত্ব

সমাজ সংস্কারে নামাযের জামায়াত একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে থাকে। নামাযী যখন অযু করে পূত-পবিত্র অবস্থায় জামায়াতে হাজির হওয়ার জন্য আযান শুনা মাত্র মসজিদে গমন করে তখন তার অন্তর অত্যন্ত পূত-পবিত্র ও নমনীয় থাকে। তখন তার অন্তরে শত্রুভাব বা হিংস্রভাব থাকে না। ফলে সে যখন অনেক দিকে তাকায় তখন সে উদার দৃষ্টিতে তাকায়। শত্রু যে দৃষ্টিতে শত্রুকে দেখে থাকে, সে কারোর প্রতি সেই দৃষ্টিতে তাকায় না, বরং বন্ধু যেরূপ বন্ধুর দিকে তাকায়, ভাই যে চোখে ভাইয়ের দিকে তাকায় ঠিক সেই দৃষ্টিতেই তারা একে অপরের প্রতি তাকিয়ে থাকে। এভাবে তাকাবার ফলে আপনি যখন কোনো ভাইকে পুরাতন ও ছেঁড়া কাপড় পরিহিত দেখতে পান, কাউকেও বিশেষ চিন্তা, বিপদগ্রস্ত বা ক্ষুধার্ত দেখেন, কাউকেও দেখেন অক্ষম, পংগু, পক্ষাঘাতগ্রস্ত বা অন্ধ তখন আপনার অন্তরে আপনাআপনিই সহানুভূতি ও দয়ার উদ্রেক হবে। ধনী লোকেরা গরীব ও অসহায় দুঃস্থদের দুঃখ-কষ্ট অনুভব করবে। ফকির-মিসকিন লোকেরা ধনীদের কাছে পৌঁছে নিজেদের দুরবস্থার কথা বলার সাহস পাবে। কারোর সম্পর্কে যদি আপনি জানতে পারেন যে, সে অসুস্থ কিংবা বিপদগ্রস্ত বলে মসজিদে আসতে পারেনি, তখন তাকে দেখতে যাওয়ার জন্য আপনার মনে আগ্রহ হবে। কারোর মৃত্যু সংবাদ পেলে জানাযা পড়তে গিয়ে থাকেন এবং তার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে থাকেন। এ সমস্ত কাজ সমাজের লোকদের মধ্যে গভীর ভালোবাসা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করে থাকে।

আরো একটু ভেবে দেখুন, আপনারা নামাযীরা যেখানে একত্রিত হন তা একটি উৎকৃষ্ট পাক-পবিত্র স্থান। এই পাক-পবিত্র স্থানে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে আপনারা একত্র হয়ে থাকেন। চোর-ডাকাত, শরাবী আর জুয়াড়ীদলও একস্থানে একত্র হয় বটে, কিন্তু তাদের সকলের মন অসৎ ইচ্ছায় পরিপূর্ণ থাকে। কিন্তু নামাযীদের সমবেত হওয়াকে এদের সাথে তুলনা করা যায় না। কারণ এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের খাঁটি বান্দাগণই একত্র হয়ে থাকেন। আল্লাহর ইবাদাতের জন্য আপনাদের ন্যায় নামাযীদের এ সম্মিলন আল্লাহর ঘরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আল্লাহর সম্মুখে বন্দেগী ও দাসত্বের কথা খালেস মনে স্বীকার করার জন্যই এখানে সকলে সমবেত হন। এ স্থানে ঈমানদার লোকদের মনে আপনা আপনি নিজ নিজ গুনাহের

www.pathagar.com

জন্য লজ্জার অনুভূতি জেগে ওঠে। অন্যদিকে যদি কোনো লোক অন্য কারোর সম্মুখে কোনো গুনাহের কাজ করে থাকে, আর সে ব্যক্তি যদি মসজিদে হাজির হয়, তাহলে কেবল এতেই গুনাহগার লজ্জায় মরে যায়। উপরন্তু মুসলমানদের মনে পরস্পরকে উপদেশ দেয়ার ভাবও যদি বর্তমান থাকে এবং সে যদি দরদ-ভালোবাসা ও সহানুভূতির সাথে একজনের দোষ-ত্রুটি কেমন করে দূর করা যায়, তা ভালো করে জেনে নেয়, তবে তাদের এ সম্মেলনের প্রতি আল্লাহর অশেষ রহমত ও বরকত নাযিল হবে —তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এভাবে জামায়াতে নামায পড়ার সুযোগে এক মুসলমান অন্য মুসলমানের দোষ ত্রুটি সংশোধন করতে পারবে— একজন অন্যজনের অভাব পূরণ করবে। ফলে ধীরে ধীরে গোটা সমাজই সৎ, প্রীতিপূর্ণ ও নেককার হয়ে উঠতে বাধ্য।

বস্তুত যারা দুনিয়ায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন করেন এবং গরীব-দুঃখী মানুষের অভাব-অভিযোগ দূরীকরণের জন্য সর্বহারার রাজনীতি করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে দেখা যায় তাঁদের এ আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য মূলত ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থ রক্ষা ও সুবিধা অর্জন। তাই একথা নিসন্দেহে বলা যায়—প্রকৃত মানব কল্যাণের জন্য চারিত্রিক, দৈহিক ও আত্মিক উন্নতি ও কল্যাণের জন্য ইসলামের দেয়া মুসলিম জাতির জন্য মসজিদ ব্যবস্থা হতে উত্তম ব্যবস্থা আর হতে পারে না। এটা মানুষের সর্বকালের সর্বযুগে বিশ্বকল্যাণ সাধনের জন্য একটি নজিরবিহীন ব্যবস্থা। মূলত এ ব্যবস্থা যেমন মানুষের অন্তরকে পরিশোধিত করে একটি সুন্দর সোনার মানুষে পরিণত করে অনুরূপভাবে সমাজ দেহ হতে সকল প্রকার অকল্যাণ ও পাপ বিদূরিত করে শান্তিতে ভরপুর একটি বেহেশতি সমাজ গড়ে তুলতে পারে। যা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষই কামনা করে। এ সম্পর্কে আরো জানতে পারবেন মাইকেল এইচ হার্ট-এর লেখা "দি হাণ্ড্রেড" গ্রন্থে।

❐

www.pathagar.com

২২. সাম্য প্রতিষ্ঠায় নামায

বর্ণবৈষম্যের মূলে কুঠারাঘাত করে ইসলাম সমাজে প্রকৃত ও নির্ভেজাল সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে। ইসলাম এর প্রথম প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করেছে ইসলামে প্রবেশ করার সাথে সাথেই নামায প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। কারণ কোনো লোক যখন কালেমা তাইয়েবা পড়ে আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষণা করে তখন আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার এ স্বীকৃতির বাস্তব প্রমাণ আদায় করে থাকেন নামাযের মাধ্যমে। সৃষ্টিগতভাবে এক মানুষ যে অন্য মানুষ থেকে বড় নয়, শ্রেষ্ঠ নয় তা স্বীকার করিয়ে নেয়ার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীন আইন জারি করে দিলেন নামাযের জন্য যে যখন যার পরে আসবে সে তখন শৃংখলার সাথে তার পরে গায়ে গা মিলিয়ে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়াবে। পিছনে এসে সামনের কাতারে যাবার জন্য কেউই সারি ভেদ করে যেতে পারবে না, তা তিনি সৈয়দ হউন, পাঠান হউন, জজ হউন, আর ব্যারিষ্টার হউন বা রাজা-বাদশাহ যে কেউই হউন না কেন। আর এজন্য মসজিদের জামায়াত বা ঈদের জামায়াতের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায় নামাযীগণ সকলে সারিবদ্ধভাবে গায়ে গা মিলিয়ে এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমান সমান ভাবে মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে হাজির হওয়ার জন্য পরপর দাঁড়িয়ে যান অত্যন্ত পূত-পবিত্র মন নিয়ে। এখানে কেউ বড় নয়, কেউ ছোট নয়, কেউ উচু নয়, কেউ নীচু নয়, কেউ রাজা নয়, কেউ প্রজা নয়, কেউ আশরাফ নয়, কেউ আতরাফ নয়, কেউ ধনী নয়, কেউ গরীব নয় বরং আল্লাহর দরবারে সকল মানুষই সমান। এখানে কারোর গায়ের সাথে কারোর পদস্পর্শ লাগার এবং কারোর মাথার পাগড়ী-টুপী বা কারোর ক্রীজ দেয়া ধোলাই পোশাক-পরিচ্ছদ, গাটের রুমাল কারোর পদতলে পড়ে বেসামাল হলেও কিছু আসে যায় না। কেউ কিছু মনে করে না।

বৃটেনের Lord পরিবারের খৃষ্টান সন্তান Lord Headly-এর স্ব পরিবারে ইসলাম গ্রহণের এটাই ছিলো মহা কারণ। ঘটনাটি ঘটে আনুমানিক ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ইরানের রাজধানী তেহরান শহরে। Lord Headly ছিলেন বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য। প্রমোদ ভ্রমণে এসেছিলেন ইরানে। সময়টি ছিল যোহর নামাযের সময়। দুই ঘোড়ায় টানা গদিওয়ালা টমটম গাড়িতে Lord Headly রাস্তা অতিক্রম করছিলেন। এমতাবস্থায় নামাযের আযান হওয়ায় টমটম ওয়ালা তার গাড়ীটি একটি গাছের ছায়ায় রেখে মসজিদে

www.pathagar.com

প্রবেশ করে এবং নামাযে দাঁড়িয়ে যায়। কাতারবন্দী হয়ে মুসলমানদের নামায পড়া অবলোকন করছিলেন Lord Headly অত্যন্ত গভীর ভাবে। ইতিমধ্যে চারিদিকে জনগণের মধ্যে একটু সন্ত্রস্তভাব লক্ষ করলেন Lord Headly সাহেব। একটু পরেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে গেলো Lord Headly সাহেবের কাছে। ঐতিহ্যবাহী ইরানের শাহান শাহ এসেছেন জামায়াতে নামায আদায়ের জন্য। মোটরগাড়ী থেকে নেমেই চরম প্রতাপশালী শাহ তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে মসজিদে প্রবেশ করলেন। তিনি সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী শৃংখলার সাথে পিছনের কাতারে দাঁড়িয়ে গেলেন। দুর্ভাগ্যই বলুন আর সৌভাগ্যই বলুন তাঁর অবস্থানটি ছিলো ঠিক টমটম ওয়ালার পিছনের কাতারের সরাসরি পিছনে। উভয়েই নামাযে রত। মিঃ Headly অত্যন্ত তাজ্জব ও বিস্ময়াভিভূত হয়ে এগুলো লক্ষ করছিলেন। Lord Headly ইসলামের সাম্যবাদ দেখে দারুণভাবে অভিভূত ও আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং গভীর আগ্রহ সহকারে সাধারাণ জনগণের সাথে এক সারিতে দাঁড়িয়ে চরম প্রতাপশালী ইরানের শাহান শাহের নামায পড়া দেখছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি স্বচক্ষে যা অবলোকন করেন তাতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে চটকরে একটু দূরে গাছ গাছালির মধ্যে রাস্তার পাশে টমটম নামিয়ে একটি ভীষণ বিপদের অপেক্ষায় ক্ষণ গুনতে থাকেন। কারণ তিনি যখন ইরানের শাহান শাহের নামাযে উঠা-বসা গভীর মনোযোগ সহকারে লক্ষ করছিলেন তখন হঠাৎ তিনি দেখতে পান শাহের মাথার রুমালটি টমটম ওয়ালার পায়ের গোড়ালির চাপ লেগে শাহের মাথা থেকে পড়ে যায়। এতে তিনি নিশ্চিত আশংকা করছিলেন টমটম ওয়ালার নির্ঘাত গর্দান যাবে। ফাঁসির কাষ্ঠে তাকে অবশ্যই ঝুলতে হবে এবং যেহেতু তারই টমটম ওয়ালা এ মহা অন্যায় কাজটি করেছে সেহেতু ঐ সাথে তাকেও (Lord Headly) একটা চরম পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে। তাই সে পালিয়ে লুকিয়ে ছিল গাছ-গাছালির আড়ালে। কিন্তু এদিকে টমটম ওয়ালা নামায শেষ করে যখন দেখতে পেলো তার টমটমও নেই সাহেবও নেই তখন সে ভাবলো নির্ঘাত সাহেব তার টমটম নিয়ে পালিয়ে গেছে। নতুবা তার ঘোড়া দুটি সাহেবকে বিপদে ফেলেছে। এ আশংকা নিয়ে সে যখন এদিক ওদিক ডাকতে ডাকতে সামনে এগুচ্ছিল হঠাৎ দেখতে পেল সাহেব রাস্তার পাশে গাছের আড়ালে লুকিয়ে আছে। Lord Headly টমটম ওয়ালাকে জীবন্ত ও অক্ষত দেখতে পেয়ে নিজের নজরকে বিশ্বাসই করতে পারছিল না। সে বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি করে বেঁচে এলে ? সবকিছু শুনার পর টমটম ওয়ালা বেচারী সাহেবের কথায় হেসেই ফেললো।

www.pathagar.com

সে বললো, নামাযের উদ্দেশ্যে মুসলমানরা যখন জামায়াতে দাঁড়ায় তখন সবাই সমান—কেউ সেখানে বাদশাও নয় কেউ ফকিরও নয়। ইসলামের এ চরম সাম্যবাদে Lord Headly যারপরনাই অভিভূত হন। দেশে ফিরে গিয়ে স্বপরিবারে লণ্ডনের ওকিং (Oking) মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ ঘটনা অত্যন্ত ফলাও করে প্রকাশ করে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত "Islamic Review" পত্রিকাটি (আনুমানিক ১৯২৬ সালে।)

জামায়াতের তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব' নামক অত্যন্ত তথ্য বহুল গ্রন্থের লেখক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জনাব আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক সাহেব বলেন ঃ "এ সময় নামাযীদের মধ্যে বংশ, গোত্র, পরিবার, দেশ ও ভাষার বৈপরীত্যের কারণে আদৌ কোনো পার্থক্য থাকে না। হতে পারে বংশগত ও বক্তিগতভাবে এদের কেউ সৈয়দ, কেউ শেখ, কেউ খান সাহেব, কেউ হাওলাদার আর কেউবা চৌধুরী ইত্যাদি। আবার তাদের কেউ হয়ত এক দেশের অধিবাসী, অপরজন অন্য দেশের। আবার কেউ এক ভাষায় কথা বলে, অপরজন অন্যভাষায় মনের গোপন ভাব প্রকাশ করে। ব্যক্তিগত ও বংশগতভাবে এত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তারা সকলে একই সারিতে দাঁড়িয়ে সম্মিলিতভাবে একই রবের ইবাদাত বন্দেগী করে .....। এখানে দেশ, অঞ্চল, বংশ, গোত্র ও জাতীয়তার সমস্ত ভেদ পার্থক্য সর্বৈব মিথ্যা।"–মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ঃ পৃষ্ঠা ১৪০-১৪১।

সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠায় নামায

জাযিরাতুল আরব বা আরব উপদ্বীপ সহ তৎকালীন প্রাচীন বিশ্বে যখন অসাম্য, অবিচার, অভিজাত, অনভিজাত, আরবী, আজমী, ভেদনীতি যখন তুঙ্গে, একটি বিশেষ শ্রেণী যখন আভিজাত্যের হিমাদ্রী শিখরে আরাম আয়েশে নিমগ্ন, বিশাল জনতা তখন অবিচার ও মিথ্যা শ্রেণী নিষ্পেষণে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হয়ে মৃত্যুর বিভীষিকা দর্শনে আতংকিত, সে সময় বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা স. আল কুরআনের সাম্যবাণী নিয়ে মানব সমাজে আবির্ভূত হন। বিশ্বনবীর জীবনের সার্বিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সর্বজাতিক সাম্য প্রতিষ্ঠাই ছিল মূল লক্ষ। এক কথায় বলা যায়, বিশ্বনবীই হলেন বিশ্বের সঠিক সাম্য ও সমতা ভিত্তিক ধারণার সার্থক প্রবক্তা ও বাস্তব প্রয়োগকারী। যে কারণে নবুওয়াত লাভের পূর্বে কিশোর বয়সে তিনি মক্কার পাথর অপসারন ও হিলফুল ফুজুলের প্রতিষ্ঠাতা। সাম্য

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠায় আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নির্দেশিত সালাত বা নামায কায়েম সামাজিক সাম্য ও ন্যায় বিচারের জ্বলন্ত প্রতীক। নামাযের মধ্যে সাম্য চেতনার যে দৃষ্টান্তসমূহ প্রয়োগ করা হয়েছে তা আলোচনা করা হলো ঃ

ক. কাতার বদ্ধ হওয়া। বিশেষ কোনো ব্যক্তির জন্য বিশেষ কোনো স্থান নেই।

খ. ইমাম সাহেবের পিছনে মুক্তাদীগণ নামায আদায় করলেও নামাযটা তাঁর নির্দেশিত নয়। ইমাম ও মুক্তাদীগণ একই সত্তার প্রতি অনুরক্ত ও সিজদাকারী ....।

গ. নামাযে কোনো বিশৃংখলার অবকাশ নেই। আল্লাহ্ যেমন এক, আল-কুরআন, রসূল ও মুসলিম উম্মাত এক ও অন্যান্য তেমনি নামাযের মধ্যে হাজার হাজার নামাযী এক প্রাণ ও সাম্যবাধে ইমামের তাকবীরের সাথে উঠছে বসছে। বলা যায় সুশৃংখল সাম্যে উৎকৃষ্টতম বাস্তবানুগ কর্মকাণ্ড।

ঘ. ইমাম নির্বাচনে সকলের কিংবা অধিকাংশের অনুমতি নেয়া প্রয়োজন। সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ধারণা।

ঙ. মার্কসের উনবিংশ শতাব্দির উদ্ভাবিত (?) সাম্যের ধারণা ১৪শত বছর পূর্বে নামাযের মধ্যে ধরা দিয়েছিল বাস্তবভাবে।

নামাযী মাত্রই ইসলামের অনুগামী। এখানে বংশ, গোত্র, দেশ, ভাষা. গাত্র বর্ণের পার্থক্য নির্বিশেষে সকলেই সমান। বিশেষ করে ঈদের নামাযান্তে কোলাকুলি করার মধ্যে অপরিচিত মুসলমানকেও সাম্যবোধে বুকে নিয়ে ভাই হিসেবে গ্রহণ করার প্রথা রয়েছে। নামাযে অনুসৃত সাম্যের কাছে মার্কস-এর আন্তরিকতাবাদ তথা বিশ্ব সাম্যবাদ ম্রিয়মান ও আপেক্ষিক শোনায়।

চ. নিয়মিত নামযীগণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে তাদের দুঃখ ব্যথা, অভিযোগ ও দৈন্য সহজে বুঝতে পারেন। নামাযী ভাইয়ের পোশাক আশাক জীর্ণ থাকলে কিংবা তাকে ক্ষুধার্ত দেখলে সাহায্য করার সুযোগ থাকে। বলা যায় সত্যিকারের সাম্যভিত্তিক সমাজ গঠনের একমাত্র পন্থা হলো সালাত বা নামায।

ছ. নিয়মিত নামাযীগণ অন্য কোনো নামাযী ভাইয়ের অনুপস্থিতি লক্ষ করলে তার ব্যক্তিগত অসুবিধা এমনকি অসুখের খোঁজ-খবর নিয়ে সাম্যভিত্তিক সমাজ গঠনে ব্রতী হতে পারেন। আর তা সম্ভব হয় একমাত্র নামায কায়েমের মধ্য দিয়ে।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে দার্শনিক কবি ডঃ আল্লামা ইকবাল-এর উক্তিটিও বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন ..... ইসলামী ইবাদাতে একটি বিশেষ দিক নির্দিষ্ট করা হয়েছে এ জন্য যে, এতে জামায়াতের মধ্যে ঐক্যের অনুভূতি সৃষ্টি হয়। তাছাড়া এর সাধারণ রূপ ইবাদাতকারীদের মধ্যে একটা সামাজিক সাম্যবোধের উন্মেষও ঘটায়। তাদের মধ্যে শ্রেণী ও বর্ণগত উচ্চমন্যতার উচ্ছেদ সাধন করাই তার লক্ষ। তাহলে দক্ষিণ ভারতের গর্বিত উচ্চমনা ব্রাহ্মণদের প্রত্যহ অস্পৃশ্যদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে হতো। যাবতীয় সসীম খুদীর স্রষ্টা ও রক্ষক সর্বাধার খুদীর একক স্বরূপ থেকেই প্রতীয়মান হয় সর্বমানবের অন্তর্নিহিত ঐক্য। কুরআনের মতে মানবতাকে বর্ণ, জাতি ও উপজাতিতে বিভক্ত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের পরিচয় নির্দেশ করা। ইসলামে জামায়াতে নামায পড়ার যে ব্যবস্থা আছে, জ্ঞানগত মূল্য ছাড়াও তার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে, যেসব সংস্কারের দেয়াল মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে রেখেছে, তা ভূমিস্মাৎ করে তাদের জীবনে এ অন্তর্লীন ঐক্যের বাস্তব উপলব্ধি জাগানো।

–ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল, ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন, পৃষ্ঠা ১২৯।

www.pathagar.com

২৩. ইমাম বা নেতা নির্বাচনে নামায

ইসলামী আইন হলো, যদি দু'জনও নামায পড়ে বা পথ চলে তবে তার একজন অবশ্যই নেতা বা ইমাম হবেন। এটা সুশৃংখল সমাজ গঠনে আমার মনে হয় একান্ত জরুরীও বটে। ইমাম বা নেতা সেই হবেন যিনি অধিকতর যোগ্য ও অভিজ্ঞ। ইমামের যোগ্যতা কেমন হবে সে সম্পর্ক অধ্যাপক আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দিক সাহেব বলতে গিয়ে বলেন, "এ ব্যাপারে ইসলামী শরীআতের নির্দেশ এই যে, মুসলিম সমাজের মধ্যে যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী মুত্তাকী-পরহেজগার হবে, যার দীনের জ্ঞান বা ইলম বেশি হবে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ সকলের অপেক্ষা ভাল করে পড়তে ও বুঝতে পারবে এবং সেই সাথে যার উপযুক্ত বয়স হয়েছে এ ধরনের যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে ইমাম নির্বাচিত করতে হবে। ....." তিনি আরো বলেন ঃ "ইসলামী শরীআতের বিধান হচ্ছে ঃ জামায়াতের অধিকাংশ লোক যাকে ইমাম বানাতে রাযী নয়, এমন ব্যক্তিকে ইমাম নিযুক্ত করা অনুচিত। অল্পসংখ্যক যাকে ইমাম নিযুক্তিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে, তাদের এ অসম্মতি ধর্তব্য নয়, কারণ সমাজে এরূপ লোক পাওয়া খুবই দুষ্কর। অপর পক্ষে জামায়াতের অধিকাংশ লোক যাকে ইমাম নিযুক্ত করতে আপত্তি করে তাকে কিছুতেই মসজিদের ইমাম নিযুক্ত করা বাঞ্ছনীয় নয়। এ বিধি-বিধান ও পদ্ধতির দ্বারা জাতির বৃহত্তর ক্ষেত্রে ইমাম বা নেতা নির্বাচন করার নিয়ম গোটা মুসলিম জাতিকে প্রকারান্তরে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আমাদের জীবনে এ নীতি বাস্তবায়নের জন্য সচেষ্ট হতে হবে, অন্যথায় ধর্মীয় ও জাতীয় জীবনে সঠিক সুফল পাওয়া সুদূর পরাহত।"

ইসলামের বিধান এই যে, যিনি নামাযের জন্য মসজিদের ইমাম নিযুক্ত হবেন তিনি অবশ্যই জামায়াতের উপস্থিত সকল শ্রেণীর নামাযীর অবস্থার প্রতি লক্ষ রেখে নামায পড়াবেন। কারণ নামাযীদের মধ্যে এমন বহু লোক থাকেন যারা বৃদ্ধ, রুগ্ন, অসুস্থ, ও কর্মজীবী দুর্বল। এমতাবস্থায় ইমাম সাহেব যদি কেবলমাত্র যুবক, শক্তিশালী ও অবসরপ্রাপ্ত লোকদের প্রতি লক্ষ্য রেখে নামাযে দীর্ঘ কিরআত পড়েন এবং লম্বা-লম্বা রুকূ' সিজদা করেন, তবে স্বভাতই রুগ্ন, অসুস্থ, বৃদ্ধ ও দুর্বল লোকদের কষ্ট হতে বাধ্য। এছাড়া জামায়াতে এমন অনেক লোক নামাযের জন্য সমবেত হন, যাঁরা অত্যন্ত জরুরী কাজ পরিত্যাগ করে নামাযের জন্য জামায়াতে আসেন। তাই তাঁরা তাড়াতাড়ি নামায শেষে নিজ নিজ কাজেকর্মে ফিরে যাবার জন্য

www.pathagar.com

স্বভাবতই উদগ্রীব থাকেন। এ ব্যাপারে মহানবী হযরত মুহাম্মদ স.-এর জীবনাদর্শ হতে আমাদের শিক্ষাগ্রহণ করা প্রয়োজন। তাঁর জিন্দেগীতে দেখা যায়—তিনি নামায পড়াবার সময় কোনো শিশুর কান্নার আওয়াজ তাঁর কর্ণগোচর হলে নামাযে কিরাআত সংক্ষেপ করতেন। কারণ, শিশুর পিতা-মাতা জামায়াতে শরীক থাকলে, অবশ্যই তাদের মনে কষ্ট হতে পারে, যা তাদের সঠিকভাবে নামায আদায়ের ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে।

এ বিধানের দ্বারা গোটা মুসলমান জাতির নেতৃবৃন্দকে এ শিক্ষাই দেয়া হয়েছে যে, তাঁকে যখন নেতা নির্বাচন করা হয়েছে, তখন তাঁর উচিত সকল সময়, প্রত্যেক কাজেই জাতি ও সমাজের সকল প্রকার লোকের প্রতি যথাযথ লক্ষ রাখা।

ইসলামী শরীআতে এ ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে যে, মসজিদে জামায়াতে নামায পড়াবার সময় হঠাৎ ইমামের যদি এমন কোনো অবস্থা হয় যাতে তিনি নামায পড়াতে অক্ষম হয়ে পড়েন, তখন তাঁর উচিত অনতিবিলম্বে ইমামের জন্য নির্ধারিত স্থান হতে সরে গিয়ে অন্য কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকে ইমামতির দায়িত্ব অর্পণ করা। এ নীতির দ্বারা মুসলিম জাতিকে এ শিক্ষাই দেয়া হয়েছে যে, মুসলিম জাতির নেতা যখন নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অক্ষম হবেন, তখন তিনি নিজেই পদত্যাগ করে অন্য কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকে সেখানে নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করবেন এবং এরূপ করা তার পক্ষে ফরয।

কাজেই এ কাজে তাঁর কোনো লজ্জাবোধ করা উচিত নয়। কারণ এতে কোনো পক্ষপাতিত্ব ও স্বার্থপরতার লেশমাত্র নেই, বরং মহান ও বিরাট জাতীয় কর্তব্য সম্পাদনের জন্য যিনি যখন যোগ্য বিবেচিত হবেন, তখন তাঁর উপর জাতীয় নেতৃত্ব ও কর্তব্য অর্পণ এবং তাঁকেও তা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা পবিত্র মহান দায়িত্ব। কিন্তু তাই বলে লোক যাকে চায় না, সে জোর করে দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য নির্বাচন কালে রাতের অন্ধকারে টাকা, শাড়ী-কাপড় বিতরণ, মণকে মণ দই, চিড়া, রসগোল্লা বিতরণ, তাতেও না কুলালে যোগ্য, সৎ জনগণের প্রিয়ভাজন পদপ্রার্থীকে নির্বাচন পূর্ব রাত্রিতে হাইজ্যাক এবং নৃশংস হত্যা করণ ইত্যাদি পন্থা কখনো মসজিদ কিংবা জাতীয় ইমাম বা নেতা নির্বাচনের নীতি হলে সে জাতির উন্নতি, শান্তি ও অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে যেতে যেমন বাধ্য তেমনি ধ্বংসও অনিবার্য।

জামায়াতের সাথে নামায পড়ার মাধ্যমে ইমাম ও মোক্তাদীদের মধ্যে একটা বিরাট মজবুত সম্পর্ক সৃষ্টি হয়—যার সাহায্যে প্রত্যেকটি মুসলমানই জানতে পারে যে, এ ছোট মসজিদের বাইরে পৃথিবী নামক বিরাট মসজিদে

www.pathagar.com

ইমামের মর্যাদা কি ? তাঁর কর্তব্য কি ? তাঁর কি কি অধিকার আছে ? সেই বড় মসজিদের ইমামের অনুসরণ আপনাকে কেমন ভাবে করতে হবে ? সে ভুল করলে আপনি কি করবেন ? তাঁর ভুলকে আপনি কতক্ষণ বরদাশত করবেন ? কখন আপনি তাঁর ভুল ধরতে পারবেন ? আর তা শুধরাবার দাবী করতে পারবেন ? আর কোন্ অবস্থায় ইমামকে পদচ্যুত করতে পারবেন ? এ সমস্ত কথা ছোটখাটোভাবে প্রত্যেক মুসলিমকে মসজিদের মধ্যে জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ভিতর দিয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। এক কথায় মসজিদে একটি ছোটখাটো রাজ্য চালাবার নিয়ম-কানুন দৈনিক পাঁচবার শিক্ষা দেয়া হয় এবং তার অভ্যাস করানো হয়।

❐

www.pathagar.com

২৪. আনুগত্য প্রশিক্ষণে নামায

জামায়াত, সরকার বা অন্য যে কোনো সংগঠনের সাফল্য নির্ভর করে সদস্য বা নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত নেতার প্রতি তাদের পূর্ণ আস্থাশীল হওয়া ও নেতার যথাযোগ্য মর্যাদা দান করার মধ্যে। এর চাহিদা মুতাবিক তারা নেতার কথা মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং তাঁর যাবতীয় বৈধ নির্দেশ পালন করবে।

আসুন লক্ষ করা যাক, জামায়াতের নামাযে কিভাবে ইমামের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করা হয়। কি ধরনের মনোভাব সহকারে তাঁর নির্দেশ পালন করা হয় এবং কতটুকু মর্যাদার সাথে তাঁর ভুল-ত্রুটি দেখিয়ে দেয়া হয়।

মুক্তাদী সকল অবস্থায়ই ইমামের আনুগত্য করতে বাধ্য। কারণ শরীআতে ইমামের বিরুদ্ধাচারণকারীদের কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করা হয়েছে।

ইমাম কিরআত বা নামাযের নিয়মে কোনো ভুল করে ফেললে অত্যন্ত শিষ্টতার সাথে তাঁর ভ্রান্তি নির্দেশ করে দেয়া হয়। স্পষ্ট ভাষায় বলা হয় না যে, তোমার ভুল হয়ে গেছে। কিরআত ভুল হয়ে গেলে নির্ভুল আয়াতটি বলে দেয়া হয় এবং নামাযের নিয়ম—পরম্পরায় কোনো ত্রুটি দেখা গেলে "সুবহানাল্লাহ" উচ্চারণ করে ইংগিতে বলে দেয়া হয় যে, একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই ভুল-ত্রুটির উর্ধে, মানুষের ভুল হওয়া স্বাভাবিক, তাই তাঁর ভুল হয়ে গেছে। নিজের নেতা ও পরিচালকের ভ্রান্তি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করার কি প্রশংসনীয় ব্যবস্থা। এরপরও যদি ইমাম ভুলকে ভুল মনে করে আত্মসংশোধন না করে তা হলেও তাঁর উপর এক্তেদাকারীকে নামায শেষ করতে হবে এবং নামাযের পর প্রয়োজন বোধে ইসলামী আইন অনুযায়ী ইমামের ভুল হলে আবার নামায দোহরাতে হবে। এভাবে জামায়াতে নামাযের মাধ্যমে জনগণ নিজেদের নেতা ও পরিচালকের প্রতি শিষ্টাচার এবং তাঁর বৈধ আদেশ-নিষেধ মেনে চলার শিক্ষা লাভ করে থাকে।

একথা মনে রাখতে হবে যে, ইমামের সাথে মুক্তাদীদের যে ধরনের ব্যবহারের কথা উপরে উল্লেখ করা হলো তা শুধু ছোটখাট ভুল সম্পর্কেই প্রযোজ্য। যদি ইমাম রসূলে করীম স.-এর সুন্নতের বিরোধিতা করে ফেলে বা কুরআন শরীফের আয়াতকে বিকৃত করে পাঠ করে, কিংবা নামাযের মধ্যেই কুফর, শিরক কিংবা স্পষ্ট গুনাহর কাজে লিপ্ত হয়, তাহলে জামায়াত ভেঙে দিয়ে উক্ত ইমামকে অপসারণ এবং তদস্থলে অপর কোনো ব্যক্তিকে

www.pathagar.com

ইমাম নির্বাচন করা মুসল্লিদের কর্তব্য। কারণ হাদীসে স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে ঃ "লা তাআতা লিমাখলুকিন ফী মাআসিয়াতিল খালেক" স্রষ্টার হুকুম অমান্য করে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।

প্রথমোক্ত অবস্থায় ইমামের আনুগত্য না করা যে পরিমাণ গুনাহ শেষোক্ত অবস্থায় তার প্রতি এক্তেদা করা আরো বেশী গুনাহ।—সমাজ সংস্কারে নামাযের ভূমিকা ভাওয়াল খান নাগরা, ইসলামী প্রকাশনা সংস্থা ১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা–১।

❐

www.pathagar.com

২৫. মসজিদের ইমাম এবং রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান

ব্যক্তি মানুষের উন্নতি, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নামাযের অবদান অনন্য। নামাযের পরিণত বিকাশ মসজিদে জামায়াতের সাথে। এ জামায়াতের দুটি অংগ (ক) ইমাম এবং (খ) মুক্তাদী। রাষ্ট্রের দুটি অংগ (ক) নাগরিক এবং (খ) রাষ্ট্রপতি। পাক কুরআন এবং ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে যিনি সর্বাপেক্ষা বেশি ওয়াকেফহাল ও অভিজ্ঞ, যার স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণের সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমানে রূপ পরিগ্রহ করেছে ইসলামের উন্নত আদর্শ ইমাম নির্বাচিত হওয়ার অগ্রাধিকার তাঁরই। মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ স. বলেন, "তোমাদের সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তিই যেন ইমামতী করেন।" তোমাদের নামায যদি গ্রহণযোগ্য করাতে চাও তবে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুধী সজ্জন ব্যক্তিই যেন ইমামতী করেন। তবে যদি দুর্ভাগ্যক্রমে কোথাও অপেক্ষাকৃত অনুপযুক্ত লোক ক্ষমতায় এসে অনধিকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে মূল সীমারেখা অতিক্রম না করেছে, নামায টুটে যায় এমন কাজ না করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত জাতীয় সংহতির খাতিরেই তার পিছনে নামায পড়তে হবে। এহেন অপ্রিয় পরিস্থিতিতে যথা কর্তব্যের নির্দেশ দিয়েই বলা হয়েছে, "সাল্লু খালফা কুল্লি বিররিন ওয়া ফাজের"–"পাপী পুণ্যবান সকলের পিছনেই নামায পড়ে নিও।"

জনসাধারণের সুখ-সুবিধা, দুঃখ-কষ্টের প্রতি সদা-সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলা, তাদের দুঃখ মোচন ও সুখের ব্যবস্থা ইমাম এবং রাষ্ট্রপতি উভয়েরই দায়িত্ব। প্রিয় নবী স. বলেন, "জাতির ইমামতকালে তুমি নামায সংক্ষেপ করো।" (তবে ভিতরে থেকে) "তোমাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত দুর্বলের অনুসরণ করো।" দুর্বলের স্বার্থের প্রতি প্রাথমিক মনোযোগও ইমামের দায়িত্ব।

রাজনৈতিক জীবনে পরস্পর সহযোগিতার পর রাষ্ট্রপতির উপরই নির্ভর করে জাতীয় কল্যাণ, রাষ্ট্রীয় উন্নতি ও স্থিতি। ইমামের নামাযের গুণাগুণ ও শুদ্ধাশুদ্ধি হিসেবে বিচার্য হয় জামায়াতে নামাযের শুদ্ধাশুদ্ধি। এ হিসেবে ইমামের দায়িত্ব অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রিয়নবী স. বলেন, ইমাম জামীন, মুক্তাদীর নামায তাঁর নামাযের অন্তর্ভুক্ত। তাই ইমাম যাতে সুপথে প্রতিষ্ঠিত এবং পদস্খলন থেকে নিরাপদে থাকেন তজ্জন্য প্রিয় নবী স. বলেন—হে আল্লাহ! ইমামদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করো। বলা

www.pathagar.com

নিষ্প্রোয়োজন যে, ইসলামের পরিভাষায় জাতীয় কর্ণধার বা রাষ্ট্রপতিও ইমাম নামে অভিহিত। আমীর বা খলিফা এরই অন্য নাম। নামাযের ইমামত ইমামতে সুগরা (ছোট) এবং রাষ্ট্রের ইমামত ইমামতে কুবরা (বড়) এবং এ হিসেবে নামাযের ইমাম সগীর (ছোট) রাষ্ট্রের ইমাম ইমামতে কবীর (বড়) নামে পরিচিত।

মুক্তাদীকে ইমামের অনুসরণ করতে হবে, অন্যথায় নামায "বাতিল"– বিনষ্ট হবে। প্রিয়নবী স. বলেন ইমামকে অনুসরণ করার জন্যই তো ইমাম নিয়োগ। "নামাযের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে ইমামের অনুগমন করতে হবে মুক্তাদীকে। অন্যথায় অথবা অগ্র গমনে অপূরণীয় ক্ষতি। প্রিয়নবী স. বলেন ইমাম যখন তাকবীর বলবে তোমরাও তখন তাকবীর বলবে। ইমাম যখন রুকূ' করবে তোমরাও তখন রুকূ' করবে। ইমাম যখন সিজদা করবে তোমরাও তখন সিজদা করবে। তবে ইমাম যখন ক্বিরআত পড়বে তোমরা তখন চুপ করে থাকবে। কেননা ইমামের কিরআতই তোমাদের কিরআত।* প্রিয়নবী স. বলেন—ইমামের পূর্বে সিজদা হতে যে ব্যক্তি মাথা উত্তোলন করে আল্লাহ তাআলা তার মাথা গাধার মাথার মত করে দিবেন বলে কি সে আশংকা করে না ?

রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রীয় ইমামের আনুগত্য এবং তাঁকে মেনে চলাতেই জাতীয় সংহতি অক্ষুণ্ন, জাতীয় শৃংখলা অব্যাহত এবং রাষ্ট্রীয় মর্যাদা স্থায়ী ও সমুন্নত থাকে। জাতীয় কল্যাণ এরই মধ্যে নিহিত।

জ্ঞান, গুণ ও আদর্শের মানদণ্ডে ইমাম নির্বাচন, জাতীয় স্বার্থ ও কল্যাণ ব্যবস্থায় যথাসাধ্য আত্মনিয়োগই ইমামের দায়িত্ব। ইমামের আনুগত্য, অনুসরণ, তার সাথে অবিচ্ছিন্ন সহযোগিতা, সংবিধান রূপায়ণে তাকে মেনে চলাই জাতির তথা জনগণের কর্তব্য। নামাযের অনুষ্ঠানে ইসলাম এ তথ্য উদঘাটিত করেছে এবং এ শিক্ষাই আমাদেরকে দান করেছে।

ইমামের ভুল হলে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া মুক্তাদীর দায়িত্ব। এ স্মরণ করে দেয়ার আবার নিয়ম-নীতি রয়েছে। কখনো তাসবীহ, কখনো তাকবীর উচ্চারিত হয় তজ্জন্য। কিরআতে ভুল হলে কিরআত দ্বারাই তা স্মরণ করে দেয়াই নিয়ম। কিন্তু ভুল সম্বন্ধে যদি মুক্তাদীর সাথে ইমামের মতভেদ হয়, তিনি যদি মুক্তাদীর অভিমত সত্ত্বেও স্বীয় ভুল সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে না পারেন ও নিজ মতের শুদ্ধতা সম্বন্ধে যদি অবিচলিত থাকেন তবে এক্ষেত্রে তারই মত গৃহীত হবে। আমীর, ইমাম তথা রাষ্ট্রপতির ভুল সম্বন্ধে

* তবে আহলে হাদীস এবং অন্য কোনো কোনো ইমামের মতে ইমামের পিছনে কিরাআত করা যাবে না।

www.pathagar.com

পরিস্থিতি হিসেবে তাঁকে যত সমীচীন সতর্ক ও স্মরণ করিয়ে দেয়ার অধিকার যেমন জনসাধারণের আছে তেমনি বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে আমীর বা রাষ্ট্রপতিকে "ভেটো পাওয়ার" (Veto power)-ও ইসলাম দান করেছে। রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি জনপ্রতিনিধি বা জনসাধারণের সাথে পরামর্শ করবেন সত্য কিন্তু সর্বাবস্থায় তাদের পরামর্শমত চলতে বাধ্য নন।

নামায পরিচালনায় ভুল শুদ্ধি সম্বন্ধে নামাযী ব্যক্তি কিরআত ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে ভিন্ন লোকের সংশোধন গ্রহণ করতে পারে, রাষ্ট্রব্যবস্থায় এবং মৌলিক বিষয় ও সংবিধান ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে ভিন্ন রাষ্ট্রের পরামর্শ রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে গ্রহণ করতে পারেন।

নামাযে যাতে ভিন্ন বস্তু এবং ভিন্ন লোকের প্রভাব না পড়ে, যে কোনো লোক যাতে হস্তক্ষেপ করতে না পারে তজ্জন্য যেমন বিশেষ পরিস্থিতিতে সংরক্ষণ ব্যূহ তথা "সুতরা" ব্যবহারের নির্দেশ রয়েছে। তেমনি রাষ্ট্র সংরক্ষণ ও হেফাজতে রাষ্ট্র পরিচালকের যথা সমীচীন সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। যদি কেউ ঐ সুতরা ডিংগাতে যায় কিংবা পারতপক্ষে নামাযীর সম্মুখ পথ অতিক্রম করে চলে তবে তাকে বাধা দেয়ার অধিকার মুসল্লী বা নামাযীর আছে। সহজ বাধায় যদি সে বিরত না থাকে তবে সেজন্য প্রিয়নবী স. বলপ্রয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। অনুরূপ ভাবেই যদি কোনো বিষাক্ত অথবা হিংস্র জন্তুর সম্মুখীন হয় তবে তাকে প্রতিরোধ করার অধিকার নামাযীর আছে। বলা বাহুল্য যে, রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ডিফেন্স এবং ফরেইন পলিসি (Defence and Foreign policy) তথা প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক নীতির প্রতিই এতে ইংগিত রয়েছে।

উদাহরণ আর বাড়াতে চাইনে। মোটকথা রাষ্ট্রব্যবস্থায় নামাযীর দান অবিস্মরণীয়। "জ্ঞান, গুণ ও উন্নত আদর্শই ইমাম নির্বাচনের মানদণ্ড। জাতীয় স্বার্থ ও কল্যাণ সাধনায় আত্মনিয়োগ যেমন ইমামের দায়িত্ব, তেমনি তাঁর সাথে সহযোগিতা করা এবং তাঁকে মেনে চলাও জাতির কর্তব্য।" (সাধনা ও সংবিধান, কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার রিসার্চ স্কলার এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা অধ্যাপক মাওলানা তাহের ৩১ কলীন স্ট্রীট, কলিকাতা ১৬, ১৯৬৪ ইং পৃঃ ৩৭।

www.pathagar.com

২৬. নামায মানুষকে কর্তব্য পরায়ণ ও কর্মঠ করে থাকে

নামায প্রত্যেক পুরুষ ও মহিলার জন্য পালনীয় কর্তব্য (ফরয)। আর নামাযীরা একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে নিয়েই দিনে পাঁচবার অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তার স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে রাজী খুশী করার জন্য এ কর্তব্য প্রতিপালন করে থাকে। এভাবে একটি মানুষ সঞ্চালিত হওয়ার (Gear up) অভ্যাস পেয়ে থাকে। ফলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই সে স্বীয় দায়িত্বের প্রতি কর্তব্য পরায়ণ ও কর্মঠ হয়ে ওঠে। আর এ কারণেই একজন নামাযী মানুষকে কোনো অলসতা বা শীতের প্রখর শীতলতা তাঁর কর্তব্য থেকে বিরত রাখতে পারে না। ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে থাকে তবুও তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব সে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে প্রতিপালন করে থাকে। একজন প্রকৃত মু'মিন ব্যক্তি কতবড় কর্তব্য পরায়ণ হয়ে ওঠে সে সম্পর্কে একটি বাস্তব ঘটনা শুনুন। আনুমানিক ১৯৬৯ সালের কথা। রাজশাহী "পাকিস্তান কাউন্সিল"-এ মরহুম ডক্টর মোহাম্মাদ শহীদুল্লাহর স্মরণে একটি আলোচনা অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে বহু সুধী ও পণ্ডিত ব্যক্তির সমাবেশ ঘটে। এ অনুষ্ঠানে ডক্টর মোহাম্মাদ শহিদুল্লাহ সাহেব নামাযের প্রতি যে কি পরিমাণ কর্তব্য পরায়ণ ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তারই একটি প্রমাণ পেশ করেন মরহুমের ছাত্র ডক্টর মাযহারুল ইসলাম। তিনি বলেন একদা স্যারের সাথে একটি সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হয়ে কলিকাতায় যাচ্ছিলাম। এ দাওয়াত পত্র গ্রহণ করার পর স্যার হঠাৎ করে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু যেহেতু তিনি দাওয়াত গ্রহণ করেছেন সেহেতু তিনি ভীষণ জ্বর অবস্থায়ও ঢাকা ত্যাগ করে কলিকাতার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। সাথে করে নিয়ে আসেন বাড়ীর ভৃত্যটিকে। ছেলেটি তাঁর পাশে থেকে সেবা শুশ্রূষা করতে থাকে। ডক্টর মাযহারুল ইসলাম অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে বলছিলেন ঃ আমিও স্যারের অসুখ দেখে তার পাশে গিয়ে বসলাম এবং মাথায় পানি দিতে লাগলাম। তখন তাঁর জ্ঞান কখনো আসছিলো কখনো যাচ্ছিলো। ইতিমধ্যে আসরের ওয়াক্ত হয়ে যায়। স্যার অস্ফুট স্বরে ভৃত্যটিকে জিজ্ঞেস করলেন। আসরের ওয়াক্ত কি হয়েছে ? আমরা মিথ্যা বললাম এই ভয়ে যে, স্যার এ অবস্থায় নামায পড়তে গেলে নিশ্চয় একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। স্যার আবার কিছুক্ষণ পরপর ঐ একই কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন এবং আমরা ঐ একইভাবে মিথ্যা কথা বললাম—না আসরের ওয়াক্ত এখনও হয়নি। ইতোমধ্যে চারিদিকে অন্ধকার ভাব দেখা দিলে স্যার আমাদেরকে ধমক দিয়ে বললেন ঃ অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে তবুও

www.pathagar.com

তোমাদের আসরের ওয়াক্ত হলো না। এই বলে স্যার জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসার চেষ্টা করলে বিছানায় পড়ে যান। আমরা দুজন তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরে খাড়া করি। স্যার বসে ঐ চরম জ্বরের মধ্যে পানি দ্বারা অযু করেন এবং বসে আসরের নামায আদায় করেন। এ দৃশ্য দেখে আমরা হতবাক হয়ে দূরে সরে যাই। স্যার আবার বিছানায় লুটিয়ে পড়েন। স্যারের কর্তব্য বোধ দেখে আমরা চমৎকৃত হই।

বিশ্বের প্রখ্যাত ১৮টি ভাষায় সুপণ্ডিত ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর এ কর্তব্য পরায়ণতা হোক আমাদের জীবনের আদর্শ।

একজন মুসলমান কখনো জ্ঞানহীন হতে পারে না। কেননা জ্ঞান অর্জন তার স্রষ্টা ও বিশ্বজাহানের একচ্ছত্র অধিপতি মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ রব্বুল আলামীন প্রত্যেক নর ও নারীর জন্য ফরয বা অবশ্যকরণীয় করে দিয়েছেন। যে মুসলমান আল্লাহর নির্দেশ মত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে এবং হালাল রুজী ভক্ষণ করে সে অবশ্যই দায়িত্বশীল ব্যক্তি। তার জন্য অত্যন্ত সতর্ক হওয়া স্বাভাবিক যে, পরিবারের পাড়াপড়শীর তথা দেশ ও জাতির প্রতি তার কী দায়িত্ব রয়েছে। যখন সে তার এ দায়িত্ব সম্বন্ধে হয় সচেতন তখন সে অলসতা করে তার জীবনের অমূল্য সময় তাস-পাশা খেলে বেলা দশটা পর্যন্ত নিবোর্ধের মত ঘুমিয়ে হাসি ঠাট্টা বা গান-বাজনায় আমোদ প্রমোদ উড়িয়ে দিয়ে ধ্বংসে নিপতিত হতে পারে না। সে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্বন্ধে যেহেতু সচেতন সেহেতু সে অত্যন্ত কর্মঠ ও কর্মতৎপর হয়ে ওঠে। আর এ দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য দিন রাতের ২৪টি ঘণ্টাকে কাজ অনুযায়ী ভাগ করে নেয় এবং একটি রুটিন মেনটেইন করে চলে। যদ্দরুন সে জীবনে উন্নতি করতে পারে। যারা জীবনে উন্নতি করেছে তাদের জীবনী পড়লে জানা যায় তাঁদের জীবনের একটি রুটিন ছিল এবং সে রুটিন তারা অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে অনুসরণ করতেন।

নামায মানুষকে এ রুটিন মেনে চলার শিক্ষা দেয়। ভোর বেলা উঠেই তাঁকে অযু-গোছল ও মেছওয়াকের মাধ্যমে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে হয়। সে এ পরিচ্ছন্ন শুধু বাহ্যিক দিক দিয়েই হয় না। অন্তরের দিক দিয়েও হয়। তারপর জোহরের আগেই তার অবশ্য করণীয় দুনিয়াদারীর কাজগুলো দ্রুততার সাথে সমাধা করতে হয় যাতে নামাযের জন্য যে সময় ব্যয় হয় তাতে চাষাবাদের কাজ, ক্ষেত-মজুরের কাজ এবং অফিস-আদালতের গুরুত্বপূর্ণ জনগণের কাজগুলো যেন ব্যাহত না হয়। তারপর আসর,

www.pathagar.com

মাগরিব এবং এশার নামায তাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করে যাতে করে সে অলস হতে না পারে। তাই বলা হয়ে থাকে জামায়াতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায মানুষকে কর্তব্য পরায়ণ ও কর্মঠ করে তোলে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ করার শক্তি দান করে থাকে।

www.pathagar.com

২৭. নামায মানুষকে আত্মনিয়ন্ত্রণ শক্তি দান করে

জীবন রক্ষার জন্য খাদ্য, বংশ রক্ষার জন্য নারী-পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণ এবং ক্ষয়প্রাপ্ত শক্তি ফিরে পাওয়ার জন্য বিশ্রাম ও আরামের ইচ্ছা মানুষের জন্মগত চাহিদাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এসব বিষয়ের প্রতি মানুষের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে তাকে কুরআনের পরিভাষায় বলা হয়েছে "হাওয়া" বা নফসের (রিপুর) খাহেশ। আরবী "হাওয়া" শব্দের অর্থ হচ্ছে পতন। যেহেতু নফসের খাহেশ মানুষের পতন ঘটিয়ে থাকে এজন্য একে "হাওয়া" বলা হয়েছে।

মানুষ বিধিসম্মত সীমার মধ্যে অবস্থান করে যদি তার নফসের খাহেশ পূর্ণ করে তবে সেটা ইসলাম। আর যদি সে খাহেশের গোলাম হয়ে যায় তাহলে তার চির শত্রু শয়তান এ দুর্বলতার সুযোগে মানুষের উপর সওয়ার হয়ে লাগাম টানা ঘোড়ার ন্যায় তাকে যদৃচ্ছা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চালায়। কুরআন মজিদে এ ধরনের খাহেশের গোলামদেরকে কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যেমন ঃ

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ج فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ج

"আমি ইচ্ছা করলে এর সাহায্যে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতে পারতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়েছে এবং তার নফসের খাহেশের দাসত্ব শুরু করে দিয়েছে, তার অবস্থা কুকুর তুল্য।"

–সূরা আল আরাফ ঃ ১৭৬

কুকুর এমন একটি জীব যার বের করা জিহ্বা এবং নিঃসৃয়মান লালা অফুরন্ত লালসাগ্নি ও চির অতৃপ্ত খাহেশের পরিচায়ক। আর এর যৌন উচ্ছৃংখলতা সর্বজন বিদিত। আমাদের দেশী ভাষায়ও দুনিয়ার লোভে উন্মাদ ব্যক্তিকে দুনিয়ার কুকুর বলা হয়ে থাকে। এ ধরনের লোক হেদায়াত লাভ করতে পারে না। হেদায়াতপ্রাপ্তি তো দূরের কথা, এসব লোক মানুষের মর্যাদা থেকে অধঃপতিত হতে হতে পশুর চেয়েও অধম হয়ে হয়ে যায়। কুরআন মজিদে বলা হয়েছে ঃ

اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ ط اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ۝ اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ ط اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ۝

www.pathagar.com

"তুমি কখনো সে ব্যক্তি সম্বন্ধে চিন্তা করেছ, যে ব্যক্তি নিজের খাহেশকে মাবুদ (উপাস্য) মনে করে নিয়েছে। তুমি কি এসব ব্যক্তিকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব নিতে পার, তুমি কি মনে করো এদের অধিকাংশ লোকই শুনতে পায় ও বুঝতে পারে ? এরা নিশ্চয়ই চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় বরং এর চেয়েও অধম।"–সূরা ফুরকান ঃ ৪৩-৪৪

নবী করীম স. বলেন, "লাইউমিনু আহদুকুম হাত্তা ইয়াকুনা হাওয়াহু তাবিয়াল লিমা জি'তুবিহি"—যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তির খাহেশ আমার শরীআতের (ঐশী আইনের) অধীন না হয়ে যায়, ততক্ষণ সে মু'মিন হতে পারে না।

মানবজাতির ইতিহাস থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, মানুষকে ঘায়েল করার জন্য শয়তান খাহেশের হাতিয়ার ব্যবহার করে থাকে। এজন্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের জন্য ইবাদাত নির্দিষ্ট করেছেন। তার মধ্যে ধাপে ধাপে আত্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আর সত্য কথা এই যে, দুনিয়াতে সে সমস্ত লোকই উন্নত মানের কাজ করে যেতে পারে যারা নিজেদের খাহেশকে আয়ত্তে রাখতে পারে এবং আল্লাহপ্রদত্ত শক্তিগুলোকে নিজের ইচ্ছামত কাজে লাগাতে সক্ষম হয়।

ইসলামী জীবনের সংস্কার সাধনে আত্মনিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব পরিষ্কারভাবে বুঝে নেয়ায় দেখা যায় দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের মাধ্যমে কি ভাবে এর ট্রেনিং হয়ে থাকে।

সকাল বেলা গরমের দিনে এ সময় সুখময় নিদ্রা মানুষকে বিভোর করে রাখে। মুয়ায্যিন আযানের মাধ্যমে ঘোষণা করে নামাযের জন্য এসো ঘুম থেকে নামায ভালো। আরাম প্রিয় নফস উঠতে চায় না। কিন্তু নামাযী নফসের খাহেশ বাতিল করে দিয়ে নামাযের জন্য উঠে যায়।

শীতের দিন। সকলা বেলা শীতের আধিক্য। গোসলের প্রয়োজন, গরম পানি পাওয়া যাচ্ছে না। আরাম প্রিয় নফস গোসল করতে ভয় পায়। কিন্তু নামাযী নফসের উপর জয়ী হয় এবং গোসল করে নামায আদায় করে ফেলে। কারণ তার জানা আছে প্রতি ওয়াক্তের নামায সময় মত আদায় করা অবশ্যকরণীয় (Compulsory)। গরমের দিন। গরমের দরুন দিনের প্রথম দিকে বেশী পরিশ্রম করা হয়েছে। ক্লান্তি দূর করার জন্য গোসল করা হয়েছে। দুপুরের খাবার খেয়ে আরামের জন্য কেবল কেউ শুয়েছে, অমনি মসজিদে যোহরের নামাযের আযানের আহবান। আরাম প্রিয় নফস ক্লান্তি ও গরমের দরুন ওজর পেশ করছে। কিন্তু নামাযী নফসের দাবী অস্বীকার

www.pathagar.com

করে সময়মত যোহরের নামায আদায় করে। কারণ সে নবীর হাদীস জানে (ক) যে ব্যক্তি আযানের আহবান শ্রবণ করার পরও মসজিদে না যায় সে মুনাফিক (খ) যদি মানুষ জানতো আযান দেয়ার মধ্যে এবং নামাযের জামায়াতে প্রথম সারিতে দাঁড়ানোর মধ্যে কি ফযিলত নিহিত আছে, তবে তারা এ মর্যাদা ও সৌভাগ্য লাভের জন্য লটারীর সাহায্যে ফায়সালা করতো।–বুখারী ও মুসলিম

দিবাভাগ শেষ প্রায়। প্রত্যেক ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বেই নিজ নিজ কাজ সামলে নেয়ার চেষ্টায় মশগুল। দোকানগুলোতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয় ভীষণভাবে চলছে। কোনো কোনো লোকের ঐ সময়টা ভ্রমণ ও আনন্দের সময়। দিনের এ কর্ম ব্যস্ততার সময় আসরের নামায। নফস ব্যস্ততার ওজর পেশ করে। কিন্তু নামাযী নফসের উপর নিজের প্রাধান্য বিস্তার করে এবং নামায আদায় করে থাকে।

সারাদিনের কর্মব্যস্ততা থেকে মুক্তি পাওয়ার সাথে সাথেই মাগরিবের নামায। নফস বলে আমার ক্ষুধা পেয়েছে। খুব ক্লান্ত। ঘরে গিয়ে খাবার খেয়ে বিশ্রাম করা খুবই দরকার। কিন্তু নামাযী নফসের এ খাহেশকেও রদ করে দিয়ে মাগরিবের নামায আদায় করে নেয়।

মাগরিবের নামাযের পর খাওয়া শেষ করতেই শরীর এলিয়ে পড়ে। এ সময় সাংসারিক বিষয়াদিরও আলোচনা হয়। পরবর্তী দিনের কাজ-কর্ম সম্পর্কেও এ সময় চিন্তা করা হয় এদিকে মসজিদ থেকে এশার নামাযের আযান শোনা যায়। নামাযী এসব বিষয় ছেড়ে দিয়ে এশার নামায আদায় করে নেয়।

রুগ্ন অবস্থায় নফস নামায থেকে রেহাই পেতে চায়। কখনো কষ্ট এবং কখনো দুর্বলতার ওজর পেশ করে। কোনো সময় শরীর ও কাপড় অপবিত্র থাকার অজুহাত দেখায় কিন্তু নামাযী নফসের এসব ওজর আপত্তি মোটেই শোনে না। অযু গোসল করতে না পারলে তায়াম্মুম এবং কাপড় পাক করতে না পারলে কাপড় পরিবর্তন করে এবং দাঁড়িয়ে নামায পড়তে না পারলে বসে অথবা শুয়ে ইশারা-ইংগিতে হলেও নামায আদায় করে নেয়।

নামাযী সফরে আছে। সফরে নানাবিধ অসুবিধা নামায আদায় করার কাজে বাধা সৃষ্টি করে। কখনো বা পবিত্রতা ও অযুর জন্য পানি পাওয়া যায় না। মোটর বা রেলগাড়িতে নামাযের জন্য জায়গা পাওয়া যায় না। নফস এসব অসুবিধার ওজর দেখায়। নামাযী এসব অসুবিধা সত্ত্বেও অবস্থাকে আয়ত্তে রেখে নামায আদায় করার সকল সম্ভাব্য চেষ্টা জারি রাখে।

www.pathagar.com

মোদ্দাকথা হলো জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে মানুষের নফস সর্বদা লাভ-লোকসান, আনন্দ-সুখ, দুঃখ-কষ্ট, ব্যস্ততা ইত্যাদির অজুহাত পেশ করে থাকে এবং এসবের কোথাও দুর্বলতা দেখা দিলেই তার উপর সওয়ার হয়ে যাবার সুযোগ খুঁজতে থাকে। কিন্তু নামায সর্বদাই মানুষের জন্য চাবুক রূপে হাজির হয় এবং তার তন্দ্রাচ্ছন্ন শক্তি ও বাসনাকে জাগিয়ে তোলে। এতদসঙ্গে সে এ দাবীও করে যে, মানুষ নফসের খাহেসকে তার আয়ত্বে রাখবে এবং কখনো এর গোলামী করবে না। নফসের দাবী ও নামাযের আহবানের মধ্যে প্রতিটি দিনই এ দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। আর এ দ্বন্দ্ব বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন অবস্থায় দেখা দেয়। কখনো সফরে, কখনো রোগ শয্যায়, গরমে আর কখনো শীতে, কখনো আরামের সময় আর কখনো সুখের সময়, কখনো শোক দুঃখ বা কষ্টের অবস্থায়। নামাযী নফসের কথামত কাজ করা শুরু করে দিলে তার পরাজয় হয়ে যায় এবং যে গোলাম ছিল সে মনিব হয়ে যায়। আর যদি সকল অবস্থায় ও সকল সময় নামাযী নামাযের দাবী পূর্ণ করে তাহলে ক্রমশ নামাযীর অজ্ঞাতসারেই তাঁর ব্যক্তিত্বের নফসের উপর প্রাধান্য বিস্তারের শক্তি অর্জিত হয়। যার ফলে নফসকে আয়ত্বে রেখে খাবার ও যৌন প্রয়োজন পূরণ করার ব্যাপারে শরীআতের সীমা রক্ষা করা সম্ভব হয়ে ওঠে।

এর বিপরীত যেসব লোক নফসের গোলামী করে এবং নামায ছেড়ে দেয়, নামাযে গড়িমসি করে তারা ইসলামের অন্যান্য দায়িত্ব পালনেও এর চেয়ে অধিক গাফলতি করে এবং এভাবে শয়তানের ফাঁদে পা দিয়ে ভ্রান্তপথে চলতে শুরু করে দেয়। আল্লাহ বলেন ঃ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ○

"এদের পর এমন অবাধ্য লোক এলো যারা নামায ছেড়ে দিল এবং খাহেশের পিছনে চলতে শুরু করলো অতএব শীগগীরই এরা ভ্রান্তিতে নিমগ্ন হয়ে যাবে।"–সূরা মারইয়াম ঃ ৫৯

সম্ভবত হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ এ আয়াতের সতর্কবাণী থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই তাঁর খেলাফতের যামানায় সকল সরকারী কর্মচারীদের নামে এক সাধারণ অর্ডিন্যান্স (General ordinance) জারী করেন এবং এতে নামাযের বিষয়ে নিম্ন লিখিত উক্তি করেন ঃ

www.pathagar.com

"নামাযের সময় সকল কাজ বাদ দাও। কেননা যারা নামায ছেড়ে দেবে তারা অন্যান্য ইসলামী হুকুম-আহকাম পালনের ব্যাপারে বেশী গাফিলতী করবে।" [সিরাত পত্রিকা (উর্দু) ওমর ইবনে আবদুল আজিজ —মাওলানা আবদুস সালাম নদভী প্রণীত।]

www.pathagar.com

২৮. নামায মানুষকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে

অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য খাদ্য, বংশবৃদ্ধির জন্য যৌন-মিলন এবং ক্ষয়প্রাপ্ত দৈহিক বল পুনরুদ্ধারের জন্য বিশ্রাম—এ তিনটি মানুষের মৌলিক দরকারী বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ রব্বুল আলামীন সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র মানুষকে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আযাদী দান করেছেন। এ আযাদীর সুযোগ নিয়ে মানুষ ইচ্ছা করলে উপরোল্লিখিত প্রয়োজনগুলো পূরণ করার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত বিধি নিষেধের সীমায় অবস্থান করে চেষ্টা করতে এবং এভাবে প্রকৃত বান্দা হয়ে জীবন যাপন করতে পারে অথবা নিজের প্রবৃত্তির দাসত্ব কবুল করে ওসব প্রয়োজন পূরণ করার ব্যাপারে শয়তানের দেখানো পথ ধরেও চলতে পারে।

এমন মানুষকে শয়তানের ফাঁদ থেকে হেফাযত করে রেখে প্রবৃত্তির লাগামহীন দাবী পূরণ করে যাবার ধ্বংসাত্মক পন্থা হতে একমাত্র ঈমানের শক্তিই মানুষকে ফিরিয়ে রাখতে পারে। আর দীন ইসলামের বুনিয়াদী আকীদাগুলোর (তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত) প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস গড়ে না উঠা পর্যন্ত ঈমানী শক্তি হাসিল করা যায় না। সর্বত্র আল্লাহর শক্তি ও নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান থাকা এবং তার শাস্তি ও পুরস্কার দানের প্রশ্নের প্রতি বিশ্বাস এবং শরীআতের বিধি নিষেধ সংক্রান্ত জ্ঞান উপরোল্লিখিত আকীদাগুলোর ভিত্তিতেই জন্মাতে পারে।

নামাযের যে দোয়াগুলোর ভাবার্থ এর পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলোর প্রতি আবারো একবার নজর করে দেখুন তো। দেখতে পাবেন আবেদনপূর্ণ এ দোয়াগুলো (দরখাস্তগুলো) ইসলামী জীবন বিধানের বুনিয়াদী আকীদাগুলোকে দৈনিক পাঁচবার করে নবজীবন দান করে থাকে। তাওহীদের আকীদা হচ্ছে ওইসব বুনিয়াদী আকীদার প্রাণকেন্দ্র, এ জন্যই নামাযের সকল দোয়ায় তাওহীদ সংক্রান্ত আকীদার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। আযান, ইকামাত এবং তাশাহুদের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ স.-এর রিসালাতের স্বীকৃতি রয়েছে। আর সূরা ফাতেহায় কেয়ামতের প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথে এ মহাসত্যকে স্বীকার করার ব্যবস্থা রয়েছে যে, সেই ভীষণ দিনে সাজা বা জাযা (শাস্তি বা পুরস্কার) দানের নিরংকুশ ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই থাকবে। নামাযে কুরআন মজীদের অন্য যেসব সূরা পাঠ করা হয় সেগুলোতেও অন্যান্য বিধি নিষেধের সাথে সাথে এসব

www.pathagar.com

আকীদা মযবুত করার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য দোয়ার মাধ্যমেও আল্লাহ রব্বুল আলামীনের বশ্যতা স্বীকার ও আনুগত্য করার ওয়াদা করা হয়। সূরা ফাতেহায় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং আল্লাহ ছাড়া অপর কারো সাহায্য চাইবে না বলে শপথ করা হয়। তাশাহুদে মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক সকল প্রকারের ইবাদাত একমাত্র আল্লাহরই জন্য নির্দিষ্ট করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়। নামাযের মধ্যেই শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়। আর সূরা ফাতেহাতে সহজ ও সরল পথে পরিচালনা করার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নিকট আবেদন জানানো হয়। আর সরল পথের সন্ধান লাভই মানব জীবনের পরম নেয়ামত।

দিনে পাঁচবারের নামায ছাড়া রাতের নীরবতায় বেতরের দোয়া কুনুতে যে ওয়াদা এবং যেসব আবেদন-নিবেদন পেশ করা হয় তাও একবার দেখে নিন। দোয়া কুনুতে যা বলা হয় তা হলো।

"হে আল্লাহ! (দুনিয়ার সকল শক্তি থেকে মুক্ত হয়ে।) আমাদের যাবতীয় দুর্বলতা ও দোষ ত্রুটির জন্য একমাত্র তোমারই সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমি ক্ষমা করার মত শক্তির অধিকারী। তোমার উপর অকুণ্ঠ ভরসা রেখেই আমি দুনিয়ার জীবনের সকল চেষ্টা তদবীর করে থাকি। তুমি সকল উত্তম গুণাবলীর মালিক এবং আমরা তোমার প্রদত্ত নেয়ামতগুলোর জন্য কৃতজ্ঞ। কখনো আমি অকৃতজ্ঞ নই। যারা অকৃতজ্ঞ হয়ে তোমার হুকুম লংঘন করে, আমি তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবো এবং তাকে পরিত্যাগ করবো। হে আল্লাহ তোমারই আদেশ পালন করি। তোমারই উদ্দেশ্যে নামায আদায় করি এবং তোমাকেই সিজদা করি। আমাদের সকল চেষ্টা তদবীর ও সকল শ্রম তোমারই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে থাকি। আমরা তোমারই রহমত প্রার্থী এবং তোমারই শাস্তিকে ভয় করে থাকি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, তোমার অবাধ্যাচরণের ফল অত্যন্ত মন্দ হতে বাধ্য এবং নাফরমানদের প্রতি তোমার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী।"

উপরে দোয়া কুনুতের যে তরজমা দেয়া হলো তা পাঠ করলে বুঝা যায় যে, নামাযের মধ্যে যেসব ওয়াদা ও ঘোষণা করা হয় এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে যেসব আবেদন-নিবেদন করা হয় তার অর্থ সঠিক রূপে বুঝে নিয়ে যদি কেউ আন্তরিকতার সাথে নামায আদায় করে এবং নামাযের পর মসজিদের বাইরে এসেও সকল কাজকর্মে যদি ওইসব

www.pathagar.com

ওয়াদা শপথ ও আবেদন নিবেদন স্মরণ রাখে তাহলে অবশ্যম্ভাবী রূপে ঈমানের শক্তি হাসিল হয়। এ শক্তি হাসিল হলে মানুষ প্রবৃত্তির অযৌক্তিক দাবীগুলো বাতিল করে দিতে পারে এবং এভাবে সকল অশ্লীল ও অকল্যাণকর কাজ থেকে আত্মরক্ষা করে জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়।

মূলত এ উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জাতির জন্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করে দিয়েছেন। আর এজন্যই তিনি তার পাক কালামে বলে দিয়েছেন ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ـ

"নিশ্চয়ই নামায সকল প্রকার অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।"–সূরা আনকাবুত ঃ ৪৫

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের এ ঘোষণা মিথ্যা হতে পারে না। কিন্তু সন্ধানী মন তা সত্ত্বেও অবশ্যই বলবে কৈ সমাজের বহু লোককেই তো দেখি নামায পড়ে অথচ সমাজে তারা যেসব ন্যক্কারজনক অপকর্ম করে থাকে তা দেখে তো মনে হয় না নামায সত্যি সত্যিই মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে ? পাকিস্তান আমলে লাহোর থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক তাসনীম' পত্রিকায় উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নামায কি কি উপায়ে অশ্লীল ও অকল্যাণকর কাজ থেকে বিরত রাখে তার যে বর্ণনা প্রদান করা হয়েছিল তার প্রতিবাদে এরূপই প্রশ্ন সম্বলিত দু'টি চিঠি উক্ত পত্রিকার সম্পাদকের নিকট প্রেরিত হয়। এর একটি প্রশ্ন করেছিল কলেজের একজন ছাত্র অপরটি জনৈক ভদ্রলোক। ছাত্রটি পত্রে লিখেছিল ঃ

"নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে তো অবগত হয়েছি কিন্তু অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত মনের উপর প্রভাব বিস্তার করার মত উত্তেজনা ও উন্মাদনা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। আর যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য নামায ফরয করা হয়েছে সে উদ্দেশ্যও আমার নামাযের দ্বারা পূর্ণ হচ্ছে না।"

–সমাজ সংস্কারে নামাযের ভূমিকা, পৃঃ ১৭ ভাওয়াল খান নাগরা।

ভদ্রলোকটি পত্রে লিখেছিল—

"কিছু সংখ্যক শিক্ষিত শ্রেণীর বে-নামাযী ব্যক্তিকে দুই-তিনবার নামাযের কায়দা ব্যাখ্যা করে নামায পড়ার জন্য তাগিদ করার ফলে তাঁরা বলেন 'নামাযি মুসলমান তো অহংকারী হয়ে থাকে এবং তারা মসজিদে অন্যদের পায়জামার দৈর্ঘ ও প্রস্রাব-পায়খানার পদ্ধতি সম্পর্কে বাদ প্রদিবাদ করতে থাকে।' তারা আরো বলেন "অধিক সংখ্যক বে-নামাযী এবং কিছুসংখ্যক অমুসলিমও সচ্চরিত্র, ভদ্র এবং নেক স্বভাবের

www.pathagar.com

হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে নামাযীর মধ্যেই কেউ কেউ চরিত্রহীন ও বিবিধ অপরাধে লিপ্ত হয়ে থাকে। নামায এদেরকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে না।"

উপরের প্রশ্নগুলোতে যে সত্য ও তথ্যবহুল মনোভাবের পরিচয় ফুটে উঠেছে তা সত্যই প্রশংসনীয়।

এমন নামাযীর অবস্থা পরস্পর থেকে বিভিন্নই হয়ে থাকে। কাজেই এদের অবস্থা পূর্ণভাবে জেনে নিয়েই কোনো পরামর্শ দেয়া সম্ভব। অবশ্য একটি মৌলিক বিষয় তাদের জানা উচিত। তা হচ্ছে এই যে, ইসলাম একটি পূর্নাংগ জীবন বিধান এবং যে পর্যন্ত কোনো দেশে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা পূর্ণরূপে কায়েম না হয় সে পর্যন্ত ইসলামের কোনো ইবাদাত থেকে পূর্ণ ফায়দা হাসিল করা সম্ভব হয় না। কেননা জীবনের সকল কাজে প্রতিটি পদে কুফরের সাথে সংঘর্ষ বাধে। কিন্তু এর অর্থ এও নয় যে, কুফরী সমাজ ব্যবস্থা বা বিকৃত পরিবেশে ইবাদাত পরিত্যাগ করতে হবে। পরন্তু এসব অবস্থায়ও রীতিমত ধৈর্য এবং দৃঢ়তার সাথে ইবাদাতে স্থির থাকা জরুরী।

ইসলামী আন্দোলনের মক্কী অধ্যায়ে মুসলমানদের জীবন দুর্বিসহ ছিল কিন্তু সে সময়ও তারা সমাজের দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ করেনি।

উল্লেখিত আপত্তি উত্থাপনকারীদের মধ্যে দ্বিতীয় ধরনের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাঁদের সন্দেহ দূর করার ব্যাপারে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট বলে মনে হয় না। তারা তো নামাযের প্রতি আহ্বানকারীদের নিরুত্তর করে দিয়ে নামায এড়িয়ে চলার পথ অবলম্বন করে থাকে। এ ধরনের লোকদের সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়ার চেয়ে উত্তম পন্থা হচ্ছে তাদেরকে বলা, 'আপনারা মুসলমান'। রসূলুল্লাহ স.-এর রিসালাতের প্রতিও আপনাদের ঈমান আছে। কুরআন মজীদে বিস্তৃত আলোচনার সাথে সাথে নামায কায়েম করার হুকুম প্রদান করা হয়েছে। একজন মুসলমান হিসেবে আপনার কর্তব্য হচ্ছে প্রথমে বিনা দ্বিধায় হুকুম পালন করা এবং তৎপরে নামাযের দর্শন বুঝতে চেষ্টা করা। অথবা কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহরঃ স্বীকৃতি সম্পর্কে আপনার পুনরায় চিন্তা করে দেখা উচিত। যদি এ ধরনের স্বীকৃতির গুরুত্ব ও অন্তর্নিহিত তত্ত্ব আপনার বোধগম্য না হয় তাহলে একটু সাহস সঞ্চয় করে ঘোষণা করে দেয়া উচিত যে, আপনি আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ঈমান সম্পন্ন নন। আপনি যদি এরূপ করেন তাহলে

www.pathagar.com

প্রথমে আপনাকে আল্লাহর একমাত্র সার্বভৌম প্রভুত্ব ও হযরত মুহাম্মদ স.-এর রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপন করানোর জন্য চেষ্টা করা যেতে পারে। কেননা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ঈমান আনার গুরুত্ব ও প্রয়োজন উপলব্ধি না করতে পারলে নামাযের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝা যেতে পারে না এবং এ কাজ থেকে কোনো ফায়দা হাসিল করাও সম্ভব হয় না।

এসব আপত্তি উত্থাপিত হবার এটাও একটা কারণ যে, সাধারণ নামাযীর এবং বহু মসজিদের ইমামগণই নামাযের তাৎপর্য এবং এ সম্পর্কিত সকল মাসায়েল অবগত নন এবং তারা ইসলাম প্রচারের কৌশল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এজন্য নামাযের বাহ্যিক আইন কানুন ঠিক ভাবে মেনে চলা সত্ত্বেও তারা নামাযের প্রাণ-স্পন্দন থেকে বঞ্চিত থাকে। প্রতিবাদকারীগণ নামাযীদের যেসব ত্রুটি নির্দেশ করেছেন সেগুলো কোনো মতেই অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, গোলামীর যুগ (বৃটিশ আমল) থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত দীনি শিক্ষা তথা পুরো শিক্ষা ব্যবস্থা কোনো সুচিন্তিত পরিকল্পনা মত চলছে না। মসজিদের ইমামদের অনেকেই ইসলাম সম্পর্কেও ভালোভাবে অবগত নন—কুরআন মজীদকে জানা এবং বুঝা তো অনেক বড় কথা। এদের মধ্যে কিছু তো এমনও আছেন যারা নামাযের কায়দা-কানুন সম্পর্কেও অজ্ঞ। এদের বিপুল সংখ্যক লোক নামাযের শর্তাদি, নামাযের আরকান, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব এবং আদব সম্পর্কে কোনো জ্ঞান রাখেন না। এরা যা কিছু জানেন তার মধ্যে ফরয, ওয়াজিব মুস্তাহাবের কোনো পার্থক্য নেই। মসজিদের মধ্যে যদি কোনো বিষয়ে খোলাখুলি প্রতিবাদ করার মতই থাকে তবে তা হচ্ছে ওইসব নামায যেগুলো আরকান ও শর্তাদি পূর্ণ না করেই আদায় করা হয়। কারণ এসব ছেড়ে দিয়ে নামায তো কখনো হতে পারেই না। নবী করীম স. যাদেরকে মসজিদে দু তিনবার করে নামায আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন তারা সঠিকভাবে নামাযের শর্তাদি পালন করতো না।

তাহরীমা বাধার সময় হাত নাভির উপর থাকবে, না কি বুকে, আমীন নিম্নস্বরে বলতে হবে না কি উচ্চস্বরে, রাফেইয়াদাইন করতে হবে কি না, মাথায় পাগড়ী বেঁধে অথবা শূন্য মাথায় নামায পড়তে হবে, পেশাব-পায়খানার কায়দা-কানুন ইত্যাদি নামাযের আরকানের মধ্যে শামিল নয়। এসব বিষয়ে নামাযীদেরকে এমনভাবে হেদায়াত করা উচিত যেন তারা এর মধ্যে কোনো প্রকার তিক্ত মনোভাবের সন্ধান না পায়। ইসলাম প্রচারের কৌশল এরূপই। সত্য কথা হচ্ছে এই যে, অনেক মুসল্লি এমন কি মসজিদের ইমাম পর্যন্ত নিতান্ত অবিজ্ঞজনোচিত পন্থায় ইসলাম প্রচার

www.pathagar.com

তৎপরতা শুরু করে দেয়। ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উপকারের চেয়ে অপকারই হয়ে থাকে।

যদি এ ধরনের নামাযী তার স্বল্পজ্ঞান ও তাবলীগি কৌশলের অজ্ঞতার দরুন ওইসব আপত্তি ও বিবিধ প্রশ্ন তোলার কাজে অভ্যস্ত হয় তাহলে এসব বিষয় থেকে পালিয়ে বেড়াবার উদ্দেশ্যে মসজিদে যাতায়াত বন্ধ করে দেয়াতো বিজ্ঞদের কাজ নয়। বিজ্ঞগণ তো সর্বদাই নিজের দোষ-ত্রুটি স্বীকার করে নিয়ে তা সংশোধন করার জন্য সচেষ্ট হয়। অন্যথায় পূর্ণ শুভেচ্ছা জ্ঞাপক সুরে আপত্তিকারীকে বুঝিয়ে দেয়া উচিত যে, তার আপত্তিগুলো ভিত্তিহীন। বিষয়টি সম্পর্কে নবী করীম স. হতে অন্য প্রকার আমল বা নির্দেশেরও যে সন্ধান পাওয়া যায় তা তাকে বুঝিয়ে দিলেই চলে।

বাকী থাকলো কোনো কোনো নামাযীর চরিত্রে সততার অভাব, অন্যান্য দোষ থাকা এবং কোনো বে-নামাযীর ও অমুসলিম ব্যক্তির চরিত্রে সততা ও বিভিন্ন গুণের অস্তিত্ব থাকার প্রশ্ন। এ প্রশ্নটির সঠিক উত্তর পেতে হলে নামাযীদের শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার।

১. নামাযীদের এক শ্রেণী শুধু পেটের খাতিরেই নামায পড়ে এবং পেটের খাতিরে ইমামতিও করে থাকে। ইমামতি করে যদি এরা আশানুরূপ অর্থাগম করতে সক্ষম না হয় তাহলে এসব লোক শুধু যে ইমামতিই ছেড়ে দেয় তাই নয়, নামায পর্যন্তও ত্যাগ করে থাকে। আমার বাড়ীর পাশেই একটি ধার্মিক পরিবারে এটার প্রমাণ আমি দেখেছি।

২. নামাযীদের দ্বিতীয় শ্রেণী দীনদার শ্রেণীর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে দুনিয়াবী ফায়দা হাসিল করার জন্য নামায পড়ে এবং বে-দীনদারদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাদের মহলে অবস্থান কালে নামায ছেড়েও দেয়। এ ধরনের ভণ্ডামীর নামায আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সন্তুষ্ট করার জন্য পড়া হয় না। বরং নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পড়া হয়ে থাকে।

৩. নামাযীদের তৃতীয় বৃহত্তম শ্রেণী তাদের অজ্ঞতার দরুন নামাযের বাহ্যিক অনুষ্ঠানকেই মূল লক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে মানব জীবনকে কলুষমুক্ত করার জন্য নামায একটি উপলক্ষ মাত্র। এ শ্রেণীর লোকেরা মসজিদের মধ্যে অবস্থান কালে তুলাদণ্ডে মাপ জোক করে নামাযের প্রতিটি অনুষ্ঠান পালন করে থাকে কিন্তু নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে যেসব ওয়াদা ও অংগীকার করে এবং তাঁর সমীপে পুনঃ পুনঃ যেসব প্রার্থনা করে, মসজিদের বাইরে এসে

www.pathagar.com

সেগুলোর সম্পূর্ণ বিপরীত কার্যাদি করে থাকে, সেটা ইচ্ছায়ই হোক বা অনিচ্ছাই হোক।

৪. নামাযীদের চতুর্থ শ্রেণী দীন সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী এবং নামাযের দর্শন সম্পর্কেও জ্ঞানী এবং তারা ঐ কথাও জানে যে, তাদের মসজিদের বাইরের জীবন নামাযের মধ্যে কৃত অংগীকার ও ওয়াদা সমূহের সাথে সামঞ্জস্যশীল হওয়া দরকার। তারা একথাও অবগত আছে যে, প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার অধীনে জীবন যাপন করে অনেক সময় তারা 'মুনকার' (খারাপ) কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়। ব্যবসায়িক ইনকাম ট্যাক্স অফিসারের অসীম ক্ষমতার খপ্পর থেকে বাঁচার জন্য দুই ধরনের হিসেব লিখতে হয় অথবা হেরফের করে ঘুষ প্রদান করতে হয়। চাকুরে ব্যক্তির বেতন প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হলে তাকে ঘুষের মাধ্যমে ঘাটতি পূরণ করতে হয়। একই ব্যাংকের অফিসার ঘুষ খেয়ে গাড়ী-বাড়ী টেলিভিশন, ফ্রিজ, কার্পেট এবং বিদেশী আকর্ষণীয় জিনিস পত্রে বাসা সাজিয়ে আলো ঝলমল করে বসবাস করছে অথচ সৎকর্মী আর একজন অফিসার যে বেতন পান তাতে ওইসব তো দূরের কথা ছেলেমেয়েদের নিয়মিত দু' বেলা মাছ ভাতও দিতে পারছেন না এবং সুপ্রিয় স্ত্রীকেও একটা ভালো শাড়ি কাপড় কিনে দিতে পারছেন না। ফলে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই সংসারের শান্তি বিনষ্ট হচ্ছে—সৎ অফিসার বাধ্য হচ্ছেন স্ত্রীর নিকট একটা অপদার্থ ও নিষ্কর্মা হিসেবে প্রমাণিত হতে। অবশেষে সে ঘর ভাঙ্গার ভয়ে বাধ্য হচ্ছে ঘুষের টাকা গ্রহণ করতে থাকে। মুনসেফ, ম্যাজিস্ট্রেট, বিচারক হাজার হাজার টাকা ঘুষ খেয়ে একজন চরম অপরাধী ও হত্যাকারীকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে রায় প্রদান করছে। ফলে সন্তান হারা মা পাগলিনী হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ক্রন্দন করে ফিরছে আর মজলুম শ্রেণী প্রতিশোধের নেশায় পাগল হয়ে নিজ সমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। উকিলদের কথা এখানে বলাই বাহুল্য। ঐশী আইন পরিত্যাগ করে মানবরচিত বৃটিশ আইন প্রয়োগরই এটা ফল।

৫. পঞ্চম শ্রেণীর নামাযী তারা, যারা বাস্তববাদী এমন ধিকৃত সমাজ পরিবেশে বসবাস করেও আল্লাহ যা দিয়েছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন এবং যেসব ওয়াদা করে থাকেন, বাস্তবজীবনে তার প্রতিফলন ঘটান। এরাই প্রকৃত নামাযী।

উপরোক্ত আলোচনায় জানা গেলো যে, প্রথোমক্ত দুই শ্রেণীর লোক মোটেই নামাযীই নয়। তৃতীয় শ্রেণীর নামাযীদের জীবনে ভারসাম্যের

www.pathagar.com

অভাব। তারা অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে কি করে আত্মরক্ষা করবে ? আর এসব পাপে লিপ্ত হওয়া থেকে তাদের নামাযই বা কি করে তাদেরকে ঠেকিয়ে রাখবে ?

চতুর্থ শ্রেণীর নামাযীরা তো নিজেরাই তাদের নামাযে সন্তুষ্ট নয়। এরা দোদুল্যমান অবস্থায় জীবনযাপন করে এবং আশাপোষণ করে যে, অবস্থা অনুকুল হলে তারা এ পাপকাজ থেকে সরে আসবে। তারা সাহসের অধিকারী না হলেও তাদের হৃদয়ে আল্লাহ ভীতির সন্ধান পাওয়া যায়।

এবার হিসেব করে দেখুন আধুনিক কালে লোকসংখ্যার অনুপাতে অতিকষ্টে শতকরা পাঁচজন নামাযীকে প্রকৃত নামাযী হিসেবে ধরা যেতে পারে কি না। আর এ শতকরা পাঁচজন নামাযীর মধ্যে কয়জন অশ্লীল ও অন্যায় কাজে লিপ্ত হয় ? যদি আল্লাহ না চান মানবীয় দুর্বলতার চাপে কখনো কোথাও এক আধটি নজীর পাওয়াও যায় তবে তদ্বারা নামাযের সুফল সম্পর্কিত কুরআনী ঘোষণার সত্যতারই প্রমাণ পাওয়া যাবে—মিথ্যার নয়। ইংরেজীতে প্রবাদ আছে—

"Exception proves the rule"
"ব্যতিক্রমই নিয়মের (সত্যতা) প্রমাণ করে।"

উপরের আলোচনা হতে এটাও প্রমাণ হয়ে গেছে যে, নামায কার কবুল হলো বা কার হলো না—এটা নিজেই জানা যায়। কারোর কাছেই জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হয় না। কারণ যেহেতু পাক কুরআনের উদ্ধৃতি মোতাবেক নামায মানুষকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে সেহেতু কোনো নামাযীর নামায যদি ঐ অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে তাকে বিরত রাখতে পারে তবে বুঝতে হবে তার নামায আল্লাহর দরবারে কবুল হবার যোগ্য হয়েছে এবং কোনো নামাযীকে যদি তার নামায অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখতে না পারে তবে অবশ্যই বুঝবে তার নামায আল্লাহর দরবারে কবুল হচ্ছে না।

www.pathagar.com

২৯. মসজিদ ও ইমাম ঃ এ যুগে ও সে যুগে

মসজিদ এ যুগে শুধুমাত্র ইবাদাতখানা—নামায আদায়ের পবিত্র স্থান এবং ইমাম সেই নামাযের জামায়াতের ভারবাহী সমাজের একটি সব থেকে অবহেলিত প্রাণী মাত্র। তাঁর উপর দায়িত্ব বড় গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ক্ষমতা বলতে কিছুই নেই। তাঁকে দূর থেকে আধুনিক মুসলমানরা হুজুর বলে সালাম জানালেও তাঁর আদেশ নিষেধ কেউ মানে না। এক কথায় যে সমাজের তিনি নেতৃত্ব দেন সে সমাজের উপর তাঁর কোনোই কমাণ্ড নেই। বরং তিনি মুসলিম সমাজের নিকট বড়ই করুণার পাত্র। শহরাঞ্চলের ইমামদের দুই একজনের ভুড়ি মিলাদ শরীফ পড়িয়ে বাড়ী বাড়ী দাওয়াত খেয়ে ফুলার কারণে স্বাস্থ্য ভালো মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি স্বাস্থ্যবান নন। সুদ খোর ঘুষখোর কালোবাজারী ইত্যাদি লোকদের বাড়ীতে খানা পিনা এবং অর্থকড়ি ভক্ষণ করতে করতে প্রকৃত ইসলামী জীবনী শক্তি তাঁদের রহিত হয়ে গেছে। গ্রামের ইমাম সাহেবদের অবস্থা আরো ভয়াবহ ও করুণ যেহেতু কোনো রকমে টেনেটুনে আরবী পড়া শিখেই তারা গ্রামের মসজিদে ইমামতি করে থাকেন সেহেতু তাদের আয় উপার্জনের উৎস ঐ ইমামতিই। কিন্তু গ্রামের জনসাধারণ যেহেতু খুব কম সংখ্যকই কাঁচা পয়সার মুখ দেখে থাকে সেহেতু ইমামের বেতন হিসেবে মাসিক একটা নিম্নমানের চাঁদা দিতেই তারা গড়িমশি করে। আর যারা অর্থশালী ধনী লোক তারা ওসব নামায-কালাম পড়া একটা সভ্য উন্নত যুগের কাজ বলে মনে করে না বরং আজকের এ রকেট মিজাইলের যুগে সেকেলে মূল্যবান সময় নষ্টের একটি আপদ মাত্র বলেই বিবেচনা করে। আর যারা বস্তুতন্ত্রে বিশ্বাসী বলে অহংকারে পথ মাড়ায় তারা নামায পড়ার কথা শুনলে হেসেই উড়িয়ে দেয় অথবা মনের সব থেকে কুৎসিৎ অভিব্যক্তি প্রকাশ করে থাকে। ফলে এ যুগে মসজিদ ও তার ইমামের কি করুণ দশা হতে পারে তা সহজে অনুমেয়।

কিন্তু অতীতে এরকম ছিল না। সে যুগে সম্পূর্ণ এর বিপরীতই ছিল মসজিদ ও ইমামের অবস্থান। মসজিদের গুরুত্ব ইসলামে এতই বেশি যে, হযরত নবী করীম স. মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনাতে পৌঁছেই প্রথমে মসজিদে কোবা ও মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা করেন। আর হযরত আদম আ. পৃথিবীতে এসেই যে মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা হলো বিশ্ব মুসলিমের মহামিলন কেন্দ্র 'কা'বা শরীফ'। এজন্য যে মুসলিম উম্মার জাতীয়

www.pathagar.com

ঐক্য সংহতি এবং সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গলের একমাত্র স্থান হলো আল্লাহর ঘর এ মসজিদ। মূলত মসজিদ ও ইদগাহ বিশ্ব মুসলিমের মহাসম্মেলন কেন্দ্র। কেননা এ দুটি মহামিলন কেন্দ্রের মাধ্যমেই বিশ্বমুসলিমের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ, শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাস গড়ে ওঠে। এ যুগে মসজিদ বিরাট বিরাট অট্টালিকায় পরিণত হলেও তুলনামূলকভাবে প্রাণহীন। এগুলো ঠিক নবী যুগের ও খোলাফায়ে রাশেদার আমলের মসজিদের ন্যায় প্রাণবন্ত ও জাগতিক এবং পারমার্থিক কর্মকাণ্ডের প্রধান মিলন কেন্দ্র নয়। 'মসজিদে নববী' কেবলমাত্র ইবাদাত-খানাই ছিল না বরং এটা ছিল সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইসলামী হুকুমতের দুর্ভেদ্য কেন্দ্র স্বরূপ। কেননা, দীন ও দুনিয়ার কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য যাবতীয় ফরমান (Ordinance) এখান থেকেই জারী করা হত। যুদ্ধের ময়দানের কলা-কৌশলের শিক্ষা এখানেই দেয়া হতো এবং এখান থেকে যুদ্ধযাত্রা হতো। বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধানদের রাষ্ট্রদূতগণ মহানবী স.-এর সাথে এখানেই সাক্ষাত করে তাঁদের পরিচয় পত্র পেশ করতেন। এখানেই সরদারে দোজাহানের দরবার অনুষ্ঠিত হতো এবং সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীদেরকে এখানেই আবদ্ধ করে রাখা হতো। এছাড়া মসজিদে নববী ছিল গোটা মুসলিম বিশ্বের সর্বপ্রথম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম যুগের ছাত্র ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা., হযরত ওমর রা., হযরত ওসমান রা., হযরত আলী রা., হযরত তালহা রা., হযরত যুবায়ের রা. প্রমুখ মক্কার সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশীয় লোক। হযরত আবু জার গিফারী রা., হযরত আনাস রা. প্রমুখ ছাত্র ছিলেন মক্কার বাইরের তাহামা এলাকার গাফ্ফার গোত্রের লোক। হযরত আবু হুরায়রা রা. ও হযরত তোফায়েল ইবনে আমর রা. ছিলেন ইয়েমেনের দুটো গোত্রের লোক। হযরত আবু মূসা আশআরী রা. ও মু'আয ইবনে জাবাল রা.-ও ছিলেন ইয়েমেন দেশের অন্য গোত্রের লোক। জিয়াদ ইবনে সা'লাবা রা. ছিলেন ইজদু-গোত্রের লোক। হযরত খাব্বাব ইবনে আরৃত রা. ছিলেন তামীম গোত্রের লোক। হযরত মুনকাজ ইবনে জাম রা. ও মানজার ইবনে আসাদ রা. ছিলেন বাহরাইনের আবদুল কায়েস গোত্রের লোক। হযরত উবায়েদ রা. ছিলেন আম্মানের গোত্র অধিপতি এবং হযরত জাফরও ছিলেন আম্মানের অধিবাসী। হযরত ফারদা রা. ছিলেন সিরিয়ার অধিবাসী। হযরত সোহায়েব রা. ছিলেন রোম সাম্রাজ্যের মূল ভূখণ্ডের লোক। হযরত সালমান ফারসী রা. ফিরোজ দায়লামী রা., হযরত সাইখাত রা. তাঁরা সকলেই ছিলেন ইরানের (পারস্য সাম্রাজ্যের) বাসিন্দা। এরা প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন সত্য সৈনিক নামকরা

www.pathagar.com

জেনারেল, গবেষক, রাজনীতিবিদ, ইসলামী অর্থনীতিবিদ, আইন বেত্তা, প্রখ্যাত প্রশাসক, কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, ইতিহাসবেত্তা, ভূগোলবিদ, মুফাস্‌সির, ফকিহ্‌, হাদীস শাস্ত্র বিশারদ এবং সমসাময়িক সামরিক বিদ্যায় চরম পারদর্শী। যদ্দরুন আজকের আমেরিকা ও রাশিয়ার ন্যায় তৎকালীন বিশ্বের বৃহৎ দুই পরাশক্তি পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের গর্বিত সুশিক্ষিত জেনারেলগণ তাঁদের যুদ্ধ কৌশলের নিকট শোচনীয় ভাবে পরাজয় বরণ করেছিলেন।

বস্তুত রসূলুল্লাহ স.-এর এই বিশ্ববিদ্যালয় তথা মসজিদে নববী ছিল সার্বজনীন শিক্ষায়তনের এক অত্যুজ্জ্বল আধার। এখানে প্রবেশের জন্য বর্ণ-আকৃতি, দেশ-রাষ্ট্র, জাতি-বংশ, সাদা-কালো এবং ভাষা উচ্চারণ ভঙ্গিমার কোনো প্রশ্নই ছিলো না। বরং এ মসজিদে নববী দুনিয়ার সকল জাতি, সকল বংশ, সকল দেশ ও সকল ভাষা ভাষীর জন্য চির উন্মুক্ত ছিলো। যে কেউই এখানে প্রবেশ করে জ্ঞানের অমৃত ধারায় স্বতস্ফূর্তভাবে স্নাত হতে পারতো।

মূলত মসজিদে নববী ছিল একটি ব্যাপক ও সার্বজনীন বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে রুচি, প্রকৃতি সামর্থ ও যোগ্যতা অনুসারে প্রত্যেক দেশের অধিবাসী ও প্রত্যেক জাতির ব্যক্তিবর্গ শিক্ষালাভ করতো। এখানে যেমন একদিকে আছেন আবিসিনিয়ার নাজ্জাসী বাদশা-আসহামা রা., মায়ানের প্রধান ফারদা রা., হামীমের প্রধান জুলকেলা রা., হামাদান গোত্রের প্রধান আমির ইবনে শাহর রা., ইয়েমেনের প্রধান ফিরোজ দায়লামী রা. ও মারকাবুদ রা. আন্দোনের প্রধান উবাইদ রা. ও জাফর এবং অন্যদিকে হযরত বিলাল রা., হযরত ইয়াসির রা., হযরত সোহায়েব রা. হযরত খাব্বাব রা. হযরত আম্মার রা. ও হযরত আবু ফকীহা রা.-এর ন্যায় ক্রীতদাস (Slave) এবং হযরত সুমাইয়া রা., হযরত লেবিয়া রা., হযরত জীমা রা., হযরত নাহদীয়া রা. ও হযরত উম্মে উবাইস রা. এর ন্যায় বহু মহিলা। এখানে লক্ষণীয় যে, মসজিদে নববীর এ শিক্ষায়তনে আমির-ফকির, বাদশাহ-গরীব, সাদা-কালো, প্রভু-ভৃত্য সকলে একই কাতারে বিদ্যমান। এখানে ভেদাভেদের সমস্ত উৎস বিলীন হয়ে মহাঐক্যের দৃঢ় বন্ধনে সকলে একত্রিত হয়েছিল। যদ্দরুন ঈমানী তেজে বলিয়ান এবং হাদীস ও কুরআনের জ্ঞানের পিযুস ধারায় সিক্ত মসজিদ নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের এ সকল ছাত্রদের দ্বারা নবী করীম স. তৎকালীন বিশ্বের চরম প্রতাপশালী সম্রাট ও রাষ্ট্রনায়কদের নিকট ইসলাম গ্রহণের নিমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র পাঠিয়ে বিশ্বব্যাপী একটা শিহরণ জাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি

www.pathagar.com

হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তির পরপরই হযরত দাহিয়া কালবী রা.-কে পাঠিয়েছিলেন রোমের মহা পরাক্রমশালী সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুজাফা সাহমী রা.-কে পাঠিয়েছিলেন তৎকালীন বিশ্বের মহাত্রাস ও প্রতাপশালী পারস্য শাহানশাহ খসরু পারভেজের দরবারে। হযরত হাতিব ইবনে আবী বালতায়া রা.-কে পাঠিয়েছিলেন মিসরের রাষ্ট্রপ্রধান মুকাওকাসের দরবারে। আমর বিন উমাইয়া রা.-কে পাঠিয়েছিলেন আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর দরবারে। সুজা বিন দাহাবুল আসাদী রা.-কে পাঠিয়েছিলেন সিরিয়ার শাসনকর্তা হাবিস গাস্সানীর দরবারে এবং সালিত বিন আমর রা. প্রেরিত হয়েছিলেন ইয়ামামার বিভিন্ন গোত্র প্রধানদের নিকট। বলাবাহুল্য খেজুর পাতার ছাউনি আর কাঁচা ইটের গাঁথুনীর এ অতিসাধারণভাবে তৈরি মসজিদে নববীতে বসেই নবী করীম স. উপরোক্ত জান কবুল বীর সৈনিকদের পাঠিয়েছিলেন যাঁদের খুব কমই জীবিত অবস্থায় ফিরে আসতে পেরেছিলেন বরং অধিকাংশই অত্যাচারী বেঈমান ঐ সকল (আল্লাহদ্রোহী) রাষ্ট্রনায়কদের দ্বারা নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ইসলামের বিজয় অভিযানের এটাই সূচনা।

নবী করীম স. আর স্থির থাকতে পারলেন না তিনি ঈমানী তেজে বলীয়ান হয়ে মসজিদে নববীর কতিপয় বীরবিক্রম সামরিকবিদ্যায় পারদর্শী ছাত্রকে পাঠালেন ঐ সকল প্রতাপশালী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন সর্বকালের সর্বযুগের চিরস্মরণীয় সমর-বিশারদ হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা., হযরত আবু উবাইদা রা., হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. এবং হযরত আমর বিন আস রা. তাঁরা তাঁদের রণকৌশল ও সমর অভিজ্ঞতার দ্বারা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে যালিম, পাপাসক্ত ও মানবতার শত্রু পূর্ব ও পশ্চিমের দুটি পরাশক্তি পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। তাঁদের সেই বিজয় কাহিনী আজো মানুষকে বিস্ময়াভিভূত করে থাকে। হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ইরাক ও ইরানের রাজমুকুট ছিনিয়ে এনে ইসলামের পদতলে নিক্ষেপ করেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ ও হযরত আবু উবায়দা রোমীয়দেরকে সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন হতে বিতাড়িত করে হযরত ইবরাহীম আ. প্রতিশ্রুত ভূ-খণ্ডের আমানত মুসলামনদের হাতে তুলে দেন। হযরত আমর বিন আস ফিরাউনের দেশ নীলনদের অববাহিকা মিসরকে রোমক সাম্রাজ্যের হাত হতে বলপূর্বক ছিনিয়ে নেন। ইসলামের এ সকল বিশ্ববিশ্রুত বিজয় বাহিনীর সকলেই ছিলেন মসিজদে নববীর সফল ছাত্র। তাঁদের যোগ্যতা ও দূরদর্শিতা কেবল ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বীকৃতি লাভই

www.pathagar.com

করেনি। বরং সর্বকাল ও সর্বযুগের ইতিহাসে তাঁদের বীরত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব চির অম্লান ও ভাস্বর হয়ে থাকবে।

মসজিদে নববীর অন্যান্য কৃতিছাত্রের ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তাঁরা শিক্ষাগুরু হযরত মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ স. হতে যে মহান শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন তার ফলে তাঁরা অত্যন্ত কৃতিত্ব ও সফলভাবে বিজিত বিভিন্ন শহর ও প্রদেশ শাসন করে শুধু মানব জীবনই নয় বরং গোটা সৃষ্টি জীবকুলের জীবন শান্তি-শৃংখলা ও সুখ-শান্তিতে ভরপুর করে দেন। তাদের নিষ্কলুষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সততা, আল্লাহভীতি, দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা এবং কর্ম দক্ষতাই ছিল এর মূল কারণ। মসজিদে নববীর এ ধরনের ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হযরত বাযান ইবনে সাসান রা. ইয়েমেনের, হযরত খালিদ বিন সাঈদ রা., সানজারের হযরত মুহাজির বিন উমাই রা. কান্দারের, হযরত জিয়াদ বিন লোবীদ রা. হাযরা মাউতের, হযরত আমীর বিন হাজম রা. নাজরানের, হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান রা. তাইমারের এবং হযরত আলা ইবনে হাযরামী রা. বাহরাইনের শাসনকর্তা ছিলেন। এছাড়া আরো অসংখ্য সাহাবী যোগ্যতার সাথে সুষ্ঠভাবে তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন ।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ স.-এর মসজিদ নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রদের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তাদের মধ্যে আছেন উলামা ও ফকীহদের দল। এদের মধ্যে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা., হযরত আলী বিন আবু তালিব রা., হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা., হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা., হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনে আল আস রা., হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা., হযরত উম্মে সালামা রা., হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা., হযরত মুআয বিন জাবাল রা., হযরত জায়েদ বিন সাবিত রা. ও হযরত ইবনে যুবাইর রা. প্রমুখ সাহাবী। তাঁরাই ইসলামী ফিকাহ ও আইনশাস্ত্রের রূপকার হিসেবে আজও সারা দুনিয়ার আইন প্রণেতাগণের মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন।

বিশ্বনবী স.-এর মসজিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে হাদীস সংকলন, সংগ্রহ, ইতিহাস রচয়িতাদের নামও স্মরণীয়। তাঁদের মধ্যে হযরত আবু হুরায়রা, আবু মূসা আশআরী রা., আনাস ইবনে মালিক রা., আবু সাঈদ খুদরী রা., উবাদা বিন সামিত রা., জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা., বারাআ ইবনে আযেব রা. প্রমুখ অসংখ্য সাহাবী রসূলুল্লাহর

www.pathagar.com

নিকট থেকে অসংখ্য নির্দেশ ও ঘটনাবলী সংগ্রহ ও বর্ণনা করেন। তাঁরা তাঁদের এ অমূল্য খিদমতের জন্য ইসলামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন এবং থাকবেন।

বস্তুত মানবজীবনের প্রতিটি দিক ও পর্যায়ের প্রতি দৃকপাত করে এভাবে বিস্তারিত আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, মসজিদে নববীর এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সব ধরনের ছাত্র বিশ্বনবী ও বিশ্বগুরু মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট থেকে সবধরনের জ্ঞান আহরণ করতেন। আর এরই ফলে এখান হতে বুদ্ধিজীবি, প্রকৃতির গভীর রহস্য সন্ধয়ী, জ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সামরিক অফিসার, দেশ শাসক ও পরিচালক বৃন্দ বের হতেন। এরা স্ব স্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়ে বিশ্ববিশ্রুত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে আমাদের জন্য ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন। কাজেই এক কথায় বলা যায় সে যুগে মসজিদ ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের পার্লামেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট, সচিবালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, বিচারালয়, কয়েদীখানা ইত্যাদি সর্বকাজের মূল কেন্দ্রভূমি। ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় যাবতীয় কাজের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার সার্বিক সিদ্ধান্ত এ মসজিদ হতেই গৃহিত হতো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক সাহেব তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ "মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব"-এ উল্লেখ করেছেন ঃ "সেখানে কেবল দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং সপ্তাহে একদিন জুমআর নামাযই অনুষ্ঠিত হতো না বরং নবজাত মুসলিম ষ্টেটের সকল প্রকার শাসন, বিচার-শালিস, পঞ্চায়েত, যুদ্ধ ও সন্ধি ইত্যাদি সংক্রান্ত আলোচনা ও পরামর্শ বিদেশে দূত প্রেরণ ও বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের সাথে দেখা-সাক্ষাত, ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কীয় যাবতীয় আলোচনা, উপদেশ ও পরামর্শ এক কথায় জাতিগত, ধর্মগত ও দেশগত সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা, পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এ আড়ম্বরহীন মসজিদেই সম্পাদিত হতো।"–পৃ ঃ ২৭৭

কিন্তু যেদিন থেকে মুসলিম প্রশাসকগণ বিদেশী ও বিজাতিদের অনুকরণে নিজের ভড়ং এ চলা শুরু করলো সেদিন থেকেই তাদের অধঃপতন শুরু হলো। ইতিহাসের একজন ছাত্র হিসেবে যতটুকু আমি জানি তার একটি সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

আজকের বিশ্বে যেমন সর্বত্র ইহুদীরা গইমদের (অইহুদীদের) রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে দিচ্ছে না। সর্বত্র গণ্ডগোল জিইয়ে রেখে নিজেরা ছদ্মবেশে বিবদমান উভয়পক্ষের পাশে দাঁড়িয়ে কোথাও কখনো বন্ধুর অভিনয় করছে আবার কখনো শত্রুর ভূমিকা পালন করে নিজের স্বার্থ লুটে

www.pathagar.com

নিচ্ছে কেমন করে তা বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন লেখকের তথ্যবহুল গ্রন্থ 'ইসরাঈল ও মুসলিম'। সেখানে এর বিস্তারিত ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে প্রদান করা হয়েছে। হযরত উসমানের হত্যাকাণ্ড একটি চিঠির 'নুকতা' পাল্টিয়ে কেমন করে সংঘটিত করেছিল এবং মীমাংসিত "উষ্ট্রের যুদ্ধে" উভয় পক্ষের বাহিনীতে অনুপ্রবেশ করে কোন্ কৌশলে আবার লাগিয়ে দিয়েছিল তা দলিলসহ সেখানে তুলে ধরা হয়েছে। তারা তাদের আজীবন লালিত কূটকৌশল প্রয়োগ করে হযরত ওমর রা.-এর ইন্তেকালের পর পর মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং খোলাফায়ে রাশেদার শান্তিপুরীতে আগুন লাগিয়ে ভস্মিভূত করে দেয়।

খোলাফায়ে রাশেদীনের স্বর্ণযুগের পরপরই মুসলিম রাষ্ট্র পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হয়। হযরত আলী রা.-এর জীবনের শেষ দিকে সিরিয়ার ক্ষমতাশালী গভর্নর হযরত মুআবিয়া রা.-এর মধ্যে এ ইহুদী চক্রই দ্বন্দ্ব বাধিয়ে দিয়ে নেপথ্যে ইসলামী রাষ্ট্রের ধ্বংসের জন্য কাজ করে যেতে থাকে। তারা মুসলিম জেনারেলদের একজনের বিরুদ্ধে আর একজনকে ক্ষেপিয়ে ভাঙ্গনের সৃষ্টি করে। এরই সুদূরপ্রসারী ফল হিসেবে হযরত আলী রা. ও মুআবিয়ার রা. মধ্যে সিফ্ফিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এরপর হযরত আলী রা.-এর ন্যায় কতিপয় মুসলিম জেনারেলকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য গোপন স্কোয়ার্ড পাঠায়। এ স্কোয়ার্ডই হযরত আলী রা.-কে কুফার মসজিদে অতর্কিতে আক্রমন করে হত্যা করে।

হযরত মুআবিয়া রা.-ও তাদের লক্ষবস্তু ছিল। কিন্তু ইহুদী ষড়যন্ত্র পরে আঁচ করতে পারায় আধুনিক মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কদের ন্যায় তাদের সাথে সম্প্রীতি গড়ে তুলে রাজত্ব করতে চেয়েছিলেন। ফলে মুআবিয়া রা. ইহুদী নিয়ন্ত্রিত গুপ্তঘাতকের হাত থেকে প্রাণে বেঁচে গেলেও ইসলামী হুকুমাত তাদের কবল থেকে রক্ষা পেলো না। ইহুদী বুদ্ধিজীবীরা হযরত মুআ'বিয়ার বন্ধু সেজে পর্দার আড়াল থেকে তাঁর যাবতীয় কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে। তাঁকে ফুসলিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের কেন্দ্রভূমি মসজিদে নববী থেকে চিরতরে সরিয়ে রাজধানী দামেস্কে নিয়ে গেল। অবশ্য হযরত আলী রা. ইতিপূর্বে কূটনৈতিক কারণে সাময়িকভাবে রাজধানী মদীনা থেকে কূফায় স্থানান্তর করেছিলেন কিন্তু মদীনার সাথে তাঁর সংযোগ পুরোপুরি বজায় ছিল। কিন্তু আমীর মুআবিয়া রা.-এর পদক্ষেপ ছিল স্বতন্ত্র। এভাবে তারা হযরত মু'আবিয়া রা.-কে হযরত নবী করীম স.-এর বিশিষ্ট সাহাবীগণের মূল্যবান পরামর্শ থেকে বঞ্চিত করে এবং সম্পূর্ণ

www.pathagar.com

নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে প্রভাবিত করে বিপথে পরিচালিত করে। ফলে ইসলামের আদর্শ খিলাফতী ডেমোক্রাসীর স্থলে হযরত মুআবিয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় রাজতন্ত্রের। এরই প্রতিবাদ এবং ইসলামকে রক্ষা করতে গিয়ে নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেন খোলাফায়ে রাশেদীনের অবশিষ্ট দুই নেতা হযরত হাসান ও হযরত হোসাইন। কারবালার প্রান্তর এ ইহুদী কুচক্রিরাই রঞ্জিত করেছিল এক মুসলিম ভাইকে দিয়ে আর এক মুসলিম ভায়ের রক্ত দ্বারা।

হযতর মুআবিয়া রা. রাজধানী স্থানান্তরিত করেই সেখানে তার বন্ধুদের পরামর্শে নতুন নতুন প্রাসাদ ও দূর্গ নির্মাণ করেন। এর পূর্বপর্যন্ত কোনো খলীফা এমনভাবে রাজধানী নির্মাণে সরকারী কোনো মুদ্রা ব্যয় করেননি। কেননা এ সময় পর্যন্ত মসজিদে নববীর পর্ণ কুটিরে বসেই সকল ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় কার্যাদি পরিচালিত হতো। খেজুর গাছের ছায়াতলে বসেই হযরত ওমর ফারুক রা. দোর্দণ্ড প্রতাপে বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্য পরিচালনা করতেন এবং সেখান থেকেই নিপুণভাবে জটিল ও কুটিল রাজনৈতিক নির্দেশ প্রদান করতেন। তেমনি জীর্ণশীর্ণ কুটির ছিল চরম প্রভাবশালী শাসক সম্রাট খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর ফারুক রা.-এর বাসগৃহ। এমনিভাবে হযরত উসমান এবং হযরত আলী রা. বিরাট মুসলিম সাম্রাজ্যের খলীফা সর্বাধিনায়ক হয়েও সাধারণ অধিবাসীদের ন্যায় জীবনযাপন করতেন। কিন্তু হযরত মুআবিয়া রা. খলীফা হয়েই সর্বপ্রথম ইসলামের এ নিয়ম পন্থার পরিবর্তন সাধন করেন। মসজিদ হতে রাজ্য পরিচালনার ব্যবস্থাপনা তিনিই সর্বপ্রথম রাজ প্রাসাদে স্থানান্তরিত করেন। তাঁর সময় হতেই খিলাফতের কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয় পর্ণ কুটির হতে রাজকীয় বালাখানায়। তার সাথে গড়ে ওঠে হাজার হাজার প্রাসাদোপম অট্টালিকা এবং সেখানে বসবাস করতে শুরু করে ইহুদী নিয়ন্ত্রণে বাদশাহর আমীর ওমরা ও সভাসদবর্গ। যাদের পূর্বসুরি সাহাবায়ে কিরামগণ নবী ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় সাধারণ মানুষের ন্যায় অতি সাধারণ ঘরবাড়ীতে বসবাস করতেন। এমনিভাবে রসূলুল্লাহ স. ও খোলাফায়ে রাশেদীনের পরবর্তী সময়ে গড়ে ওঠে এক নতুন শ্রেণীহীন সমাজ যেখানে বাদশাহ ফকির বলে কেউই ছিল না—সবাই সমান সবার অধিকার সমান। হযরত মুআবিয়ার আমলেই সর্বপ্রথম শাসক ও শাসিত নামে দুটি শ্রেণী বা দলের সৃষ্টি হয়। এভাবেই হযরত মুআবিয়ার আমলে সর্বপ্রথম ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় এক নবতর প্রবাহের সৃষ্টি হয়, যা খাঁটি ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আদৌ অনুরূপ ছিলো না। এ সময় থেকে

www.pathagar.com

আমত্য, জনসাধারণ, ধনী ও দরিদ্র উচ্চ ও নিচ-এর মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয় এবং ইসলামের নির্দেশ তথা আল্লাহর ফরমান রসূলের বাণী বিস্মৃত হয়ে মানুষ দুনিয়ার লোভ-লালসা, আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাসের প্রতি আসক্ত হতে শুরু করে এবং এভাবে ক্রমান্বয়ে ইসলামের গৌরবময় ঐতিহ্য বিলুপ্ত হতে থাকে।

ক্রমে ক্রমে এ অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। পরবর্তীতে মুসলিম শাসকবর্গ দুনিয়ার ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের মালিক হয়ে সুখ-সম্ভোগের ও আরাম আয়েশের মধ্যে ডুবে যায় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল স.-এর প্রদর্শিত পথ বা আদর্শ হতে অনেক দূরে সরে যায়। এ সুযোগে ইসলাম তথা মুসলিম জাতির চিরশত্রু ইহুদী নাসারা ও হিন্দুরা মুসলিম যুব-সমাজকে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট করার সমস্ত পন্থা অবলম্বন করে। তারা ইসলামের বিভিন্ন জীবন-দর্শনও হুকুম-আহকামের মিথ্যা ও ভুল ব্যাখ্যায় তৎপর হয় এবং সাহিত্যের মাধ্যমে মুসলিম যুব-সমাজকে বিপথে পরিচালিত করে।

এবার দেখুন, আমরা কিভাবে শত্রুদের মিথ্যা ও ভুল প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হয়ে ধ্বংসের পথে চলে গিয়েছি তার কিঞ্চিত পর্যালোচনা ও মূল্যায়ণ ঃ

মহানবী স. এবং তাঁর সুপ্রিয় সাহাবীগণের যুগ তথা খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে কোর্ট বা বিচারালয় ছিল মসজিদ। এ কারণে সেখানে উপস্থিত হয়ে যারা মামলার পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষ্য দিত, কেউই মিথ্যা সাক্ষী দিতে সাহসী হতো না এবং বিচারকও বিচারের নামে প্রহসন ও পক্ষপাতিত্ব করতে সাহস পেতো না। এখন কোর্ট কাছারীকে মসজিদ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়ায় সেখানে যত মিথ্যাচার, অনাচার, ঘুষ, জালিয়াতী ও অবিচারের সয়লাব বয়ে যাচ্ছে। বিচারকের সম্মুখে 'সত্য ছাড়া মিথ্যা বলবো না' এরূপ হলফনামা উচ্চারণ করা সত্ত্বেও নির্বিবাদে ব্যক্তিস্বার্থ, দলীয় স্বার্থ ও সুবিধা অর্জনের জন্য অনর্গল মিথ্যা সাক্ষী দিতে থাকে এবং এতে তাদের হৃদয় এতটুকু কাঁপে না। কিন্তু আজো যদি বিচারকার্য মসজিদে সম্পন্ন হতো তবে আল্লাহর ঘরের ভয়ে অনেকের মুখেই মিথ্যা সাক্ষের বাক্য-স্ফুরিত হতো না।

পূর্বে মসজিদভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল। ফলে সেই শিক্ষার সাথে নৈতিকতা সম্পৃক্ত ছিল। এখন শিক্ষা কেন্দ্রগুলো মসজিদ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়ায় সেগুলোর সাথে নৈতিকতা সংশ্লিষ্ট নেই। বরং সেগুলো স্বার্থপরতা, দাম্ভিকতা, নির্দয়তা, নিষ্ঠুরতা, বেহায়া-বেলেল্লাপনার আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে। বিশেষত উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রগুলোতে যুবক-

www.pathagar.com

যুবতীদের একই সাথে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করায় এবং ধর্মহীন, নাস্তিক্যবাদী শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটায় গোটা মুসলিম মিল্লাতের যুব চরিত্রে আজ নাস্তিকতা, উচ্ছৃংখলতা, বেহায়াপনা ও যৌন অনাচারের বিরামহীন সয়লাব বয়ে যাচ্ছে। আমাদের সুচতুর দুশমনরা অত্যন্ত সুকৌশলে ও সুপরিকল্পিতভাবে মুসলিম জাতির যুব-মানসকে বিকৃত ও গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে ধর্মীয় শিক্ষার পরিবর্তে ধর্মহীন নীতিহীন শিক্ষার দ্বারকে সম্প্রসারিত করে দিয়েছে। তারা তাদেরকে স্রষ্টা হতে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, ধর্মের প্রতি অনীহা ও বীতশ্রদ্ধ করছে। এমনকি আল্লাহ, পবিত্র কুরআন, হাদীস এবং ইসলাম ও মুসলমানের নিষ্পাপ রসূলের প্রতি অজ্ঞাতসারে অভক্তির ভাব সৃষ্টি করে চলেছে। এভাবে মুসলিম মিল্লাতের ইস্পাত কঠিন দৃঢ় বন্ধনকে শিথিল করে দিয়ে মুসলিম জাতির ঐক্য, সংহতি ও শৃংখলাকে বিনষ্ট করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় রত রয়েছে। এরূপ মসজিদভিত্তিক জীবন-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক ও পর্যায় সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, উদ্দেশ্য মূলকভাবে আমাদের সুচতুর দুশমনরা আমাদেরকে মসজিদ হতে বের করে নিয়ে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করেছে।

মূলত মুসলিম জাতির এহেন ধর্মীয় ও নৈতিক দুর্বলতার সুযোগে ইসলামের চির দুশমনরা সুপরিকল্পিতভাবে ইসলামের এ প্রাণবন্ত দুর্ভেদ্য দূর্গের ব্যবস্থাপনাকে তথা মসিজদভিত্তিক জীবন ব্যবস্থাকে অনেকখানি নষ্ট করে দিতে সক্ষম হয়েছে। তাই আজ দেখা যায়, মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি জনপদের স্থানে স্থানে মসজিদের অস্তিত্ব থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে কোনো রূহ বা প্রাণ নেই। আজকে বিশ্বে মনে হয় এমন একটি প্রাণবন্ত মসজিদেরও অস্তিত্ব নেই, যেরূপ ছিলো স্বয়ং রসূলুল্লাহ স. এবং তাঁর প্রাণপ্রিয় খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে। এরপর ইমামদের কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এ যুগে আমাদের মসজিদসমূহের ইমামদের করুণ জীবন মান চালু হয় বিশেষ করে আববাসীয় যুগে।

বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবালের একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরে এ অধ্যায়ের ইতি টানতে চাচ্ছি। তিনি বর্তমান বিশ্বের মুসলমানদের ধর্মীয় ও নৈতিক অধঃপতনের মূল কারণের প্রতি ইংগিত করে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় তাঁর অনবদ্য কাব্যগ্রন্থ 'শিকওয়ায়' বলেছেন ঃ

"মুসলিম জাতির বক্তার অভাব নেই, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানীর যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। কেননা, তাদের সেই বক্তৃতায় স্বভাবজাত বিদ্যুতের ন্যায় প্রবাহ সৃষ্টিকারী অগ্নিঝরা কোনো প্রভাব নেই। আযানের প্রথা এখনও

www.pathagar.com

প্রচলিত আছে, কিন্তু তার ভিতরে হযরত বেলাল রা.-এর আযানের ন্যায় আত্মিক শক্তি নেই। দর্শনের চর্চা এখনও হয়ে থাকে, কিন্তু এতে ইমাম গাযযালী র.-এর সেই শিক্ষা নেই। মসজিদসমূহ আজ মাতম করছে, কেননা এতে আজ প্রকৃত নামাযীর সংখ্যা খুবই নগণ্য। দুঃখ ও আক্ষেপ এই যে, হিজাযের সেই মহাজ্ঞানী মহানবী স.-এর আদর্শ হতে আমরা বিচ্যুত।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

৩০. সালাত ও নামায

'সালাত' শব্দের ধাতুগত অর্থ সরলতা, কোমলতা, নম্রতা, আনুগত্য প্রভৃতি। আর বুৎপত্তিগত অর্থ পূজা, অর্চনা, উপাসনা, আরাধনা, প্রভু-প্রশংসা, প্রার্থনা প্রভৃতি। মূলত আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নিরংকুশ সার্বভৌমত্ব মনে প্রাণে মেনে নেয়ার সাথে সাথে তা নিজের সাড়ে তিন হাত দেহ সৌষ্ঠবে বাস্তবে প্রয়োগের মাধ্যমে মান্য করার প্রমাণেরই নাম সালাত। সালাতের মধ্যে মনের ভাষায় মুখে কুরআন পাঠ, দোয়া-দরুদ পাঠ, কিয়াম, রুকূ', সিজদা, উপবেশন প্রভৃতি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী বিশেষ নিয়মে অংগভংগি দ্বারা উল্লেখিত ভাবগুলো প্রকাশ করার নামই সালাত। কিন্তু শুধু অঙ্গভঙ্গি দ্বারা সালাতের অর্থ বা উদ্দেশ্য পূরণ হয় না। নম্রতা ও আনুগত্যকে বাদ দিয়ে বিরাগ বা মুনাফিকী মন নিয়েও প্রভুপূজা করা যায় কিন্তু তা সালাত হয় না। বাংলা ভাষায় এমন একটি শব্দ নেই যা সালাতের পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে। এজন্য ফারসী 'নামায' শব্দটি বাংলাদেশে সালাতের পরিবর্তে চালু হয়ে গেছে। সুলতানী ও মুঘল আমলে এটা আমাদের দেশে প্রচলিত হয়। কারণ তখন ফারসী ছিল রাষ্ট্রভাষা। প্রখ্যাত দার্শনিক শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মাদ আযরফ সাহেব তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ "জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম"—এ বলেছেন, "আমাদের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, আমরা আমাদের বাংলাভাষায় সালাত শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ফারসী 'নামায' শব্দ ব্যবহার করি। কুরআন-উল-করীমে যে সালাত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার প্রতিশব্দ হিসেবে ফারসী 'নামায' শব্দ ব্যবহৃত হতে পারে না। নামায শব্দের উৎপত্তিগত অর্থ উপাসনা। এ উপাসনা অগ্নি উপাসক ফার্সিদের মধ্যে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে প্রচলিত ছিল। সে উপাসনার বিষয়বস্তু ছিল অগ্নি। কুরআন উল-করীমে ব্যবহৃত সালাত শব্দের অর্থ শুধু উপাসনা নয়। তার অর্থ হচ্ছে যে, সর্বশক্তিমান ও সার্বভৌম সৃষ্টিকর্তার আদেশ নির্দেশের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাস্থাপন করে তার কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্ম সমর্পণ। পৃঃ ৯৮-৯৯

www.pathagar.com

৩১. পূজা-উপাসনা ও ইবাদাত

এতক্ষণ 'সালাত' ও 'নামায'-এর মৌলিক পার্থক্য কোথায় তা নিয়ে কিঞ্চিত আলোকপাত করা হলো। এখন 'পূজা', 'উপাসনা' ও 'ইবাদাত' এর মধ্যেকার পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করতে চেষ্টা করবো। আপনারা অবগত আছেন, সাধারণত হিন্দু জাতিই পূজা-অর্চনা করে থাকে। এদের এ পূজার সংখ্যা বছরে ১৩টি। তেরটি শক্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা বছরে ১৩টি পূজা অনুষ্ঠান করে থাকে। এ থেকে প্রমাণ হলো তারা একজন উপাস্যে বিশ্বাসী নয়। আর এজন্যেই তারা যে স্রষ্টাকে বুঝাতে ঈশ্বর শব্দ ব্যবহার করে তাও দুটি সম শক্তিমান-এর অর্থ বহন করে। কারণ ঈশ্বর শব্দের স্ত্রী লিংগে 'ঈশ্বরী' শব্দের অস্তিত্ব বাংলা অভিধানে আছে। অনুরূপ আছে পাশ্চাত্যে ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষাতেও। তারা স্রষ্টা বুঝাতে God শব্দ ব্যবহার করে থাকে। এরও স্ত্রীলিংগ Goddess শব্দ বা Word তাদের অভিধানে আছে। এ থেকে প্রমাণিত হলো মুসলিম ছাড়া অন্যান্য জাতির স্রষ্টা সম্বন্ধে তাদের ধারণা অবৈজ্ঞানিক ও অস্পষ্ট। আর এজন্যই এক স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে বহু স্রষ্টা বা শক্তিকে তারা পূজা উপাসনা করে থাকে। এই পূজা উপাসনা শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ Worship.

হিন্দুরা পূজা করে তেত্রিশ কোটি দেবতার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য, ইহুদীরা উপাসনা করে দুই খোদাকে সন্তুষ্ট করার জন্য, খৃষ্টানরা উপাসনা করে তিন খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবং মুসলমানরা ইবাদাত করে এক আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। হিন্দুরা তেত্রিশ কোটি দেবতার সন্তুষ্টি অর্জন করে তার মাধ্যমে স্রষ্টাকে সন্তুষ্টি করতে চায়। ইহুদীরা গড (God) ও গডের পুত্র ওযায়ের এর সন্তুষ্টি অর্জন করে মুক্তি পেতে চায়। খৃষ্টানরা গড (God), গডের পুত্র ঈসা আ. এবং গডের স্ত্রী মেরী (মরিয়ম)-কে সন্তুষ্টি করে মুক্তি পেতে চায়। কিন্তু মুসলমানরা এক স্রষ্টা আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে তার ইবাদাতের মাধ্যমে সন্তুষ্ট করে মুক্তি পেতে চায়। এক মুসলিম ছাড়া অন্যান্য জাতি পূজা-উপাসনা করে মরণশীল বা ধ্বংশশীল শক্তিকে, যেগুলোকে যে মহান স্রষ্টা আল্লাহ রব্বুল আলামীন সৃষ্টি করেছেন তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য যেমন চাঁদ-সূর্য, অগ্নি-পাথর, সাপ, বটগাছ, বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ ইত্যাদি। যারা দেবতার পর্যায়ে বরেণ্য ও উপাস্য। পূজা-উপাসনা পালিত হয় এলোমেলো ও অবৈজ্ঞানিক

www.pathagar.com

ভাবে। কিন্তু ইবাদাত সুসম্পন্ন হয় অত্যন্ত সুশৃংখল ও বৈজ্ঞানিকভাবে। অন্যদিকে পূজা-উপাসনা করা হয় জড়বস্তুর, কিন্তু ইবাদাত করা হয় ব্যক্তিগত পরিশুদ্ধির (Rectification) জন্য একক বা সমষ্টিগতভাবে জামায়াতের সাথে নিরাকার স্রষ্টার দেয় বিধান অনুযায়ী। অতএব পূজা-অর্চনা ও উপাসনা এবং ইবাদাত কখনো এক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে না। অথচ আল্লাহ রব্বুল আলামীন সকল মানুষকেই একমাত্র তাঁর ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাঁর পাক কালামে বলেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ ○

"আমি জিন ও মানব জাতিকে কেবল আমারই ইবাদাত ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।"–সূরা যায যারিয়াত ঃ ৫৬

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো, সত্যিই আল্লাহ রব্বুল আলামীন শুধুমাত্র তাঁর ইবাদাত ও বন্দেগী করার জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আর এ জন্য মানুষ মাত্রেই সকলকে জেনে নেয়া একান্ত উচিত এ ইবাদাত ও বন্দেগী শব্দের অর্থ কি। আর সে বস্তু বা জিনিস যে উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয় সে উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করতে না পারলে নিসন্দেহে বলা যায় তা ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয়েছে।

চিকিৎসক রোগীকে নিরাময় করতে না পারলে বলা হয় সে চিকিৎসায় ব্যর্থ হয়েছে। কৃষক ভালো ফসল ফলাতে না পারলে কৃষিকাজে তার ব্যর্থতা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। তেমনি আপনারা যদি আপনাদের জীবনের উদ্দেশ্য লাভ অর্থাৎ 'ইবাদাত' করতে না পারেন তবে বলতে হবে যে, আপনাদের জীবন ব্যর্থ হয়েছে। এজন্যই আমি আশা করি আপনারা এ 'ইবাদাত' শব্দটির প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য জানবার জন্য বিশেষ মনোযোগী হবেন এবং আপনাদের হৃদয় মনে এর অর্থ বদ্ধমূল করে নিবেন। কারণ মানব জীবনের সত্যিকার সাফল্য ও ব্যর্থতা এরই উপর একান্তভাবে নির্ভর করে।

'ইবাদাত' শব্দটি আরবী 'আবদ' (عَبْدٌ) হতে উদ্ভূত যার বাংলা অর্থ দাস বা গোলাম। অতএব ইবাদাত শব্দের অর্থ হচ্ছে দাসত্ব করা বা গোলামী করা। যে ব্যক্তি অন্যের দাস সে যদি প্রকৃতপক্ষে তার মনিবের (Master) সমীপে একান্ত অনুগত হয়ে থাকে এবং তাঁর সাথে সঠিকভাবে ভৃত্যের ন্যায় ব্যবহার করে তবে এটাকেই বলা হয় দাসত্ব করা, বন্দেগী করা বা ইবাদাত করা। পক্ষান্তরে কেউ যদি কারোর চাকর হয় এবং

www.pathagar.com

মনিবের নিকট থেকে পুরোপুরি বেতন (Salary) আদায় করে, কিন্তু তবুও যদি সে ঠিক চাকরের ন্যায় কাজ না করে, তবে অবশ্যই বলতে হবে যে, তার মনিবের সাথে নাফরমানী করেছে বা বিদ্রোহ করেছে। আর এ বিদ্রোহের পরিণতি কি হওয়া উচিত তা সহজেই অনুমেয়। তাই সর্বপ্রথম আপনাকে জানতে হবে, মনিবের সম্মুখে চাকরদের ন্যায় কাজ করা এবং তাঁর সমীপে আনুগত্য প্রকাশ করার উপায় কি হতে পারে। বান্দাহ বা চাকরকে প্রথমত মনিবকে 'প্রভু' বলে মানতে হবে, স্বীকার করতে হবে এবং মনে করতে হবে যে, যিনি আমার মালিক, যিনি আমার জীবন দান করেছেন তিনি আমার দৈনন্দিন রুজী (খাবার) দান করেন এবং যিনি আমার হেফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন তাঁরই অনুগত হওয়া আমার কর্তব্য, তিনি ছাড়া অন্য কেউই আমার আনুগত্য লাভের অধিকারী নয়। সকল সময় মনিবের আনুগত্য করা, তাঁর হুকুম পালন করা, তাঁর অনুবর্তিতা মুহূর্তের জন্যও পরিত্যাগ না করা, মনিবের বিরুদ্ধে মনে কোনো কথার স্থান না দেয়া এবং অন্য কারোর কথা পালন না করা বান্দার দ্বিতীয় কর্তব্য। গোলাম সবসময় গোলাম, তার একথা বলবার কোনো অধিকার নেই যে, আমি মনিবের এই আদেশ মানবো আর অমুক আদেশ (Order) মানবো না। কিংবা আমি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মনিবের গোলাম আর অন্য সময়ে আমি তাঁর গোলামী হতে সম্পূর্ণ আযাদ ও মুক্ত।

মনিবের প্রতি সম্মান ও সন্তুষ্টি প্রদর্শন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং তাঁর সমীপে আদব রক্ষা করে চলা বান্দার তৃতীয় কাজ। আদব ও সম্মান প্রদর্শনের যে পন্থা মনিব নির্দিষ্ট করে দেবেন তাই অনুসরণ করা, সালাম দেয়ার জন্য মনিব যে সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন সেই সময়ে নিশ্চিতরূপে উপস্থিত হওয়া এবং মনিবের আনুগত্য ও দাসত্ব স্বীকার এবং নিজের প্রতিজ্ঞা ও আন্তরিক নিষ্ঠা প্রমাণ করা একান্ত আবশ্যক।

এ তিনটি প্রক্রিয়া (Process) সমন্বয়ে যে কাজটি সম্পন্ন হয় আরবী পরিভাষায় তাকেই বলে 'ইবাদাত'।

মানুষ কেবল আল্লাহ রব্বুল আলামীনেরই দাসত্ব করবে অন্য কারোর নয়, কেবল তাঁরই হুকুম পালন করবে অন্য কারোর নয়, কেবল তাঁরই প্রদর্শিত পথে চলবে অন্য কারোর দেখানো পথে চলবে না এবং তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কেবল তাঁর সামনে সম্মান ও সম্ভ্রম প্রকাশের জন্য মাথানত করবে অন্য কারোর সামনে নয়। এ তিনটি বিষয়কে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বুঝিয়েছেন এ ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ

www.pathagar.com

'ইবাদাত' দ্বারা। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ও নবীকুল শিরোমণি মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ স. এবং তাঁর পূর্ববর্তী সকল আম্বিয়ায়ে কেরামের যাবতীয় শিক্ষার সারকথাই ছিল "আল্লা তা'বুদু ইল্লাল্লাহ"।

'আল্লাহ ছাড়া আর কারোর ইবাদাত করো না।' অর্থাৎ দাসত্ব ও আনুগত্য লাভের যোগ্য সারা জাহানে একজনই মাত্র বাদশাহ আছেন তিনি হচ্ছেন, আল্লাহ রব্বুল আলামীন—বিশ্বজাহানের প্রভু। অনুসরণ যোগ্য মাত্র একটি বিধান বা আইন আছে—তাহলো আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা—ইসলাম এবং একটি মাত্র সত্তাই আছে, যার গুণ-গান, পূজা-উপাসনা বা আরাধনা ইবাদাত করা যেতে পারে। আর সে সত্তাই হচ্ছে একমাত্র স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সত্তা।

'ইবাদাত' শব্দের এই অর্থ আপনি স্মরণ রাখুন এবং আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে থাকুন। একটি চাকর যদি মনিবের নির্ধারিত কর্তব্য পালন না করে বরং তার সামনে কেবল হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে, লক্ষ-কোটি বার কেবল তাঁর নাম জপ করে, তবে এ চাকরটি সম্পর্কে আপনি কি বলবেন? মনিব তাকে অন্যান্য মানুষের প্রাপ্য আদায় করতে বলেন। কিন্তু কেবল সেখানেই দাঁড়িয়ে থেকে মনিবের সম্মুখে মাথানত করে দশবার সালাম করে এবং হাত বেঁধে দাঁড়ায়। মনিব তাকে অনিষ্টকর কাজগুলো বন্ধ করতে আদেশ (Order) করেন। কিন্তু সে সেখান থেকে একটুও নড়ে না, বরং সে কেবল সিজদা করতে থাকে। মনিব তাকে চোরের হাত কেটে দিতে বলেন। কিন্তু সে দাঁড়িয়ে থেকে সুললিত কণ্ঠে বিশবার পড়তে থাকে, 'চোরের হাত কাট'। কিন্তু সে একবারও এমন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করে না যার অধীনে চোরের হাত কাটা সম্ভব হবে। এমন চাকর সম্পর্কে আপনি কি মন্তব্য করবেন? আপনি বলতে পারবেন যে, সে প্রকৃতপক্ষেই তার মনিবের গোলামী বা ইবাদাত করছে? আপনার কোনো চাকর এরূপ করলে আপনি কি তাকে বলবেন তা আমি জানি না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আল্লাহর যে চাকর বা গোলাম এরূপ আচরণ করে তাকে আপনি 'বড় আবেদ' (ইবাদাতকারী, বুযুর্গ ইত্যাদি) নামে অভিহিত করেন। এরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কুরআন শরীফে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কত শত হুকুম পাঠ করে, কিন্তু সেগুলো পালন করার এবং কার্যে পরিণত করার জন্য এতটুকু চেষ্টাও করে না। বরং কেবল নফলের পর নফল পড়তে থাকে। আল্লাহর নামে হাজার দানা তাসবীহ তেলাওয়াত করতে থাকে এবং মধুর কণ্ঠে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করতে থাকে আপনি তার এ ধরনের কার্যাবলী দেখেন আর বিস্মিত হয়ে

www.pathagar.com

বলেন ঃ "ওহে লোকটা কত বড় আবেদ আর কত বড় পরহেযগার।" আপনাদের এ ভুল ধারণার মূল কারণ এই যে, আপনারা 'ইবাদাত' শব্দটির প্রকৃত অর্থ মোটেই জানেন না।

আর একজন চাকরের কথা ধরুন। সে দিনরাত কেবল পরের কাজ করে, অন্যের আদেশ শুনে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে, অন্যের আইন মেনে চলে এবং তার প্রকৃত মনিবের যত আদেশ ও ফরমানই হোকনা কেন তার বিরোধিতা করে। কিন্তু সালাম দেয়ার সময় সে তার প্রকৃত মনিবের সামনে উপস্থিত হয় এবং মুখে কেবল তার নাম জপ করতে থাকে। আপনাদের কারোর চাকর এরূপ করলে আপনারা কি করবেন ? তার সালাম কি তার মুখের উপর ছুড়ে মারবেন না ? মুখে মুখে সে যখন আপনাকে মনিব আর মালিক বলে ডাকবে আপনি কি তাকে একথা বলবেন না যে, তুই ডাহা মিথ্যাবদী ও বেঈমান, তুই আমার বেতন খেয়ে অন্যের তাবেদারী করে বেড়াস, মুখে আমাকে মনিব বলে ডাকিস কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেবল অন্যের ফরমাবরদারী ও কাজ করে বেড়াস ? এটা নিতান্ত সাধারণ বুদ্ধির কথা, এটা কারোর বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু কি আশ্চর্যের কথা! যারা রাতদিন আল্লাহর আইন ভংগ করে, কাফের ও মুশরিকদের আদেশ অনুযায়ী কাজ করে এবং নিজেদের বাস্তব কর্মজীবনে আল্লাহর বিধানের কোনো পরোয়া করে না তাদের নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাত, তাসবীহ-তাহলীল, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদিকে আপনি 'ইবাদাত' বলে মনে করেন। এ ভুল ধারণারও মূল কারণ 'ইবাদাত' শব্দের প্রকৃত অর্থ না জানা।

আর একটি চাকরের উদাহরণ নিন। মনিব তার চাকরদের জন্য যে ধরনের পোশাক আশাক নির্দিষ্ট করেছেন, মাপ-জোখ ঠিক রেখে সে ঠিক সেই ধরনের পোশাক পরিধান করে, বড় আদব ও যত্ন সহকারে সে মনিবের সামনে হাজির হয়, প্রত্যেকটি হুকুম শোনা মাত্রই মাথানত করে শিরোধার্য করে নেয়, যেনো তার চেয়ে বেশি অনুগত চাকর আর দ্বিতীয়টি নেই। 'সালাম' দেয়ার সময় সে একেবারে সকলের সম্মুখে এসে দাঁড়ায় এবং মনিবের নাম জপ্‌বার ব্যাপারে সে সমস্ত চাকরের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও নিষ্ঠা প্রমাণ করে, কিন্তু অন্যদিকে এ ব্যক্তি মনিবের দুশমন এবং বিদ্রোহীদের খেদমত করে, মনিবের বিরুদ্ধে তাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করে, আল্লাহর আইন বিরোধী কাজকর্মে যারা সমাজে প্রতিযোগিতা করে অর্থ উপার্জন করে তাদের সাথে মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলে, তাদের জন্য দোয়া করে উপার্জিত অর্থের একটা ভাগ তাদের দেয়। ইলেকশনের সময়

www.pathagar.com

দোয়া তাবীজ দেয় এজন্য যে, জয়যুক্ত হয়ে আরো বেশি বেশি করে জনগণের হক নষ্ট করে ধনশালী হতে পারে এবং হুযুরের বাহাদুরী প্রচার করে সমাজে হুযুরের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করতে পারে। মনিবের নাম পর্যন্ত দুনিয়ার বুক থেকে মুছে ফেলবার জন্য যারা খড়গহস্ত এরা তাদের সহযোগিতা করে। রাতের অন্ধকারে মনিবের ঘরে সিঁদ কাটে এবং ভোর হলে বড় অনুগত চাকরটির ন্যায় বুকে হাত বেঁধে মনিবের সামনে হাজির হয়। এ চাকরটি সম্পর্কে আপনি কি বলবেন ? আপনি নিশ্চয় তাকে মুনাফিক, স্বার্থবাদী, নিমকহারাম, বিদ্রোহী প্রভৃতি নামে অভিহিত করতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না। কিন্তু বাস্তবে আল্লাহর কোনো চাকর যখন এ ধরনের হাস্যকর আচরণ করতে থাকে তখন তাকে আপনারা কি বলতে থাকেন ? তখন আপনারা কাউকে পীর সাহেব, কাউকে হযরত মাওলানা, কাউকে বড় কামেল, কাউকে মুজাদ্দেদি জামান. প্রভৃতি নামে ভূষিত করেন। এর মূল কারণ এই যে, আপনারা তাদের মুখে মাপমত লম্বা দাড়ি দেখে, তাদের পাজামা পায়ের গিরার দুই ইঞ্চি উপরে দেখে, তাদের কপালে নামাযের কালো দাগ দেখে এবং তাদের লম্বা লম্বা নামায ও মোটা মোটা দানার তসবীহ দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। এদেরকে বড় দীনদার ও ইবাদাতকারী বলে মনে করেন। এ ভুল শুধু এ জন্য যে, 'ইবাদাতশুযার' ও দীনদারীর ভুল অর্থই আপনাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে।

আপনি হয়তো মনে করেন, বুকে হাত বেঁধে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো, হাঁটুর উপর হাত রেখে মাথা নত করা, মাটিতে মাথা রেখে সিদজা করা এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণ করা—ব্যস শুধু এ কয়টি কাজই প্রকৃত 'ইবাদাত'। হয়তো আপনি মনে করেন, রমযানের প্রথম দিন থেকে শাওয়ালের চাঁদ দেখা পর্যন্ত প্রত্যেক দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার বন্ধ রাখার নাম 'ইবাদাত। আপনি হয়তো এটাও মনে করেন যে, কুরআন শরীফের কয়েকটি রুকূ' পাঠ করার নামই 'ইবাদাত', আপনি বুঝে থাকেন মক্কা শরীফ গিয়ে কা'বা ঘরের চতুর্দিকে তওয়াফ করার নামই 'ইবাদাত'। মোটকথা, এ ধরনের কয়েকটি কাজের বাহ্যিক রূপকে আপনারা ইবাদাত মনে করে নিয়েছেন এবং এ ধরনের বাহ্যিকরূপ বজায় রেখে উপরোক্ত কাজগুলো কেউ সমাধা করলেই আপনারা মনে করেন, সে ইবাদাত সুসম্পন্ন করেছে এবং وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ-এর উদ্দেশ্য পূর্ণ করেছে। তাই জীবনের অন্যান্য ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন, নিজের স্বার্থের খাতিরে খেয়াল-খুশী অনুযায়ী কাজ করে যেতে পারে।

www.pathagar.com

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে ইবাদাতের জন্য আপনকে সৃষ্টি করেছেন এবং যে ইবাদাত করার আদেশ আপনাকে দেয়া হয়েছে তা একেবারেই ভিন্ন বিষয়। সে ইবাদাত হলো আপনি জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তেই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের আনুগত্য স্বীকার করে চলবেন এবং আল্লাহ রব্বুল আলামীনের আইনের বিরোধী এ পৃথিবীতে যা কিছু প্রচলিত আছে তা অনুসরণ করতে আপনি একেবারেই অস্বীকার করবেন। আপনার প্রত্যেকটি কাজ, প্রত্যেকটি গতিবিধি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নির্ধারিত সীমার মধ্যে হতে হবে। এ পন্থায় যে জীবনযাপন করবেন তার সবটুকু ইবাদাত বলে গণ্য হবে। এ ধরনের জীবনে আপনার শয়ন-জাগরণ, পানাহার, চলাফেরা, কথা বলা বা আলাপ আলোচনা করাও ইবাদাত বলে বিবেচিত হবে। এমন কি নিজ স্ত্রীর নিকট যাওয়া এবং নিজের সন্তানদেরকে স্নেহ করাও ইবাদাতের শামিল হবে। যেসব কাজকে আপনারা দুনিয়াদারী বলে থাকেন তাও 'ইবাদাত' এবং দীনদারী হতে পারে—যদি সকল বিষয় আপনি আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে থেকে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দেয়া বিধান অনুসারে সমাধা করেন আর পদে পদে এ দিকে লক্ষ রাখেন যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নিকট কোন্‌টা জায়েয আর কোন্‌টা না জায়েয কোন্‌টা হালাল আর কোন্‌টা হারাম, কি করা অবশ্য কর্তব্য (ফরয) আর কি করা চরমভাবে নিষিদ্ধ, কোন্ কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন আর কোন্ কাজে তিনি ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট হন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আপনি রুজি ও অর্থোপার্জনের জন্য বের হন। এ পথে হারাম উপার্জনের অসংখ্য বা সহজ উপায় আপনার সম্মুখে আসবে। এখন আপনি যদি আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে ভয় করে সেই সুযোগ গ্রহণ না করেন এবং কেবল হালাল রুজি ও অর্থোপার্জন করেন তবে এ কাজে আপনার যে সময় লেগেছে তা সবই ইবাদাত এবং এ হালাল উপায়ে অর্জিত অর্থ ঘরে এনে আপনি নিজে খান আর পরিবার পরিজনের খাদ্যের ব্যবস্থা করেন, তাহলে এসব কাজেও আপনি অসীম সওয়াব বা নেকী পাবেন। পথ চলার সময় আপনি পথের কাঁটা দূর করেন এ ধারণায় যে, এটা দ্বারা কোনো পথচারী কষ্ট পেতে পারে তবে এটাও আপনার ইবাদাত বলে গণ্য হবে। আপনি কোনো রুগ্ন ব্যক্তির শুশ্রূষা করেন, কোনো অন্ধ ব্যক্তিকে পথ চলতে সাহায্য করেন, কিংবা কোনো বিপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করেন, তবে এটাও ইবাদাত হবে। কথাবার্তা বলতে আপনি মিথ্যা, গীবত, কুৎসা রটনা, অশ্লীল কথা বলে অপরের মনে আঘাত দেয়া পরিহার করেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভয়ে কেবল

www.pathagar.com

সত্য কথাই বলেন, তবে যত সময় আপনার এই কাজে ব্যয় হবে, তা সবই ইবাদাতে অতিবাহিত হবে।

অতএব চেতনা লাভের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আইন অনুযায়ী চলা এবং তাঁরই নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন করার নামই হচ্ছে আল্লাহর ইবাদাত। এ ইবাদাতের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়-ক্ষণ নেই। এ ইবাদাত সবসময় হওয়া চাই। এ ইবাদাতের জন্য কোনো নির্দিষ্ট প্রকাশ্য রূপ নেই, কেবল প্রতিটি রূপের প্রত্যেক কাজেই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ইবাদাত হতে হবে আপনি একথা বলতে পারেন না যে, আমি অমুক সময় আল্লাহর বান্দাহ আর অমুক সময় আল্লাহর বান্দাহ নই। আপনি একথাও বলতে পারেন না যে, অমুক সময় আল্লাহর ইবাদাতের জন্য, আর অমুক সময় আল্লাহর কোনো ইবাদাত করতে হয় না।

এ আলোচনা দ্বারা আপনারা ইবাদাত শব্দের অর্থ ভালোরূপে জানলেন এবং একথা বুঝতে পারলেন যে, প্রত্যেক মুহূর্তে সকল অবস্থায় আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করে চলার নামই ইবাদাত। এখানে আপনি এ প্রশ্ন করতে পারেন যে, তাহলে এই নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ইত্যাদিকে কি বলা যায় ? উত্তরে আমি বলবো যে, ইবাদাত বটে, এ ইবাদাতগুলোকে আপনার উপর ফরয করে দেয়া হয়েছে শুধু এজন্য যে, আপনার জীবনের প্রধান ও বৃহত্তম উদ্দেশ্য যে, প্রতি মুহূর্তে ও প্রত্যেক অবস্থায় আল্লাহর ইবাদাত করা, সে বিরাট উদ্দেশ্য আপনি এ সবের মাধ্যমে লাভ করবেন। নামায আপনাকে দৈনিক পাঁচবার স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আপনি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দাস—তাঁরই দাসত্ব করা আপনার কর্তব্য। রোযা বছরে একবার পূর্ণ একটি মাস আপনাকে এ দাসত্ব বা গোলামী করার জন্যই প্রস্তুত করে। যাকাত আপনাকে বারবার মনে করিয়ে দেয় যে, আপনি যে অর্থোপার্জন করেছন, তা আল্লাহ রব্বুল আলামীনেরই অবদান এজন্য তা কেবল আপনার খেয়াল-খুশী মতই ব্যয় করতে পারেন না। বরং তা দ্বারা আপনার পার্শ্ববর্তী গরবীবদের হক আদায় করতে হবে। হজ্জ মানব মনে আল্লাহ প্রেম ও ভালোবাসা এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতির এমন চিত্র অংকিত করে যে, একবার তা মুদ্রিত হলে সমগ্র জীবনও মন থেকে তা মুছে যেতে পারে না।

এসব বিভিন্ন ইবাদাত আদায় করার পর সমগ্র জীবন যদি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ইবাদাতে পরিণত হওয়ার উপযুক্ত হয় তবেই আপনার নামায প্রকৃত নামায হবে, রোযা খাঁটি রোযা হবে, যাকাত সত্যিকার

www.pathagar.com

যাকাত এবং হজ্জ প্রকৃত হজ্জ হবে। কিন্তু এ উদ্দেশ্য হাসিল না হলে কেবল রুকূ'-সিজদাহ, অনাহার-উপবাস, হজ্জের অনুষ্ঠান পালন করা এবং যাকাতের নামে টাকা ব্যয় করলে আপনার কিছুই লাভ হবে না। বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক ইবাদাতগুলোকে মানুষের একটি দেহের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। দেহে প্রাণ থাকলে এবং চলাফেরা ও কাজকর্ম করতে পারলে নিসন্দেহে তা জীবিত মানুষের দেহ, অন্যথায় তা একটি প্রাণহীন লাশমাত্র। লাশের চোখ, কান, হাত পা সবকিছুই বর্তমান থাকে। কিন্তু কেবল প্রাণ থাকে না বলেই তাকে আপনারা মাটির গর্তে পুতে রাখেন। অনুরূপভাবে নামাযের আরকান আহকাম যদি ঠিকভাবে আদায় করা হয় কিংবা রোযার শর্তাবলীও যদি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়, কিন্তু হৃদয়মনে আল্লাহর ভয় প্রেম-ভালোবাসা এবং তাঁর দাসত্ব আনুগত্য করার ভাবধারা উপস্থিত না থাকে ঠিক যে জন্য এসব আপনার উপর ফরয করা হয়েছিল, তাহলে তাও একটি প্রাণহীন ও অর্থহীন জিনিস বা ইবাদাত হবে। তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। এজন্য আমাদেরকে ইবাদাত সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হতে হবে এবং আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাঁর মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যকে সুষমামণ্ডিত করে তুলতে হবে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে প্রকৃত ইবাদাত করার তাওফীক দান করুন।

www.pathagar.com

৩২. ধর্মবৈকল্য ও তার পরিণতি

ধর্ম ও জীবন এ দুটো নিয়েই জিন্দেগী। আগে ধর্ম, পরে জীন্দেগী—না আগে জিন্দেগী পরে ধর্ম, সে বিতর্কে আসছি না। বলছি যে, জীবন-বৈকল্য নিয়ে আমরা নিত্য হাড়ে হাড়ে জ্বলছি ও যার যার পথ বেয়েই চলছি। কিন্তু ধর্মের বেলায় তা চলে না। প্রত্যেকেই মর্জিমাফিক এক একটা ধর্ম গড়ে নিলে তাকে কখনো ধর্ম বলা যাবে না। ধর্ম আল্লাহর আলাদা একটা খাস আদেশ বা শাসন যা মেনে চলতে হয় অণুক্ষণ। তা মেনে চলাই কর্তব্য ও নৈতিকতা।

দেহ-মন না চাইলেও তা মানতে হয়। জীবন দর্শনের সাথে সবদিকেই খাপ খেয়ে না গেলেও তা মানতে হয়। কারণ ধর্ম হচ্ছে নৈতিক, আর জীবনটা হচ্ছে নৈমিত্তিক। এজন্য জীবনকে নিত্য নতুন ছাঁচে গড়ে নেয়া যায় বা গড়ে নিতে হয়। কিন্তু ধর্মকে এমন নিত্য নতুন ছাঁচে পাল্টে নিলে তা আর ধর্ম থাকে না। বিকল হয়ে যায়।

মূলকথা ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্ম ও জীবন দর্শনের সাথে আত্মীয়তা থাকলেও হৃদ্যতা নেই তেমন কিছু। জীবন যা যা চাবে, ধর্ম তার সবগুলোই দেবে না। যা যা দেবে, তাও মেপে মেপে দেবে। অথচ যা যা চাবে, জীবনকে তা দিতে হবেই। (অবশ্য ইসলামী দৃষ্টিতে সাধ্যমত) নইলে পরকালে জীবনের দুর্ভোগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে।

মানব সমাজে এ ধর্মকে নিয়ে ধস্তাধস্তি চলছে আবহমান কাল থেকেই। ফলে জগত ভর্তি হয়ে গেছে মনগড়া নানা ধর্ম ও নানা মতে। সব ধর্মের উদ্দেশ্য হয়তো এক, কিন্তু সবার মত ও পথ নির্ভুল নয়। আদৌ যদিও ভ্রান্তবাদীরা ভাবে যে ওরা ঠিক পথেই যাচ্ছে।

ধর্ম বলতে শুধু রোযা-নামায, হজ্জ-যাকাতকেই বুঝায় না। আবার এগুলোকে বাদ দিয়েও ধর্ম হয় না। ধর্ম এমন এক বিধান—যা ইহকাল ও পরকালের জীবনকে সুষ্ঠ ও সুচারু করে দেয়। ধর্ম অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক একটি শব্দ। এটা নির্দিষ্ট কোনো তন্ত্রমন্ত্র বা গলদধর্মের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়। যা বা যে কাজ মানুষের জীবনে আনে পবিত্রতা ও শান্তি তাই ধর্ম। অধর্মও এমনি ব্যাপক অর্থবোধক একটি শব্দ। অধর্ম বলতে শুধু সুদ, মদ, গাঁজা, ভাং, চুরি, ডাকাতি, যিনাকেই বুঝায় না। যেসব কাজ ও নীতি মানুষের ইহকালের জীবনকে নোংরা ও পরকালের জীবনকে বিষময় করে তোলে, এমন কি দ্রুত কোনো অশান্তিকেও ডেকে আনে, তাই অধর্ম।

www.pathagar.com

ধর্মের মূলভিত্তি হলো, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালের সত্যিকার প্রভু আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য বলে স্বীকার করে নেয়া এবং তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এরূপ স্বীকৃতির পরবর্তী কর্ম হলো এ প্রভুকে ভয় করে চলা, অর্থাৎ এ প্রভুর আদেশ নিষেধগুলো মেনে চলা। যারা শুধু এরূপ খাঁটি প্রভু আল্লাহকে মানে তারা বিশ্বাসী বা ঈমানদার। যারা আল্লাহকেও মানে, তাঁর আদেশ-নিষেধগুলোও মেনে চলে তারা বিশ্বাসী ধার্মিক। যারা আল্লাহকে মানে, কিন্তু তাঁর আদেশ-নিষেধের ধার ধারে না, তারা অবিশ্বাসী অধার্মিক। যারা আল্লাহ কিংবা অন্য কোনো প্রভুকেই মানে না তারা নাস্তিক কাফির। যারা আল্লাহর পরিবর্তে মনগড়া দেও, দৈত্য, ভূত-পেত্নী বা মানুষকে প্রভু বলে খাড়া করে, তারা মুশরিক বা অংশীবাদী পাপী।

আল্লাহর আদেশ নিষেধগুলো মানতে হয় আমাদেরই মঙ্গলের জন্য। আল্লাহর মঙ্গলের জন্য নয়। তা না মানলে যে পাপ ও অশান্তি হয় তা আল্লাহর হয় না। আমাদেরই হয়।

আমরা আগেই বলেছি, একমাত্র আল্লাহকে প্রভু মানা ও তাঁর নির্দেশিত ধর্ম মানা না-মানা নিয়ে ধস্তাধস্তি চলছে সেই আবহমান কাল থেকেই। দুনিয়ার পহেলা সভ্য-মানুষ হযরত আদম আ. দুনিয়ায় এসেছিলেন তাওহিদী বা একমাত্র উপাস্যের ধর্ম নিয়ে। সে উপাস্য ছিলেন আল্লাহ্। যিনি বেনিয়ায, বেনযির, অজাত, অজাতক, অনাদি, অনন্ত, অক্ষয়, অব্যয়, অজড়, অমর, চিরজাগ্রত, সর্বশক্তিমান, অজেয়, প্রভু। কিন্তু জগতে মানুষ বৃদ্ধি ও তাদের বসতি বিস্তৃতির সাথে সাথেই শুরু হয়েছে জাত, জাতক, ক্ষণজন্মা, ভুলভ্রান্তিময়, শক্তিহীন, ভঙ্গুরদেহ, মরণশীল মানুষ, ভূত-পেত্নী, দেও-দৈত্য, অগ্নি-বায়ু, সর্প, সূর্য এমনকি পাথর প্রভুরও পূজা। আল্লাহ নিজেই এরূপ পূজার কথা বলেছেন কুরআনে ঃ

وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلاَّ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا ـ

"আদিতে মানুষ ছিল একই মতাবলম্বী। পরে তারা মনগড়া প্রভু খাড়া করে নিয়েছে।"–সূরা ইউনুস ঃ ১৯

আশ্চর্য যে আল্লাহ যাদের আসমানী কিতাব দিয়েছিলেন, তারাও এটা শয়তানের ধোঁকায় পাল্টে মনের মতো (যুগ মাফিক) করে নিয়েছে। আল্লাহর দয়ায় একমাত্র কুরআন মজীদই আজো অক্ষত অবস্থায় আছে। তাই আমরা শুনতে পাই মুসলমানরা বলে, এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ উপাস্য নেই।

www.pathagar.com

ইহুদীরা বলে—দুই আল্লাহ তো ইচ্ছে করেই মানতে হয়। কেননা আল্লাহর পুত্র ওযায়ের নবী আ.-কে বাদ দিয়ে ধরা তো ঠিক নয়।

খৃষ্টানরা বলে কি করে হয় ? তিন খোদা মানে না যারা বেহেশতে যাবে কি করে তারা ?

হিন্দুরা বলে—উনত্রিশ কোটি ভগবান ছাড়া সত্য সনাতন ধর্ম আবার কারে কয় ? বৌদ্ধরা কয়—জয় জয়, চির চিন্ময় সদা জাগ্রত গৌতম প্রভুরই জয়।

শিখেরা বলে—হাসি পায় যে, গুরু নানক ছাড়া আরো কারে না কি ভগবান কয় ?

চীন রাশিয়া জাপানীরা বলে—দেশের রাজা ছাড়া যারে তারে প্রভু মানা সত্যি বিস্ময়ের বিষয়।

এরূপ সত্য ও সভ্য জাতিদের মধ্যে আরো যে কতো শত শিরকী ও কুফরী ধর্মবিশ্বাস আছে, তার ইয়ত্তা নেই। শয়তান ছিল প্রথমে একটা। আজকের দুনিয়ায় তার চেলা শয়তানের অন্ত নেই। কাজেই মূল শয়তানটা হয়তো আরাম কেদারায় বসে শুয়ে আয়েশ করছে। আর তার চেলা শয়তানরাই তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এ শয়তানদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন ঃ

هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ○ تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ○ يُّلْقُوْنَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ○ وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ○

"(হে মানব সমাজ) আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো না, কাদের উপর শয়তানেরা অবতীর্ণ হয় ? তারা অবতীর্ণ হয় ভুয়া দুষ্ট কল্পনা-বিলাসীদের উপর, তাদের কানে ঢেলে দেয় শোনা কথার কুমন্ত্রণা। বস্তুত ওরা মিথ্যাবাদী। যারা এরূপ করে (মনগড়া বাণী বানায়) তাদের কথা শুনে তেমন ভ্রান্ত লোকেরাই।"–সূরা আশ শুআরা ঃ ২২১-২২৩

এরূপ ভ্রান্তদের লক্ষ করে আল্লাহ বলেন ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ نِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ط

www.pathagar.com

"যারা তাদের প্রতিপালকের পরিবর্তে মনগড়া প্রভু খাড়া করেছে তাদের সে কাজের উদাহরণ হচ্ছে। তারা যেন ছাইয়ের গাদার উপর নির্ভর করলো, যা ঝড়েই উড়িয়ে নিয়ে যায়।"-সূরা ইবরাহীম ঃ ১৮

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ نِ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ○

"ওদের ওসব মন্দ কথার তুলনা হচ্ছে মন্দ গাছের (আগাছার) মতো— যা মৃত্তিকা থেকে উপড়িয়ে ফেলা হয়। যার কোনো স্থায়িত্ব নেই।"-সূরা ইবরাহীম ঃ ২৬

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَايَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ط وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ○

"ভ্রান্তেরা আল্লাহর পরিবর্তে যাকে ডাকে, সে তাদের ডাক তেমন শোনে যেমন (শোনে পানি কারো আহ্বান) সে আশা করে পানির দিকে দুহাত বাড়ায় যেন তা তার মুখে চলে আসে। কিন্তু পানি তার মুখে চলে আসে না। ফলত কাফিরদের প্রার্থনাও এমনি নিষ্ফল হয়।"-সূরা আর রা'দ ঃ ১৪

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ط حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ط

"অবিশ্বাসীদের আশা ভরসাগুলোর তুলনা হচ্ছে মরুভূমির মরীচিকার মতো যাকে তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি দূর হতে মনে করে পানি। অনন্তর যখন তার নিকট ছুটে যায়, দেখে কিছুই নয় (শূন্য)।-সূরা আন নূর ঃ ৩৯

আল্লাহ কাফেরদের লক্ষ করে বলেন, তোমরা যাদের ডাকো তারা তোমাদের ডাক শুনতে পায় ? যদিও (ধরে নাও যে) যে শুনে তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করার কোনো ক্ষমতা রাখে ওরা ? কাল কিয়ামতের দিন তোমাদের উপস্যরা, বলবে মিছেমিছি ওরা আমাদেরকে ডেকেছে। হে আল্লাহ আমরা তোমার ইলাহী সত্তায় শরীক ছিলাম না। শোনো হে ভ্রান্ত সমাজ! অন্য কেউ এমন সত্যি সংবাদ দিতে পারে না আল্লাহ ছাড়া, শুধু তিনিই খবর রাখেন।

আল্লাহ তাআলা এভাবে ভ্রান্ত মানব সমাজকে ভবিষ্যতের বহু সত্য-অসত্য সংবাদ জানিয়ে দিয়েছেন। তবু ওরা সজ্ঞানে সগর্বে মনগড়া প্রভুদেরই পূজা করছে। তারা যে কতদূর ভ্রান্ত সে সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন ঃ

www.pathagar.com

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غٰفِلُوْنَ ○

"বস্তুত ওদের চেয়ে বেশী পথভ্রান্ত কাকে বলা যায়, যারা আল্লাহর স্থলে এমন সব জিনিসের পূজা দেয়—কিয়ামত পর্যন্ত ডাকলেও যারা সাড়া দিতে পারবে না (ওদেরই বা দোষ কি ?) ফলত ওরা এসব ডাকা ডাকির কোনো খবরই রাখে না।"–সূরা আল আহক্বাফ ঃ ৫

স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক এসব উদাহরণ এবং ধিক্কার দেয়া ছাড়াও একটু সুস্থ বুদ্ধিতে চিন্তা করে দেখলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মানুষ, পাথর, কখনো সৃষ্টিকর্তা হতে পারে না। কিংবা মানুষ, জীব বা পাথর অবতার হয়ে জন্ম নেয়ার দরকার লাগে না। তাঁর ইচ্ছাতেই মানুষ আবেদ বা গোমরাহ হয়ে যায়। মা'বুদ বলেন আমি 'কুন' (হও) বললেই আপ্না আপ্নি সবকিছু সৃষ্টি হয়ে যায়। আবার 'ফান' (ধ্বংস হও) বললেই সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। এ জন্যে আমাকে পারমানবিক বোমা ফুটাতে হবে না। মা'বুদ জিজ্ঞেস করছেন ঃ

اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ ○ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ ○ وَاَنْتُمْ سَامِدُوْنَ ○

"তোমরা কি বিস্ময় বোধ করছো আমার এসব কথায় ? আর (ঠাট্টা করে অবিশ্বাসের হাসি) হাসছো ? তোমাদের কান্না আসে না ? সত্যি (আমার শক্তি সম্বন্ধে) তোমরা বড্ড অসতর্ক রয়ে গেছো।"

–সূরা আন নাজ্‌ম ঃ ৫৯-৬১

কিয়ামতের দিন আল্লাহ ধরবেন ওদেরকে ওরা ধরবে শয়তানকে। বলবে, তুমি আমাদের এ কি সর্বনাশ করেছো! আজ তোমাকে আমরা ছাড়বো না। শয়তান বলবে, আমাকে ছাড়ো আর ধরো সমান কথা। শোন হে আহাম্মকের দল! দুনিয়ায় থাকতেই আল্লাহ কি আমার সম্বন্ধে তোমাদেরকে হুশিয়ার করে দেননি ? আজকের এ দুর্দিনের খবর ঘোষণা করেননি ? তাছাড়া আমি তোমাদেরকে জোর করে কুপথে নিয়েছিলাম ? আহবান করেছিলাম মাত্র। তাতেই তোমরা কুকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে। নিজেদের সেই গোমরাহীর কথা ভাবো না ? আজ যালিমদের শাস্তি তিনি দেবেনই।–সূরা ইবরাহীম ঃ ২২ আয়াতের উক্তি হতে।

যাক এখন আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, এভাবে ধর্ম-বৈকল্য হেতু অগণিত মুশরিক ও কাফের সাত জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে। এদেরই সৃষ্টির কথা আল্লাহ কুরআনে বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ۔

"এবং আমি অবশ্যই বহু জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্যে।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১৭৯

মানুষের ভুল কাজ ও আল্লাহর এ বাণীতে প্রমাণ হচ্ছে, অগণিত জিন ও ইনসান জাহান্নামবাসী হবে। সাধারণ জ্ঞানেও বুঝা যায়, ইহকালের ন্যায় পরকালেও নেক-বদ (ভালো-মন্দ) সবাই একত্রে বসবাস করতে পারবে না। নেক লোকেরা থাকবে জান্নাতে, আর বদ লোকেরা যাবে জাহান্নামে।

অথচ ভূতপূর্ব ভাওয়াল আটিয়া পরগণার তহবিল তসরুপকারী নায়েব মৃত বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্তীর (দ্বিজদাসের) নিম্নোক্ত গানটা মানুষ বড্ড আশা করে গায় যে—

এক হাতের তৈয়ার যাওয়া এক জায়গায়।
বাইবেল, পুরান, বেদ, কুরআন
একজনেরি মহিমা গায় ইত্যাদি

জটাধারী ফকির, নেংটা-সাধু, কাঁথা-পাগলা, মাথা-পাগলা, চুলা-ঠাকুর ও উর্ধবাহু সন্ন্যাসীদের গাঁজার আসরে এ গানটি যখন বাউল কণ্ঠে বন্দী হয়ে তার সারেঙ্গীর তালে-তালে ঘুরে কেঁপে কেঁপে কুৎকুঁতিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসতে থাকে, তখন শুধু সেই সাধুরাই নয়, অতি সাধারণ শ্রোতারাও জান্নাতে যাবার খুশীতে ডগমগ না হয়ে যায় না। কিন্তু দ্বিজদাস কোথায় এই হাদীস পেলেন যে, মানুষ সবই এক জায়গায় যাবে। যাওয়া অর্থ শুধু উপস্থিতি ধরলেই চলবে না। স্থায়ীভাবে অবস্থান ধরলে হবে এক জায়গায় মানে হাশর ময়দানে যেতে হবে একদিন সকলকেই। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِيْنَ۔

"কারো সাধ্যি নেই যে, (হাশর ময়দানে) গায়িবীন বা অনুপস্থিত থাকবে।"

দ্বিজদাসের ভাষায় "যাওয়া এক জায়গায়" অর্থে কথাটা সত্যি ঠিক কিন্তু থাকতে হবে গিয়ে দু জায়গায় এটাই হচ্ছে জান্নাত আর জাহান্নাম। জান্নাত হচ্ছে আল্লাহর অফুরন্ত রহমতরাজী ও খুশীর মোকাম যেমন বাদশাহদের রঙমহল বা বাগিচাবাড়ী। আর জাহান্নাম হচ্ছে, আল্লাহর

www.pathagar.com

অন্তহীন অভিশাপ ও আযাবের মোকাম। যেমন চোর-ডাকাতের জন্য তৈরী জেলখানা। এ দুটো স্থান কি এক ?

দ্বিজদাস তাঁর গানে বলেছেন বাইবেল, পুরান, বেদ, কুরআন একজনেরই মহিমা গায়। তবে কেন হিন্দু মুসলমান ইহুদী খৃষ্টান শিখ বৌদ্ধেরা একজনেরই পূজা করে না ? আল্লাহ, শিব, কৃষ্ণ, কালী, বুদ্ধ, নানক তাঁরা কি একজন ? তাঁদের পূজা কি ধর্মগ্রন্থের মহিমা অনুযায়ী করা হয় না ? পারসিকরা যে অগ্নিপূজা করে, তাতো ওরা তাদের ধর্মগ্রন্থ জেন্দাবেস্তার মতামতেই করে ? শিখেরা যে মৃত নানককে সর্বেসর্বা প্রভু বলে ভাবে, তাতো ওদের ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থসাহেবের মতামতেই ভাবে ? বৌদ্ধরা যে মৃত গৌতম বুদ্ধকে চিরজ্যান্ত প্রভু বলে মানে তা তো ওদের ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকের মতমতেই মানে। হিন্দুরা যে মৃত কৃষ্ণের নামে কাঁৎ হয়ে পড়ে বলে যে, কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান তাতো ওরা ওদের ধর্মগ্রন্থ গীতার উক্তিতেই বলে ?

তবে কি করে সব ধর্মগ্রন্থের মহিমা গাওয়া হয়।

ভাষার পার্থক্য বা নামের পার্থক্যের কথা বলছি না। স্বয়ং আল্লাহও এটাই বলেন আখেরী নবী স.-কে ডেকে ঃ

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِادْعُوا الرَّحْمٰنَ ط اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ج

"(হে রসূল! বলুন,) তোমরা প্রভুকে 'আল্লাহ' বলেই ডাকো বা 'রহমান' বলেই ডাকো কিংবা যে কোনো ভালো নামেই ডাকো (তাতে কিছুই এসে যায় না।) কেননা প্রভুত্ববোধক ভালো ভালো নামগুলো সবই তাঁর।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১১০

এতে দেখা যাচ্ছে, প্রভুকে শুদ্ধ, বুদ্ধ, রাম, রহীম, কৃষ্ণ, গৌর, হরি, গড, জিহবা, আল্লাহ, খোদা প্রভৃতি নামে ডাকায় কোনই দোষ নেই। যদি তা অজ্ঞাত অজাতক অসীম, অতুল, অজেয়, অজ্ঞেয়, অব্যয়, বেনজির, বেআয়িব, বেনিয়ায, নিগূঢ় শাশ্বত সত্য, স্বয়ংসম্পূর্ণ, হাইয়্যুল কাইয়ুম প্রভুকে লক্ষ করে ডাকা হয়। তাই বলে কি অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রামকে, কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধধনের পুত্র গৌতমকে, মামানী রাধা ও গোপিনীদের প্রেম বিলাসী কৃষ্ণকে, লবণ ব্যবসায়ীর পুত্র সাধু নানককে তেমন প্রভুর আসনে বসিয়ে পূজা দিলেও আল্লাহ বলবেন যে, তাতে কিছুই এসে যায় না। ওরা ওসব দেও-দৈত্য ভূত ও মানুষের নামে আমাকেই ডেকেছে ?..... আশ্চর্য।

www.pathagar.com

যাক আমরা ওসব শিরকীদের মতো প্রভুকে যেমন মরণশীল মানুষ বা ভূত পেত্নীর জাত রূপে পূজো দিতে রাজী নই তেমনি তাসাউফীদের মতো আল্লাহকে সোজাসুজি মানুষের আত্মা (নেপথ্যে মানুষ) বলতে সম্মত নই। জানি যে, তিনি সর্বতত্ত্ব ও সর্বরূপের স্রষ্টা কিন্তু নিজে তিনি অরূপ-অপরূপ। তিনি স্রষ্টা, সৃষ্টি জীবের মতো নন। তিনি প্রত্যেকেরই প্রেমময় প্রভু, তবে এরূপে লা শরীক রূপে বে-আয়িবরূপে। এর বাইরে পা বাড়ালেই পা-টা ভ্রান্তির গর্তে পড়ে ভেঙে যাবে সে ব্যক্তি যতো বেশী জানার ঝাঁকড়া চুলেই নাড়া দিক না কেন ?

আফসোস। বহু মুসলমানকেও গাইতে শুনি ঃ

'রাম' রহীম নাম জুদা না করো ভাই,
দীল কি সাচ্চা রাখজি।

'রাহীম' হচ্ছে আল্লাহরই একটি সিফাতী বা গুণবাচক নাম। আর 'রাম' হচ্ছে, আল্লাহরই সৃষ্ট একজন মানুষের নাম। তবু 'রাম' রাহীম নাম জুদা না করতে আমাদের দীলকে কি ভাবে সাচ্চা রাখবো ?

প্রাচীন ভারতের দ্বিমুখী সাধক (না হিন্দু না মুসলমান) তন্তুবায় কবির উক্ত গানটি রচনা করেছিলেন তাঁর হিন্দু মুসলমান শিষ্যদের মনোরঞ্জন বা বিভেদের উপর প্রহেলিকার প্রলেপ দিতে। অথচ এমন গোঁজামিলের গানটির সপক্ষেও তাসাউফীরা ভীষণ তরজমা পেশ করেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের মারেফতীর ঝোলাটা ঝেড়ে বেশী জানার খড়্গ নিয়ে তারা জিহাদে যাবেন দস্তুরমতো।

ফলত দার্শনিকতা বা তাসাউফ তথা মরমীবাদের মানে যা তা একটা বাণী বলা, যারে তারে খোদা মানা বা কাউকেই খোদা না মানা কিংবা উনত্রিশ কোটি বাজে খোদা মানার চেয়ে জঘন্য পতন আর হতে পারে না।

কোনো তার্কিক যদি বলেন যে, এক খোদার রাজ্যে এতো খোদাকে গজাতে না দিলেই হতো ? এতো উপাসকদের তিনি বোবা বানিয়ে দিলেই পারতেন। তদুত্তরে আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً ـ

"ইচ্ছে করলে আল্লাহ দুনিয়ার সব মানুষকে একই উম্মাত ভুক্ত করে গড়তে পারতেন। (ঈমানে বেশ কম হতো কেউ একতিল কিন্তু এতে কোনোই বৈচিত্র ছিল না)।"–সূরা আশ শূরা ঃ ৮

www.pathagar.com

সেই বৈচিত্রই হচ্ছে এ জগতের ধর্ম-অধর্ম, পুণ্য-পাপ, ভালো-মন্দ, আলো-আঁধার, সাদা-কালো, সুখ-দুঃখ, আর পরলোকের জান্নাত ও জাহান্নাম প্রভৃতি।

তবু যদি তোমরা (সব ভূয়া প্রভুর পূজা করো) একজোট হয়ে আমার বিরুদ্ধে লেগে যাও, ক্ষতি হবে তোমাদেরই ঃ

وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ز وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

"এতদসত্ত্বেও তোমরা যদি একজোট হয়ে আসো আমার প্রভুত্ব কেড়ে নিতে, আসমান ও যমীন হতে তা পারবে না। বরং সে অবস্থায় আমাকে ছাড়া তোমাদেরকে রক্ষা করার মতো কোনো বন্ধু বা সাহায্যকারীও পাবে না (তোমাদের পূজিত প্রভুরা থাকবে অনুপস্থিত)।"

–সূরা আনকাবুত ঃ ২২

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِئُوْنَ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا ق اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط

"(বেশ) মুসলিম, ইহুদী, খৃষ্টান, সাবেঈন, মজূসী, অংশীবাদী— আল্লাহ মীমাংসা করে দেবেন তাদের ধর্মীয় বিবাদ শেষ বিচারের দিন। (তোমরা কারা ছিলে খাঁটি পথে)।"–সূরা আল হাজ্জ ঃ ১৭

আল্লাহ পাক পরোওয়ারদিগারে আলম যে শুধু হাশরের বিচারের দিনই উত্তম ধর্ম কোনটা বলে দেবেন আর দুনিয়াতে সে কথা গোপন রেখেছেন তা নয়। লক্ষাধিক নবী-রসূল পাঠিয়ে সেই উত্তম ধর্মটা প্রচার করেছেন। ছোট বড় একশ চারখানা কিতাবে সেকথা ঘোষণা করেছেন। পাক কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ আছে ঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ـ

"নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন।"

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ـ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط

www.pathagar.com

"তিনি (আল্লাহই) তাঁর রসূলকে পাঠিয়েছেন এসব উপদেশ ও সত্য দীনসহ যেন তাকে বিজয়ী করতে পারেন সব ধর্মের উপর ফলত আল্লাহই সত্য প্রকাশে সর্বোত্তম। আর মুহাম্মদই (এ সত্যবাহক) রসূল।"–সূরা আল ফাতাহ্ ঃ ২৮-২৯

মুসলিম তাওহীদবাদী। ইহুদী দ্বিত্ববাদী। খৃস্টান ত্রিত্ববাদী। সাবেঈন-নক্ষত্র পূজারী। মজূসী-অগ্নিপূজারী। শিরকী-অংশীবাদী (বহু প্রভুর উপাসক বা হিন্দুজাতি)।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَعْلَمُوْنَ○

"(হে রসূল !) আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সার্বজনীন (পয়গাম্বর) করে, মানুষের জন্য সুসংবাদ বাহক ও সতর্ককারী রূপে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা বুঝে না।"–সূরা আস সাবা ঃ ২৮

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ○

"এটা (এ কুরআন) সমগ্র মানবজাতির জন্য বিজ্ঞপ্তি যে, তারা যেন হুশিয়ার হতে পারে (দীন সম্বন্ধে) এটার সাবধান বাণী দ্বারা এবং বুঝতে পারে যে, সত্যি আল্লাহই একমাত্র উপাস্য এবং যেনো সুপথ পায় হুশিয়ার লোকেরা।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ৫২

تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ○ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ○ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ○ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ○ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ○ وَاِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ○

"এ কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ (নিখুঁত সুসংবাদ) যদি (আমার নবী) আমার নাম দিয়ে রচনা করতেন এর কিছু কথা, তাহলে নিশ্চয় আমি ধরতাম দক্ষিণ হস্ত। অতপর কেটে দিতাম তার জীবন ধমনী। তখন কেউ রক্ষা করতে পারতো না তাঁকে আমার হাত হতে। সুতরাং কোনোই সন্দেহ নেই যে, এ কুরআন এক সুসংবাদ (আল্লাহর তরফ থেকে) আল্লাহভীরুদের জন্য।"

–সূরা আল হাক্কাহ ঃ ৪৩-৪৮

www.pathagar.com

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ج وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

"এতদসত্ত্বেও যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য দীনের অনুসরণ করবে কখনো তা তার থেকে গ্রহণ করা হবে না এবং পরলোকে সে হতভাগ্যদের দলভুক্ত হয়ে যাবে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৫

মহাগ্রন্থ আল কুরআনের এসকল সতর্কবাণী ও সত্যপ্রচার সত্যসন্ধানী মানুষকে যুগ যুগ ধরে পথ প্রদর্শন করেছে এবং যারা সত্যধর্ম ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তুলনামূলক গবেষণা শুরু করেছেন তাঁরাই পরিশেষে ইসলামের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছেন। অতীত থেকে আজ পর্যন্ত এর ভুরি ভুরি প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। আধুনিক কালের এ ধরনের উল্লেখ্যযোগ্য ব্যক্তিত্বের মধ্যে বাংলাদেশের ইসলাম প্রচার সমিতির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মরহুম আবুল হোসেন ভট্টাচার্য, ইসমাঈল হোসেন দিনাজী (ব্রাহ্মণের ছেলে), বৃটেনের প্রখ্যাত পপসঙ্গীত গায়ক ইউসুফ ইসলাম (ক্যাট স্টিভেনস), জাপানী বিজ্ঞানী মিঃ কুট (আনুমানিক ১৯৭৬ সালে সিরাজগঞ্জ কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত) ভূতপূর্ব রোমান ক্যাথলিক বিশপ অধ্যাপক আবদুল আহাদ দাউদ বিডি, ফরাসী বিজ্ঞানী মরিস বুকাইলী ও এ্যালেস্টার ডি প্যানেল (অঘোষিত), ম্যানিলায় আমেরিকার খৃস্টান মিশনের প্রধান ডক্টর দীলু সান্ত (১৯৮৩, এপ্রিল) এবং ভারতের প্রখ্যাত নওমুসলিম ডঃ শিবশক্তি স্বরূপজী ও তার পরিবারের সদস্যদের নাম বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। ডঃ শিবশক্তির সপরিবারে ইসলাম গ্রহণের সংবাদ বাংলাদেশের দৈনিক ইত্তেফাক (সচিত্র), দৈনিক সংগ্রাম ১৬/৫/৮৭ ও ১৭/৫/৮৭, গুজরাট থেকে সাপ্তাহিক শাহিন ১/৩/৮৭, দিল্লি থেকে সাপ্তাহিক উর্দু নঈ দুনিয়া ১০/২/৮৭ এবং বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত দৈনিক ইনকিলাব ২০/২/৮৭ প্রকাশ করে। নও মুসলিম জনাব ইসমাঈল হোসেন দিনাজী সাহেব একটু বিস্তারিতভাবে ডঃ শিবশক্তির পরিচিতি দিয়ে "দেবালয় থেকে বের হয়ে এসেছে কাবার প্রহরী" শিরোনামে তাঁর সপরিবারে ইসলাম গ্রহণের ঘটনা দৈনিক সংগ্রামের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১৬ ও ১৭ই মে ১৯৮৭ বেশ সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক জনাব মুহিউদ্দীন খান ভারতের অধিবাসী ডঃ শিবশক্তির সপরিবারে ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বলতে গিয়ে ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেছেন এজন্য যে, ডঃ শিবশক্তির সপরিবারে এ ধর্মান্তর কোনো আবেগজড়িত হয়ে আকস্মিক-ভাবে নয় বরং দীর্ঘদিন ধরে চিন্তা গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি

www.pathagar.com

এ সত্য গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন। তা প্রমাণের জন্যই ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ সাংবাদিক জনাব মুহিউদ্দীন খানের ভূমিকাসহ ডঃ শিবশক্তির সাথে সাংবাদিকদের সাক্ষাতকারটি নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

আজকাল বিশাল ভারত ভূমির সর্বত্র চলছে হিন্দু পুনরুত্থান আন্দোলনের এক প্রলয়ংকরী পাশব হত্যা। একমাত্র হিন্দু পৌত্তলিকতা ছাড়া এ বিরাট দেশটা থেকে অন্য সব ধর্মমতের উচ্ছেদ সাধনই এ পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনের ঘোষিত লক্ষ। কিন্তু এর মধ্যে আবার ইসলাম এবং মুসলমানদের প্রতিই আন্দোলনকারীরা সবচেয়ে বেশী খড়গহস্ত। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত শুধুমাত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধেই নৃশংস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পরিচালিত হয়েছে পনেরো হাজারেরও বেশী। এ ছাড়া মসজিদ জবরদখল করে মন্দির বা অন্যান্য ধর্মস্থানে রূপান্তরিত করা, মুসলিম ইতিহাসের বিকৃতি সাধন এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে একেবারেই পঙ্গু করে দেয়ার নিলর্জ্জ প্রচেষ্টাও চলছে অব্যাহত গতিতে। ফলে আজকের বিশাল ভারতভূমির মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশেরও বেশী সংখ্যক নাগরিক তাওহীদবাদী মুসলমানগণ একটা সার্বক্ষণিক আতংক ও হতাশার মধ্যে বসবাস করে ক্রমেই জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলতে বসেছে।

বিশ্ব হিন্দুপরিষদ ও এর অঙ্গ সংগঠগুলোর অব্যাহত আগ্রাসী তৎপরতার পাশাপাশি অবশ্যই পুনরজ্জীবন বাদী উগ্র হিন্দুদের আশংকাজনক অপতৎপরতার মধ্যে অবস্থান করেই একদল মুসলমান বিশ্বব্যাপী ঈমানের দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়ার সাধনাতেও আত্মনিবেদিত রয়েছেন। দিল্লির বস্তী নিযামুদ্দীনের একটা মসজিদ থেকে পরিচালিত সেই দাওয়াতী আন্দোলন আজ সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। সে আন্দোলনের গতিবেগ সৃষ্টি করেছে আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভীর ক্ষুরধার লেখনী ও তাঁর অনুসারীগণের দ্বারা পরিচালিত অব্যাহত কলমের জিহাদ।

জাহান্নাম সদৃশ প্রতিকূল পরিবেশে দাঁড়িয়ে এসব নিবেদিতপ্রাণ আল্লাহর বান্দারা দীন ইসলামের সঞ্জীবনী সুধা পরিবেশন করে চলেছেন অতুলনীয় ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে। ফলে, হিন্দু পুনরুত্থানের তাণ্ডবগ্রস্ত ভারতের বুকেই আজ ঘটতে শুরু করেছে মুসলমানদের সেই প্রথমিক দিনগুলোর মতোই কিছু অলৌকিক ঘটনাবলী। এসব অলৌকিক ঘটনা একদিকে যেমন আজ কের সংশয়বাদী ও অবিশ্বাসীদের চোখ থেকে তথাকথিত যুক্তি ও বুদ্ধির পর্দা সরিয়ে দিচ্ছে, তেমনি অন্য দিকে ইংগিত দিচ্ছে খোদ, বৈরী-ভারত ভূমিতেই আসন্ন একটি নতুন বিপ্লবের অনিবার্যতার প্রতি।

www.pathagar.com

সম্প্রতি বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত অনেকগুলো আশ্চর্য ঘটনারাজীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনাটি হচ্ছে হিন্দু ধর্মের একজন শীর্ষস্থানীয় ধর্মগুরুকে খোদ রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক স্বপ্নযোগে ইসলামের দাওয়াত প্রদান এবং সে দাওয়াতের দ্বারা বিস্ময়াভিভূত হয়ে সে ধর্মগুরুর সপরিবারে ইসলাম গ্রহণ।

ভদ্রলোকের নাম ডক্টর শিবশক্তি স্বরূপজী মহারাজ ধর্মাচার্য আদ্যশক্তিপীঠ। মথুরার এক কুলীন আচার্য ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা ছিলেন বৃন্দাবনের এক বিরাট আশ্রমের অধিপতি। প্রাথমিক শিক্ষা পিতার যত্নে আশ্রমের পরিবেশে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওরিয়েন্টাল স্টাডিজে এম. এ ডিগ্রি লাভ করার পর দীর্ঘ আট বছর লণ্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথিবীর প্রধান দশটি ধর্মমত সম্পূর্ণ তুলনামূলক গবেষণা করে প্রথমে ডঃ অব ডিভাইনিটি এবং পরে ওরিয়েন্টাল স্টাডিজে পি. এইচ. ডি লাভ করেন।

ডঃ শিবশক্তির অপূর্ব মেধা এবং বিশ্লেষণ শক্তি লক্ষ করে খৃস্টান ধর্মগুরু পোপ তাঁকে আকর্ষণীয় একটি বৃত্তি দিয়ে খৃস্টধর্মের প্রধান কেন্দ্রস্থল ইটালীর ভ্যাটিকান সিটিতে নিয়ে যান, সেখানে তাঁকে ভ্যাটিকানের নাগরিকত্বও প্রদান করা হয়। খৃস্টধর্মে আকৃষ্ট করার জন্য অনেক প্রলোভনও দেখানো হয়। কিন্তু ডক্টর শিবশক্তির ভাষায় "এক নিরাকার স্রষ্টার ধারণা থেকে বিচ্যুত খৃস্টদর্শনের প্রতি পৌত্তলিক হিন্দুদের পক্ষেও আকৃষ্ট হওয়ার মতো কিছু আছে বলে আমি মনে করি না। কারণ, খৃস্টানদের ত্রিত্ববাদ হিন্দুদের বহু ঈশ্বরবাদের তুলনায় আদৌ কোনো উৎকৃষ্ট মতাদর্শ নয়। তাই ধর্মের সপক্ষে কয়েকটি বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়ে পোপ সেখানকার সর্বোচ্চ সম্মান ও এফএম কাপ প্রদান করেও আমাকে ধরে রাখতে পারেননি।"

দেশে ফিরে আসার পর সর্বোচ্চ হিন্দু ধর্মীয় বিদ্যাপীঠ কাংড়া থেকে তাঁকে ধর্মাচার্য উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং তিনি মথুরার অন্তপাতি বৃন্দাবন আশ্রমের প্রধান পরিচালক রূপে সংবর্ধিত হন। এ ছাড়াও বোম্বে এবং দেওয়ালনে অবস্থিত আন্তর্জাতিক মানের আরো দুটি আশ্রমের প্রধান আচার্য রূপে দায়িত্ব পালন করতে শুরু করেন।

অন্তত বারোটি ভাষায় সুপণ্ডিত ডঃ শিবশক্তি ছিলেন যেমন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের একজন প্রথম শ্রেণীর নেতৃপুরুষ তেমনি সমসাময়িককালের জগৎগুরু শঙ্করাচার্য, রাম গোপাল শালওয়ালা, পুরীর মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী, গুরু গোলওয়ালকার বাবা সাহেব, দেশসুখ বাল ঠাকুর, অটল বিহারী

www.pathagar.com

বাজপেয়ী এবং আচার্য বিনোবাভাবের সাথে ছিল তাঁর অত্যন্ত নিকট সম্পর্ক। সমকালীন হিন্দু ধর্মীয় পণ্ডিতবর্গ ও ধর্মগুরুগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিদ্বান ও মেধাবী বলে স্বীকৃত ডঃ শিবশক্তি ছিলেন সবারই বিশেষ স্নেহ ও প্রীতিভাজন। তাঁর অপূর্ব মেধা ও কর্মশক্তি দেশের উচ্চশিক্ষিত সমাজ ও পাশ্চাত্যে হিন্দুধর্ম প্রসারে বিশেষ অবদান রাখবে বলে সবাই ছিলেন নিতান্ত আশাবাদী।

ইসলামের প্রতি তিনি কিভাবে আকৃষ্ট হলেন। এ প্রশ্নের জবাবে ডঃ শিবশক্তি বলেন ঃ সে এক বিস্ময়কর ঘটনা। এ যুগের বস্তুবাদী মন-মানসের আত্মার জগত সম্পর্কে যাদের কোনো ধারণাই নেই, তাদের পক্ষে সে ঘটনা হয়ত বিশ্বাস করাও সম্ভব নয়। অথচ এমন একটা অবিশ্বাস্য ঘটনাই যে বাস্তবে ঘটেছে তার জীবন্ত সাক্ষী তো আমি নিজে। আমি ছিলাম এদেশের অর্ধ শ'কোটি হিন্দুজনতার পরম ভক্তিভাজন শীর্ষস্থানীয় একজন ধর্মগুরু। ওরা ধর্মাচার্য ভগবান বলে ডাকতো। অপরদিকে এ দেশের সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে মুসলমানদের অবস্থান কোথায়, তা তো কারো অজানা নয়। অবস্থানগত আকাশ এবং পাতালের পার্থক্যটা বুঝবার মতো মেধা কি আমার ছিল না। কিন্তু তারপরও যে আমি কেনো এবং কেমন করে 'ভগবানের' সোনার সিংহাসন স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়ে এ কণ্ঠকাকীর্ণ মাটির পৃথিবীতে সাধারণ মানুষের কাতারে এসে দাঁড়িয়েই এ রহস্যের পর্দা উন্মোচন করতে গিয়ে আবেগে উদ্বেলিত হয়ে পড়ি। বুঝি না কেমন করে ঘটল এমন একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা।

অক্সফোর্ডে পাঠ্যাবস্থায় তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে পড়াশুনা করার সময়েই পবিত্র কুরআন পাঠ করার আমি সুযোগ লাভ করেছিলাম। ইসলাম ধর্মকে তার মূল উৎস থেকেই জানবার লক্ষে ইতিপূর্বে আমি আরবী ভাষা বেশ ভালোভাবেই শিক্ষা করেছিলাম। যেমন শিক্ষা করেছিলাম হিন্দুধর্মের আদি গ্রন্থাদি পাঠ করার লক্ষে সংস্কৃত, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ পাঠ করার লক্ষে পালি এবং খৃস্টধর্ম গ্রন্থাদি পাঠ করার লক্ষে প্রাচীন গ্রীক ভাষা।

গভীর মনোযোগসহ কুরআন পাঠ করার সময় থেকেই আমার মনোরাজ্যে অনেকটা বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। যে বিদ্বেষের আগুন মনে নিয়ে পাঠ শুরু করেছিলাম তা যে ধীরে ধীরে নির্বাপিত হয়ে গিয়েছিল তাই নয়, বরং তদস্থলে আমার মনে ভক্তি ও শ্রদ্ধার একটা ফল্গুধারা বইতে শুরু করেছিল। কিন্তু নিজের ধর্মমত সম্পর্কে আমার ভক্তি ও বিশ্বাসে তখনও পর্যন্ত কোনো ফাটল সৃষ্টি হয়নি। বরং পূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্যের অনুভূতি নিয়ে আমি আমার কাজ করে যাচ্ছিলাম।

www.pathagar.com

প্রচুর বিত্ত এবং ভক্ত পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতাম। বিশাল এ ভারত ভূমিকে অখণ্ড রামরাজত্বে রূপান্তরিত করার স্বপ্নে বিভোর হিন্দু নেতৃত্বের সাথে আমার ভূমিকা মোটেই পশ্চাদপদ ছিল না।

১৯৮৪ সালের জানুয়ারী মাস। একরাতে আমি এবং আমার বিদূষী স্ত্রী পাশাপাশি কামরায় শায়িত। গভীর রাতে স্বপ্নে দেখলাম, বিরাট একদল লোক আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটতে লাগলাম। ছুটতে ছুটতে এক জায়গায় গিয়ে হোচট খেয়ে পড়ে গেলাম। ভয়ে ত্রাসে তখন আমার গলা শুকিয়ে গেছে। আশপাশে এমন কাউকেই দেখতে পেলাম না যে আমাকে একটু সাহায্য করতে পারে। এমন সময় অদৃশ্য দুটি হাত যেনো আমাকে তুলে দাঁড় করালো। চেয়ে দেখলাম, দিব্যকান্তি বিশিষ্ট এক মহাপুরুষ আমার সামনে দাঁড়ানো। আমি কিছুক্ষণ অবাক দৃষ্টিতে সেই আলো ঝলমল চেহারাটির দিকে চেয়ে রইলাম। মনের ভিতর থেকে সমস্ত ভয় ত্রাস যেনো মুহূর্তে দূর হয়ে গেলো।

আমার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ বিহবল দৃষ্টি লক্ষ করে পাশেই দাঁড়ানো অন্য এক ব্যক্তি বললেন, তুমি একে চিনতে পারছো না ? ইনিই তো হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা স.। আমার হৃদয়-মনে তখন এক অদ্ভূত অনুভূতির সঞ্চার হয়ে গেছে। ভাবতে পারছিলাম না, আমি কি করবো। এমন সময় তিনি পবিত্র হাত বাড়িয়ে আমার ডান হাতটি ধরলেন এবং বললেন, কালেমা পড়। এ বলে তিনি কালেমা পাঠ করতে লাগলেন। আমিও তাঁর পবিত্র কণ্ঠ অনুসরণ করে কালেমা পড়তে লাগলাম। কালেমা পড়া সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করলেন। এবং স্নেহ মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন যাও এবার দেশের লোকজনকে গিয়ে কলেমা পড়াও। আমার এ পবিত্র স্বপ্ন কতক্ষণ স্থায়ী ছিলো বলতে পারবো না। তবে চোখ যখন খুলল, তখন রাত তিনটা। আরো আশ্চর্যের বিষয় যে, ঠিক একই সময়ে একই স্বপ্ন আমার স্ত্রীও দেখলেন। দুজনে মিলে যখন একে অপরের নিকট স্ব স্ব স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করছিলাম, তখন আমাদের দুজনেরই মনের বীণায় যেন অদ্ভূত এক ঝংকার বেজে উঠলো। আমরা নিজেদেরকে প্রথম যুগের মুসলমান রূপে কল্পনা করতে লাগলাম। মনে হতে লাগলো, এদেশে সাহাবীগণের সেই সোনালী যুগ ফিরিয়ে আনার সাধনাতেই আমাদেরকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। তা ছাড়া মনের মধ্যে এমন একটা প্রত্যয় জন্ম লাভ করলো যে, খুব শিগগিরই সমগ্র দুনিয়াতে একটা নতুন বিপ্লব সৃষ্টি হবে। আর সে বিপ্লবের একজন নগণ্য কর্মীরূপে কাজ করার জন্য বোধহয় মহান আল্লাহ আমাকেই কবুল করেছেন।

www.pathagar.com

পরদিন থেকেই আমি "ধর্মগুরু ভগবানের" সুউচ্চ আসন চূড়া থেকে নেমে এসে মাটির মানুষের সাথে একজন সাধারণ মানুষরূপে গণ্য হওয়ার সাধনায় আত্মনিয়োগ করলাম। যদিও আমি, আমার স্ত্রী ও একমাত্র কন্যা তখন পরিপূর্ণ মুসলমান তবুও আমার উপর তিন তিনটি আশ্রম এবং সংগঠনের যেসব দায়-দায়িত্ব অর্পিত ছিলো, সেগুলো গুছিয়ে অন্যের নিকট বুঝিয়ে না দেয়া পর্যন্ত প্রকাশ্যে মুসলমানরূপে পরিচিত হলাম না। অবশেষে এই প্রতিক্ষিত দিনটিও এলো। ১৯৮৫ সনের রমযানের চাঁদ উদিত হওয়ার প্রাক্কালে স্ত্রী এবং কন্যাকে নিয়ে আমি অধিকতর পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে আলেম বুযুর্গগণের শহর ভূপালে চলে এলাম। এখানে ১০ মে তারিখে অর্থাৎ যেদিন রমযানের চাঁদ দেখা দিলো, সেদিনই প্রকাশ্যে সপরিবারে ইসলামের কালেমা পড়ে নিলাম। বর্তমানে আমি ভূপালেই বাস করছি। আমি একজন দক্ষ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রী। ১০ নীলম কলোনিতে একটি আর্য়ুবেদী ঔষধালয় পরিচালনা করে জীবিকা নির্বাহ করছি। আমার বর্তমান নাম ইসলামুল হক, স্ত্রীর নাম খাদীজা কন্যার নাম আয়েশা।

বহু পুরাতন বন্ধু আমার নিকট পত্র লেখেন। কেন আমি এমন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগুরুর মর্যাদা ছেড়ে মুসলমান হলাম, তাদের ভাষায় নিজেকে বিপদের মধ্যে এনে ফেললাম, সে সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। আমি তাঁদের সেসব সহানুভূতিপূর্ণ পত্রের জবার দেই। বলি আমি আমার সৃষ্টিকর্তাকে চিনতাম না, জানতাম না। আল্লাহ পাক অনুগ্রহ করে আমাকে তাঁর পিয়ারা হাবীব স.-এর মাধ্যমে হেদায়াত দান করেছেন। তাঁর পরিচয় লাভ করার সুযোগ দিয়েছেন। এ অপূর্ব অনুগ্রহের আমি অবশিষ্ট শোকর সমগ্র জীবনেও করে শেষ করতে পারবো না। কোনো কোনো সময় মনে হয়, আমিই এদেশের সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। শুধু ঈমানের দৌলত লাভ করে আমি যে আত্মিক তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করেছি, সাত আসমানের বাদশাহী পেলেও বোধহয় এত সুখ এত তৃপ্তি লাভ করা সম্ভব হতো না।

ডঃ ইসলামুল হক ভারতীয় মুসলমানদের ঘোর সংকটময় এক দুর্দিনে স্বদেশের আগ্রাসী হিন্দু সমাজের মর্যাদাপূর্ণ ধর্মগুরুর পদ ছেড়ে মজলুম মুসলমানদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর নিজের ভাষায়, "ছিলাম ভগবান, এখন মানুষ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।" তিনি এখন শুধুমাত্র একজন নিরীহ সরল সোজা মুসলমানই নন, তাঁর নিজের কথায় সেই প্রাথমিক যুগের সোনালী দিনগুলো ফিরিয়ে আনার নিবেদিত প্রাণ একজন প্রচারকর্মীর ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর মত একজন

www.pathagar.com

বিরাট ব্যক্তিত্বের ইসলাম কবুল করা সম্পর্কে আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভীর মন্তব্য হচ্ছে ঃ "ডঃ ইসলামুল হক এ যুগের ভারতীয় মুসলমানদের জন্য রসূলে মাকবুল স.-এর তরফ থেকে একটি তোহফা বিশেষ।" দারুল উলুম দেওবন্দের মন্তব্য হচ্ছে, "দেবালয় থেকে বের হয়ে এসেছে পবিত্র কাবার প্রহরী।"

ডঃ ইসলামুল হককে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, "মুসলিম উম্মাহর জন্য আপনার কোনো পয়গাম থাকলে বলুন।"

তিনি জবাব দিয়েছেন ঃ এ প্রশ্নের জবাবে আমি ইঞ্জিল থেকে একটি উদ্ধৃতি পেশ করতে চাই। তা হচ্ছে একদিন সকাল বেলায় হযরত ঈসা আ. তাঁর কিছু অনুসারীর সাথে মিলিত হওয়ার মানসে গলীল হ্রদের পানির উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। এ আশ্চর্যজনক দৃশ্য লক্ষ্য করে তাঁর অনুসারীরা তাঁকে ধরে বসলেন। তারা বললেন, হুযুর! আমরাও কি এমনিভাবে পানির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারবো ? হযরত ঈসা আ. জবাব দিলেন, "পারবে, তবে শর্ত হচ্ছে শুধুমাত্র আমার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে। দৃষ্টি একটু এদিক সেদিক হয়ে গেলেই তোমরা ডুবে যাবে।"

অনুসারীগণ তাই করলেন। অর্থাৎ হযরত ঈসা আ.-এর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে পানির উপর দিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়ে গেলো। ভাবতে লাগলেন, সত্য সত্যই কি আমরা পানির উপর দিয়ে যাচ্ছি, না মাটির উপর দিয়ে। এরূপ সন্দেহের সৃষ্টি হওয়ার পর তারা দৃষ্টি হযরত ঈসার দিক থেকে যেই একটু সরিয়ে পায়ের দিকে নিলেন, তখনই হ্রদের অথৈ পানিতে তলিয়ে গেলেন।

আলমে ইসলামের প্রতি আমার আবেদন, এ সংসার সমুদ্র পাড়ি দেয়ার জন্য আল্লাহর আখেরী রসূল স. ও আমাদের জন্য এ নির্দেশই দিয়ে গেছেন যে, একমাত্র তাঁর পবিত্র পদচিহ্ন লক্ষ করেই আমাদেরকে অগ্রসর হতে হবে। দৃষ্টি যদি সেখান থেকে একটু এদিক-সেদিক সরে যায়, তবে আমাদের পক্ষে দুনিয়ার অথৈ সাগরে হারিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। তাই বলি, এখনও সময় আছে এখন যদি আমরা হুযুর স.-এর দেখানো পথে দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ করতে পারি, একমাত্র তাঁর আদর্শ অনুসরণ করেই অগ্রসর হওয়ার সংকল্পে অটল হই তবে সাফল্য সুনিশ্চিত।

মুসলমানের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহর রসূল স. এরশাদ করেছেন, "মুসলমান খাঁটি সোনার সেই টুকরাটির মতো যেটিকে আগুনে জ্বালিয়ে পাকা করা হয়েছে। অতপর এর ভিতর যেমন ময়লার অস্তিত্ব

www.pathagar.com

থাকতে পারে না বা কোথাও ফেলে রাখলে ময়লা আবর্জনা তার ঔজ্জ্বল্য বিনষ্ট করতে পারে না, তেমনি খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তি যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন তাঁর ঔজ্জ্বল্য অন্য কোনো কিছুর সংস্পর্শেই ম্লান হতে পারে না।"

অন্যত্র এরশাদ করেছেন, "মুসলমান মধু মক্ষিকার মত। সুন্দর ও সুগন্ধিযুক্ত পবিত্র ফুলের উপর বসেই সে মধু আহরণ করে। কোনো নোংরা অপবিত্রতার মধ্যে সে সাধারণত বসে না। আহরিত মধু সে নিজেও যেমন খায়, তেমনি অন্যকেও তা দ্বারা তৃপ্ত করে।"

মুসলমানদের প্রাথমিক যুগের সেই সোনালী দিনগুলো ফিরিয়ে আনার যে বাসনা আপনি মনে মনে পোষণ করেন, তা অর্জন করার জন্য আপনার ধারণায় কি কোনো কার্যকর কর্মসূচী আছে ? এ প্রশ্নের জবাবে ডঃ ইসলামুল হক বললেন, মুসলমানদের সেই আদর্শ প্রথম শতাব্দিটি পুনরায় দেখার আকাংখা সর্বযুগের মুসলিম শাসকগণই অন্তরের মণিকোঠায় পোষণ করে এসেছেন। এ যুগের সকল মুসলমানগণও অতীতের সে উত্তরাধিকার পরম যত্নে বহন করেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যেক মু'মিনের অন্তরেই সে পবিত্র আকাংখার বীজ সুপ্ত রয়েছে। শুধুমাত্র কিছু কায়েমী স্বার্থ সেটি বাস্তবায়িত হতে দিচ্ছে না।

এ যুগে যদি আমরা সেই আকাংখিত দিন ফিরিয়ে আনতে চাই তবে ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ কর্মীদের নতুন সংকল্প এবং কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে। অত্যন্ত দুঃসাহসের সাথে তাঁদেরকে বেলাল রা.-এর হিম্মত ও অধ্যবসায় সহকারে ময়দানে আসতে হবে। এ যুগের মুসলমানগণও যদি সাহাবীগণের আদর্শ নিয়ে জীবন যাপন শুরু করেন, তবে এর সুফল শিগগিরই চারদিকে লক্ষণীয় হয়ে উঠবে।

মুসলিম সমাজের জন্য এখন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী হচ্ছে, প্রকৃত মু'মিনসুলভ ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করার সাধনায় আত্মনিয়োগ করা। এ জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে, মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ও সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠা। তিন দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে এ কাজের সূচনা করা যায় বলে আমার ধারণা, আর তা হচ্ছে ঃ

ক. ইসলাম বিরোধী সকল শক্তি ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে পূর্ণ সতর্কতা সৃষ্টি করা।

খ. মুসলমানদের ইহজাগতিক সকল ক্রিয়াকর্মের মধ্যে দীনের প্রাধান্য এবং দীনি অনুশাসনের ভিত্তিতে জীবন যাপন করার প্রেরণা সৃষ্টি করা।

www.pathagar.com

গ. দেশ ও জাতি নির্বিশেষে সমগ্র মানব সমাজকে তাদের ভাষায় এবং বোধগম্য পন্থায় আল্লাহর দীনের দাওয়াত দিতে থাকা।

আগেই আমি উল্লেখ করেছি যে, খোদ হুযুর স. কর্তৃক আমার মতো এক নগণ্য মানুষকে দীনের দাওয়াত দেয়ার ঘটনা থেকেই আমার মনে এরূপ প্রত্যয় সৃষ্টি হয়েছে যে, খুব শিগগিরই দুনিয়ার বুকে নতুন কোনো বিপ্লব আসন্ন। সুতরাং মুসলিম উম্মাহকে আজ সে বিপ্লবের পদধ্বনি শোনার জন্য মানসিক প্রস্তুতি অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

উল্লেখ্য ডঃ শিবশক্তির এ ভবিষ্যদ্বাণী ইতিমধ্যেই তানজানিয়াতে বাস্তবায়িত হয়ে গেছে। তানজানিয়ার স্বৈরাচারী খৃষ্টান রাষ্ট্রপ্রধান আফ্রিকা মহাদেশে মুসলিম নিধনে মেতে উঠেছিলেন। উগাণ্ডার মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান প্রতাপশালী ইদি আমিনকে শুধু উৎখাত করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, সামরিক বাহিনী মার্চ (March) করিয়ে তিনি উগান্ডার লাখ লাখ মুসলমানকেও নির্মমভাবে হত্যা করেন। তার তাণ্ডবলীলায় গোটা আফ্রিকায় ভীতিপ্রদ অবস্থা বিরাজ করছিল। আল্লাহর শান বুঝা বড় দায়, এ মুসলিম বিধ্বংসী জুলিয়াস নায়ারই এখন একান্ত অসহায় অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু কেউ তাকে জোর করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেনি। বরং অত্যন্ত অসহায় হয়েই স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে গত ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে। এ ঘটনা পাকিস্তানের করাচী থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "তাকবীর"-এর ১৪ এবং বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত দৈনিক সংগ্রামে সচিত্রে ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ সংখ্যায় ফলাও করে "যে বিস্ময়কর খবরটি আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যম চাপা দিয়েছিল" শিরোনামে প্রচার করে। এর থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে আপনাদের খেদমতে পেশ করা হলো।

আফ্রিকা মূলত একটি মুসলিম মহাদেশ। এ বিরাট ভূখণ্ডটির মোট জনসংখ্যা বর্তমানে ছাব্বিশ কোটির কিছু বেশি। এর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ষোল কোটি। মাত্র আড়াই কোটি খৃস্টান। খুব স্বল্প সংখ্যক ইহুদীও এ মহাদেশে বসবাস করে। অবশিষ্ট সাড়ে সাতকোটি লোক প্যাগান। এসব অশিক্ষিত ও প্রায় অসভ্য পৌত্তলিকেরা সাধারণত নাগরিক জীবন থেকে দূরে বনজঙ্গল ঘেরা প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে বাস করে।

মুসলিম বিশ্বের পতন এবং খৃস্টবাদী ইউরোপের নবজাগরণের ফলে গত তিনশ বছর ঔপনিবেশিক নির্যাতনে সর্বাপেক্ষা বেশি পর্যুদস্ত হয়েছে আফ্রিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণ। শক্তিমদমত্ত ঔপনিবেশিক খৃস্টানরা সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশকে পদানত করে শুধু যে বিপুল প্রাকৃতিক

www.pathagar.com

সম্পদই লুণ্ঠন করেছে তাই নয়, পরাজিত ও পর্যুদস্ত আফ্রিকাবাসীদেরকে ওরা বন্য পশুর মত ধরে নিয়ে গেছে। অকল্পনীয় অত্যাচার-নির্যাতন করে এসব লোককে দাসবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছে। তারপর গৃহপালিত পশুর মতোই এদেরকে বিক্রি করেছে আমেরিকা এবং ইউরোপের হাট-বাজারে। আজকের দক্ষিণ আমেরিকার বিপুলসংখ্যক কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিক ঐ সমস্ত হতভাগ্যদেরই উত্তর পুরুষদেরই উত্তরপুরুষরূপে ইদানিংকালে চিহ্নিত হচ্ছে।

বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে যখন এশিয়া ও আফ্রিকার দেশে দেশে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে শিকল ছেঁড়ার আন্দোলন শুরু হয়, তখন থেকে পাশ্চাত্যের খৃস্টান শক্তি মহাদেশটিকে নতুন করে ধর্মের শিকলে বেঁধে রাখার লক্ষ নিয়ে আফ্রিকার জনগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহে খৃস্টধর্ম প্রচার শুরু করে। সমগ্র মহাদেশটিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, আশ্রয় কেন্দ্র প্রভৃতি রকমারি জাল বিস্তার করার পাশাপাশি শক্তি প্রয়োগ করেও লোকজনকে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করার অপপ্রয়াস চলতে থাকে। অপরদিকে ঔপনিবেশিকতাবাদের মরণ ঘন্টা বেজে ওঠার পর অনেকগুলো মুসলিম অধ্যুষিত দেশে সংখ্যালঘু খৃস্টানদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা তুলে দিয়ে পর্দার আড়াল থেকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোই দেশগুলোতে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে থাকে।

ধর্ম প্রচারের নতুন ফাঁদ নিয়ে আবির্ভূত পাশ্চাত্যের খৃস্টান উপনিবেশ-বাদীদের পিছনে যেমন যোগান দেয়া হচ্ছে অকল্পনীয় অর্থবিত্ত তেমনি এদের অবস্থান দৃঢ় করে রাখার লক্ষে অব্যাহত সমর্থন দেয়া হচ্ছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির নানা কূটকৌশল দ্বারা। ফলে অসাধারণ শক্তির অধিকারী খৃস্টান মিশনারীদের মুকাবিলায় আফ্রিকার অসহায় দরিদ্র মুসলমানগণের পক্ষে নিজেদের আদর্শ নিয়ে টিকে থাকাই প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তারপরও নিবেদিত প্রাণ একদল আলেম শুধুমাত্র আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করেই অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে মিশনারীদের মুকাবিলা করে যাচ্ছে। লক্ষ করার মতো বিষয় হচ্ছে এই যে, পার্থিব উপায় উপকরণে প্রায় শূন্যহস্ত এসব নিষ্ঠাবান আলেমের প্রচেষ্টায় ইদানিংকালে শুধুমাত্র যে খৃস্টান প্রচারকদের আগ্রাসী অগ্রগতিই অনেকাংশে প্রতিহত হয়েছে তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে উদ্ধত খৃস্টান শক্তির বিগত তিনশ বছরের বিরাট সাফল্যের ইমারতও ধসে পড়ার উপক্রম হয়েছে।

বর্তমান আফ্রিকার খৃস্টান এবং মুসলিম শক্তির মধ্যে প্রচলিত ক্রুসেড যুদ্ধের এক বহুল আলোচিত মর্দে মুজাহিদ হচ্ছেন শেখ আহমদ দীদাত।

www.pathagar.com

দক্ষিণ আফ্রিকার এ ব্যক্তিটি পাকিস্তানের অধিবাসী এবং জন্মসূত্রে ভারতীয়। উনিশ শতকের বৃটিশ ভারতের খৃস্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে সফল বিতর্ককারী আলেম ও বাইবেল বিশেষজ্ঞ মওলানা রহমাতুল্লাহ কিরানভীর বাইবেলও খৃস্টবাদের বিরুদ্ধে লেখা অমর গ্রন্থ 'ইয্হারুল হক' থেকে তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে তিনি খৃস্টান শক্তির মুকাবিলায় একজন যোদ্ধারূপেও আবির্ভূত হলেন।

আহমদ দীদাত দীনী ইলমের পাশাপাশি খৃস্টধর্মশাস্ত্রেও একজন মহাজ্ঞানী ব্যক্তি। তাই তিনি খৃস্টান প্রচারকদেরকে প্রকাশ্য চালেঞ্জ প্রদান করে থাকেন। এ পর্যন্ত তাঁর সাথে তর্কযুদ্ধে যারা অবতীর্ণ হয়েছে তারা সবাই শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছে। এদের অনেকেই আবার তাঁর দাওয়াতে আকৃষ্ট হয়ে ইসলামেও দীক্ষিত হয়েছে।

শেখ আহমদ দীদাত তাঁর এ নতুন ক্রুসেড সফলভাবে মুকাবিলা করার লক্ষে ইতিমধ্যেই সহযোদ্ধার একটি মযবুত বাহিনীও গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তার হাতে গড়া এসব প্রচারকেরা ইতিমধ্যেই আফ্রিকার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছেন। খৃস্টান মিশনারীরা নিরীহ সরল প্রাণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেসব কৌশল প্রয়োগ করে শেখ আহমদ দীদাতের শিষ্য সাগরেদগণ সেসব কলা-কৌশল সম্পর্কে শুধু ওয়াকেফহালই নন বরং সে একই অস্ত্র কি করে বিরুদ্ধবাদীদের উপর প্রয়োগ করতে হয় সে ব্যাপারেও অত্যন্ত পারদর্শিতার পরিচয় দিচ্ছেন। ফলে সমগ্র আফ্রিকাতেই এ দলটি এখন খৃস্টান শক্তির জন্য একটা মারাত্মক আতঙ্কের বস্তুতে পরিণত হয়ে গেছে।

শেখ আহমদ দীদাতের শিষ্যগণের প্রচেষ্টাতেই পূর্ব আফ্রিকার একটা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ তানজানিয়া স্বৈরাচারি খৃষ্টান একনায়ক জুলিয়াস নায়ারের কবলমুক্ত হয়ে বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ একটি ইসলামী দেশে পরিণত হয়ে গেছে। গত ১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারীর এ আশ্চর্যজনক ঘটনাটা এমনই চমকপ্রদ যে, সমগ্র মুসলিম আফ্রিকা এ একটি মাত্র ঘটনার দ্বারা এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উদঘাটিত হতে দেখতে পাচ্ছে।

ষাটের দশকের গোড়ার দিকে পূর্ব আফ্রিকার দুটি দেশ টাঙ্গানিকা এবং জাঞ্জিবারের সম্মিলনে তানজানিয়ার উদ্ভব ঘটে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রবক্তা জুলিয়াস নায়ার নবগঠিত এ দেশটির রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত হয়। কিন্তু সমাজতন্ত্রের ধুয়া মুখে নিয়ে ক্ষমতা দখল করার পর দেখা গেলো জুলিয়াস নায়ার একজন কট্টরপন্থী খৃস্টানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তানজানিয়ার

www.pathagar.com

মোট জনসংখ্যার মাত্র বিশ ভাগ খৃস্টান এবং আটাত্তর ভাগই মুসলমান। এতদসত্ত্বেও সামরিক স্বৈরাচারের স্টীমরোলার চালিয়ে তানজানিয়াকে একটা খৃস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে রূপান্তরিত করার এক অমানবিক প্রয়াসে তিনি অবতীর্ণ হলেন।

তানজানিয়ার রাজধানীর নাম দারুস সালাম। সুন্দর এ শহরটির শতকরা নব্বই ভাগ অধিবাসিই মুসলমান। এশিয়ার বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত মুসলিম ব্যবসায়ীরাই প্রধানত দারুস সালামের সকল ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। নায়ার প্রথম দারুস সালামের মুসলিম নামটি পরিবর্তন করে তথাকথিত একটি ধর্মনিরপেক্ষ নাম দেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু জনসাধারণ কর্তৃক তাঁর এ প্রয়াস প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর দারুস সালাম থেকে মাত্র দশ কিলোমিটার দূরে তানজানিয়ার নতুন রাজধানী শহর নির্মাণের কাজ শুরু হয়। পরিকল্পিত এ নতুন রাজধানী শহরে পারতপক্ষে কোনো মুসলমানকে জমি বরাদ্দ না দেয়ার এক অলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। অপর দিকে সরকারীভাবে দারুস সালামকে একটি পরিত্যক্ত নগরীতে পরিণত করার সকল ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালী বিজলী, ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সংস্কার ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যক্ত করে রাখা হয়। ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই আফ্রিকার সর্বাপেক্ষা সুন্দর শহরগুলোর একটি বলে পরিচিত এককালের তিলোত্তমা দারুস সালাম একটা পুরো— ভুতুড়ে নগরীর রূপলাভ করে।

শুধু তাই নয়। সমাজতান্ত্রিক সংস্কারের ছন্দাবরণে মুসলমানদের সমস্ত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি রাষ্ট্রকর্তৃক বাজেয়াপ্ত করে এসবের আয়ে পরিচালিত মাদ্রাসা ও এতিমখানাগুলো বন্ধ করে দেয়। দেশে প্রতিটি গ্রামে-গঞ্জে পর্যন্ত বিদেশী খৃস্টান মিশনারীদের অবাধ কর্মতৎপরতা এবং বিভিন্ন ধরনের মিশনারী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে পরিপূর্ণ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হয়। কিন্তু দেশের বাইরে থেকে কোনো মুসলিম প্রচারক বা বুদ্ধিজীবীর তানজানিয়ায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়।

তানজানিয়ার মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়ার পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশগুলো থেকেও মুসলিম প্রাধান্য বিলুপ্ত করে দেয়ার এক সুগভীর সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের প্রধান কলকাঠিরূপে কট্টর মুসলিম বিদ্বেষী খৃস্টান নায়ার ব্যবহৃত হতে থাকেন। পাশ্চাত্যের খৃস্টান ঔপনিবেশিকতাবাদীদের যোগসাজসেই সে পার্শ্ববর্তী উগাণ্ডার ইদি আমিনকে উৎখাত করে। তানজানিয়ার সেনাবাহিনী উগাণ্ডায় প্রবেশ করে

www.pathagar.com

কয়েক লক্ষ মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করে। রাজধানী কাম্পালার মুসলিম অধিবাসীদের বাড়ীঘর এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বর্গীর মত লুণ্ঠন করে তানজানিয়ায় নিয়ে আসে। উগান্ডার লক্ষ লক্ষ মুসলমান খৃস্টান সৈন্যদের এ অবাধ গণহত্যার কবল থেকে আত্মরক্ষা করার উদ্দেশ্যে সর্বহারা অবস্থায় পাশ্ববর্তী দেশগুলোতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। উগাণ্ডা থেকে মুসলিম প্রাধান্য উৎখাত করার পর জুলিয়াস নায়ার আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তানজানিয়ায় মুসলিম মহিলাদের জন্য পর্দা করা বে-আইনী ঘোষিত হয়। খৃস্টান যুবকদের সাথে মুসলিম মেয়েদের বিয়ে ক্ষেত্রবিশেষে বাধ্যতামূলক করা হয়।

উগাণ্ডায় ইদি আমীনকে উৎখাত করে পরিপূর্ণ খৃস্টান প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পর রাজধানী কাম্পালাতে খৃস্টান ধর্মযাজকদের একটি বিশ্বসম্মেলন আহ্বান করা হয়। এতে প্রধান অতিথিরূপে দাওয়াত করা হয় পূর্ব আফ্রিকার খৃস্টানদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক নায়ারকে। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি সদম্ভে ঘোষণা প্রদান করেন যে, আগামী দশ বছরের মধ্যে তিনি তাঁর নিজের দেশ তানজানিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনসংখ্যাকে একটি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করে দেয়ার বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করার জন্য বিশ্বচার্চ পরিষদের উদার সহযোগিতাও কামনা করেন। এতদসঙ্গে তিনি তাঁর এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষে কি কি কর্মপন্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছেন তার একটা মোটামুটি ব্যাখ্যা দিয়ে সম্মেলনে অংশ-গ্রহণকারী দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত মিশনারী নেতৃবৃন্দকে চমৎকৃত করে দেন। তিনি স্পষ্টতই বলেন যে, আফ্রিকার বুকে এটা একটা নতুন ধর্মযুদ্ধ। এ যুদ্ধে আমাদেরকে জয়লাভ করতেই হবে।"

বিদ্বেষী খৃস্টান শক্তির দ্বারা নতুন করে বিজিত মুসলিম উগাণ্ডার রাজধানী কাম্পালা সম্মেলনে দাঁড়িয়ে পূর্ব আফ্রিকার সর্বাপেক্ষা বড় মুসলিম বিদ্বেষী একনায়ক যখন ক্রুসেডের অহমিকায় উদ্বেলিত দম্ভোক্তি উচ্চারণ করে আত্মম্ভরিতায় গদগদ হচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়টিতেই সুদূর আফ্রিকার আরবানে জুলিয়াস নায়ারের বিদূষী পুত্রবধূ আহমদ দীদাতের এক সাগরেদের সাথে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় অভিভূত হয়ে ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করে ফেললেন। শুধু তাই নয়, সেই প্রথম যুগের সাহাবিয়াগণের ন্যায় ঈমানের উত্তাপ বুকে নিয়ে ছুটে গেলেন সুদূর আমেরিকায়। সেখানে লেখাপড়া উপলক্ষে অবস্থান করছিলেন জুলিয়াস নায়ারের গোটা পরিবার, অর্থাৎ তিন পুত্র ও দুই কন্যা। হিজরী সপ্তম শতকে সমগ্র আলমে ইসলামে তাণ্ডব সৃষ্টি

www.pathagar.com

করে মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছিল যে তাতারী জাতি তাদেরই এক রাজপুত্র বনবাসী জনৈক দরবেশের আযান শুনে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং শেষ পর্যন্ত ইসলামে দীক্ষিত হয়ে সমগ্র তাতার জাতিকে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসার বিস্ময়কর ইতিহাস স্মরণ করেই তো ইসলামের কবি আল্লামা ইকবাল গেয়েছেন ঃ

'তাতার জাতির ইতিহাসই প্রমাণ করেছে
প্রয়োজনে দেবালয় থেকেও বের হয়ে আসবে কা'বার প্রহরীরা।'

মহামতি হযরত ওমর রা.-এর সহোদরা ফাতেমা রা.-এর মতো ঈমানের উত্তাপ দিয়ে জুলিয়াস নায়ারের পরিবারের বিদূষী বধূমাতা গিয়ে উপনীত হলেন সুদূর আমেরিকায়। প্রথমে তিনি স্বামীর সাথে আলোচনা করলেন, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা সম্পর্কে তাকে অবহিত করলেন। তারপর ইসলামের প্রতি সরাসরি দাওয়াত দিলেন স্বামীকে। যে পবিত্র আহবান হৃদয়ে থেকে উৎসাহিত হয় তা সহজেই অন্যের হৃদয়-মন আর্দ্র করে দিতে সক্ষম হয়। মহীয়সী এ মহিলার হৃদয় নিংড়ানো আকুতি ব্যর্থ হলো না। প্রিয়তমা জীবন সঙ্গিণীর আহবানে স্বামী সাড়া দিলেন এবং শেষ পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সর্বাপেক্ষা বড় ক্রুসেড যোদ্ধা জুলিয়াস নায়ারের গোটা পরিবার অর্থাৎ তিন পুত্র ও দুই কন্যা ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেলেন।

ইসলামের ছায়ায় প্রবেশ করার পরপরই এ পরিবারটি আহমদ দীদাতের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তুললেন। দক্ষ যোদ্ধা শেখ আহমদ দীদাত কিন্তু আলোড়ন সৃষ্টিকারী এ সংবাদটি কিছুদিনের জন্য গোপন রাখার নির্দেশ দিলেন। ইতিমধ্যেই ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শেষ করে দেশে ফিরে এলো। এঁরা দেশে ফিরে আসার পর থেকেই আহমদ দীদাতের বিখ্যাত তিন শিষ্য গরীব শেখ মূসা ফুন্তী, শেখ আহমদ কামিশ্বা এবং শেখ আহমদ মাটাটা ঘনঘন দারুস সালাম যাতায়াত শুরু করলেন। তিনজনই যুবক বয়সী এবং উচ্চশিক্ষিত এঁদের এ আসা-যাওয়াটা কিন্তু দারুস সালামের গির্জা অধিপতিরা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না। এ ব্যাপারে তারা তাদের প্রধান মুরুব্বী দেশের মহাপরাক্রান্ত রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট অভিযোগ দায়ের করে বসলেন। কিন্তু তারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে লক্ষ করলেন যে, তাদের সেই ক্রুসেড সেনানী জুলিয়াস নায়ার ধর্মযুদ্ধের ব্যাপারে কেন যেনো নিষ্প্রভ হয়ে পড়লেন। আসলে জুলিয়াস সাহেব ইতিমধ্যেই তাঁর গোটা পরিবারের ধর্মান্তরের বিষয়টা আঁচ করে ফেলেছিলেন। ছেলেদের চেয়ে দুই মেয়ে এবং পুত্রবধূর উৎসাহটাই তিনি বেশী লক্ষ করছিলেন।

www.pathagar.com

ব্যাপারটা অন্য কোনো পরিবারে ঘটলে তিনি হয়তো সিংহের মত গর্জে উঠতেন। প্রয়োজনে স্বৈরাচারের তীক্ষ্ণ দাঁত বসিয়ে দিয়ে হলেও এ সর্বনাশা কাণ্ডটি প্রতিহত করতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু এখন তিনি লড়বেন কার বিরুদ্ধে ? তিন ছেলে, দুই মেয়ে আর পুত্রবধূ। সবাই উচ্চশিক্ষিত, সমাজের দৃষ্টিতে যোগ্য। এদের উপেক্ষা করবেন, তা আর সম্ভব নয়। বরং এ বৃদ্ধ বয়সে তিনিই পুত্র কন্যাদের থেকে বিচ্ছিন্ন ও উপেক্ষিত হয়ে পড়বেন। সুতরাং বিষয়টি কিভাবে হজম করা যায় তা নিয়েই তিনি এখন চিন্তা-ভাবনা করছেন ।

প্রেসিডেন্টের ছেলেমেয়েরা কিন্তু দারুস সালাম ফিরে এসেই শেখ মূসা ফুস্তির মাধ্যমে মুসলিম যুবকদের সংগঠিত করে ফেলেন। নিজেরা তখনও আত্মপ্রকাশ না করে দারুস সালাম ও পার্শ্ববর্তী জনপদগুলোতে খৃস্টান মিশনারীদের চ্যালেঞ্জ করে নানা ধরনের প্রচারপত্র ছড়াতে শুরু করলেন।

মিশনারীরা মুসলিম যুবকদের এ তৎপরতা লক্ষ করে স্তম্ভিত হলেন। কিন্তু উপায় নেই, চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে হয়। তারও প্রচারপত্রের জবাব দিলেন। এবার যুবকরা মিশনারীদেরকে প্রাকাশ্য তর্কযুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ করে বসলেন। সিদ্ধান্ত হলো, দারুস সালামের সর্বাপেক্ষা বড় ময়দান রিপাবলিক পার্কে তর্কযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হবে। তারিখ স্থিরীকৃত হলো ১৩ ফেব্রুয়ারী থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিনদিন।

মুসলিম যুবকরা বিপুল উৎসাহে বিতর্ক সভার উদ্যোগ-আয়োজনে লেগে গেলো। বিরাট আকৃতির পোস্টার মুদ্রিত হলো। কয়েক শ শিক্ষিত যুবক দিনরাত পোস্টার ও প্রচারপত্র নিয়ে মেতে উঠলো।

খোদ মুসলমানদের জন্যও ব্যাপারটি ছিল রহস্যজনক। জুলিয়াস নায়ারের রাজত্বে কিছু সংখ্যক মুসলিম যুবক কর্তৃক খৃস্টান ধর্মের সমালোচনা এবং শেষ পর্যন্ত সামনা-সামনি বিতর্ক অনুষ্ঠান দুঃসাহসিক চ্যালেঞ্জ। এটা যেন বিশ্বাসের অযোগ্য একটা ব্যাপার। খৃস্টানদের পক্ষেও এ ধরনের একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপারের রহস্য উদঘাটন করা ছিল খুবই কঠিন। তারা ভেবেই পাচ্ছিল না, স্বল্পসংখ্যক মুসলিম যুবকের পিছনে এতবড় দুঃসাহস কে যোগাচ্ছে।

নির্ধারিত দিনে রিপাবলিক পার্কে যেন জনতার ঢল নামলো। দেশের দূরদূরান্ত এলাকা থেকেও দলে দলে লোক ছুটে এলো এ মহাতর্কযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করার জন্য। প্রায় এক লক্ষ মুসলিম ও খৃস্টান জনতায় সমগ্র ময়দান যেন কানায় কানায় ভরে উঠলো।

www.pathagar.com

সাজানো বিরাট মঞ্চের একপাশে এসে আগেই অবস্থান গ্রহণ করলেন, পূর্ব আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত সনামখ্যাত পাদ্রী পণ্ডিতেরা। তাদের চোখমুখ থেকে যেন ঠিকরে পড়ছিলো মেধা ও বিদ্যাবত্তার উদ্ধত অহংকার।

কিছুক্ষণ পরই ধীর পদক্ষেপে মঞ্চে আরোহণ করলেন আহমদ দীদাতের তিন বিশিষ্ট সাগরেদ শেখ মূসা ফুস্তী, আহমদ কামিস্তা ও মুহাম্মাদ মাটাটা। কিন্তু একি ? এদের পিছনেই এলেন যে তিন নব্য যুবক। এরা কারা ? স্তম্ভিত জনতার মুহুর্মুহ তাকবীর ধ্বনির সাথে সাথে ঘোষিত হলো, এদের পরিচয়। ইসলামের এ তিন নতুন যোদ্ধা দেশের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী খৃস্টান রাষ্ট্রপ্রধান জুলিয়াস নায়ার সুযোগ্য তিন পুত্র। এ একটা মাত্র ঘোষণার সাথে সাথে যেনো তর্কযুদ্ধের ফলাফল অনেকটা নির্ধারিত হয়ে গেলো। দারুস সালামের আবেগ-উদ্বেলিত জনতার আকাশ ফাটা তাকবীর ধ্বনি যেনো ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্র গর্জনকেও হার মানালো।

শেখ মূসা জনতাকে শান্ত হতে বললেন। তারপর পাদ্রী সাহেবদের বিতর্ক উদ্বোধন করতে অনুরোধ করলেন।

মুসলিম আলেম-ওলামাদের সম্পর্কে পাদ্রী সাহেবদের পূর্ব ধারণা ছিল অন্যরকম। তাঁরা কুরআন হাদীসে প্রচুর জ্ঞান রাখেন সত্য কিন্তু ইংরেজী-ফরাসী ভাষায় দক্ষতা এবং বিশেষ করে বাইবেল ও খৃস্টান ধর্ম পুস্তকাদি সম্পর্কে বিস্তর পড়াশুনা না থাকার কারণে পাদ্রীদের কথার মারপ্যাচ বিশেষত আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের বরাত দিয়ে কথাবার্তা বলার সময় অনেকটা অপ্রতিভ হয়ে পড়তেন। তাই পাদ্রী সাহেবরা এ বিতর্ক অনুষ্ঠানে তাদের অভিজ্ঞতাই কাজে লাগাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু দু' একটা প্রশ্নোত্তরের পরই বুঝতে পারলেন যে, এসব আলেমের বেলায় তাঁদের আগের অভিজ্ঞতা মোটেও কাজে লাগবার মত নয়। পাদ্রীরা কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করার সাথে সাথেই শেখ মূসা জবাব দিতেন আর তাঁর প্রতিটি জবাবের সমর্থনে বাইবেলের পৃষ্ঠা নম্বর পর্যন্ত উল্লেখ করতেন। এভাবেই তিন দিনের সুদীর্ঘ বিতর্ক সভার অবসান হলো। পাদ্রীরা আহমদ দীদাতের তিন যুবক শাগরেদের নিকট প্রকাশ্য পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। ফলে মজলিসের মধ্যেই অন্তত তিনশত শিক্ষিত খৃস্টান প্রকাশ্যে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেলেন।

দারুস সালামের প্রকাশ্য বিতর্ক সভায় মুসলমানদের বিরাট বিজয় তানজানিয়ার সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনেও দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি

www.pathagar.com

করেছিল। বিদ্বেষপরায়ণ কট্টর খৃস্টান শাসক জুলিয়াস নায়ার নিজের সন্তানদের নিকট পরাজিত হয়ে মানসিকভাবে একেবারে ভেঙে পড়লেন। তাঁর সামাজিক মর্যাদা এমন ক্ষতিগ্রস্ত হলো যে, এ ঘটনার দু সপ্তাহের মধ্যেই তিনি রাষ্ট্রপ্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। অনেকের ধারণা, পুত্র কন্যাগণের ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে জুলিয়াস নায়ার ইতিমধ্যেই ইসলামের প্রতি অনেকটা আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।

নায়ার পদত্যাগ করার পর তানজানিয়ার বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত হয়েছেন শেখ আলী হাসান। দেশের সর্বশ্রেণীর লোকের নিকট তিনি একজন সৎ ও দক্ষ রাজনীতিবিদরূপে পরম শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব। আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনতত্ত্বে উচ্চ ডিগ্রিপ্রাপ্ত শেখ আলী ব্যক্তিগত জীবনে একজন পরহেযগার মুসলমান বলে পরিচিত। বর্তমানে আফ্রিকার ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের সাথে তাঁর সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। আল আজহারে শিক্ষালাভ করার সময় তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমীন সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন বলেও জানা যায়। বিগত মার্চ মাসের প্রথম দিকে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করার পরপরই তিনি রাজধানী দারুস সালামে একটা আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনের আয়োজন করেন। পবিত্র মক্কাকেন্দ্রিক বিশ্ব সংগঠন রাবেতা আলম আল ইসলামীর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশে ইসলামী আন্দোলন জোরদার করা এবং বিশেষত উপনিবেশবাদী খৃস্টান মিশনারীদের সকল অপচেষ্টার জাল ছিন্ন করার লক্ষে একটা বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়।

মোটকথা, যে তানজানিয়াকে খৃস্টান ডিক্টেটর জুলিয়াস নায়ার একটি কট্টরপন্থী খৃস্টান রাষ্ট্রে পরিণত করে দেয়ার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছিল, আল্লাহর অনুগ্রহ আজ সেই তানজানিয়া আফ্রিকার ইসলামী ঐতিহ্য ও গৌরব ফিরিয়ে আনার পথে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে যাচ্ছে। আফ্রিকার সমকালীন রাজনীতি এবং বিশেষ করে মুসলিম ও খৃস্টান শক্তির মধ্যে মারাত্মক সংঘাতের ক্ষেত্রে তানজানিয়ার এ পটপরিবর্তন নিসন্দেহে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা। আর এমন একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা সম্ভবপর হয়েছে মর্দে মুজাহিদ শেখ আহমদ দীদাত ও তাঁর সহযোদ্ধাদের অপূর্ব ত্যাগ এবং মনীষার বদৌলতে।

আজ মুসলমানদের পুনর্জাগরণে অমুসলিম বিশ্ব আতংকগ্রস্ত এবং একে রুখার জন্য সর্বদিক দিয়ে আক্রমণ রচনা করে চলেছে। ইহুদীরা দমননীতি চালাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে, রাশিয়া, তাজিকিস্তান, আফগানিস্তান এবং মধ্যএশিয়ায়,

www.pathagar.com

হিন্দুরা ভারতীয় উপমহাদেশে এবং ইউরোপ ও আমেরিকার খৃষ্টান মিশনারীরা গোটা বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের উপর চরমভাবে দমননীতি চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলমানদের প্রধান চালিকা শক্তি আল কুরআনকে ধ্বংস করতে তারা ব্যর্থ হওয়ায় তাদের সকল আক্রোশ গিয়ে এখন পড়েছে এ গ্রন্থের উপর। সাবেক বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী গ্লাডস্টোন একদা পার্লামেন্টে বক্তৃতা দিতে গিয়ে আক্রোশে ফেটে পড়ে আল কুরআনকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন, "এ গ্রন্থই আমাদের লক্ষ অর্জনের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিচ্ছে। অতএব একেই ধ্বংস করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামীন কিয়ামত পর্যন্ত মহাগ্রন্থ আল কুরআনকে হেফাযতের দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন, সেহেতু অতীত ঐশীগ্রন্থের ন্যায় তারা (আল্লাদ্রোহীরা) এটাকে বিকৃত বা ধ্বংস করতে বারবার ব্যর্থ হয়ে চলেছে। উপরন্তু এর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে জ্ঞানী শত্রুরা এর কাছেই আত্মসমর্পণ করে চলেছে। ম্যানিলায় বার বছর যাবৎ কর্মরত আমেরিকার খৃষ্টান মিশনারীর প্রধান ড. দীলূ সানতোষ (পরবর্তী নাম ড. খালিদ) বলেন, দীর্ঘ বারো বছর কাজ করার পর আমার মনে একটা প্রশ্নের উদয় হলো। তা হচ্ছে মুসলমানগণ এদশে মজলুম। চরম দারিদ্রের মধ্যে তাদের জীবনযাত্রা। এরপরও কোনো মুসলমানই কেনো খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে চায় না ? ইসলামের এমন কোন্ আকর্ষণী শক্তি রয়েছে, যা শত দুঃখ-দুর্দশা বরণ করার পরও তারা আঁকড়ে ধরে আছে ? দু' একজন মুসলমানের সাথে আমার ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ছিল। কোনো কোনো সময় আমরা পরস্পরের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে আলাপ আলোচনা করতাম। ইসলামের রহস্যজনক আকর্ষণী শক্তি সম্পর্কে আলোচনার এক পর্যায়ে মুহাম্মাদ সাদা তুমেনতু নামক এক বন্ধু আমাকে একদিন দুটি বই পড়তে দিলেন। এর একটা মুহাম্মাদ মার্মডিউক পিকথলকৃত পবিত্র কুরআনের ইংরেজী অনুবাদ এবং অন্যটি মালয়ী ভাষায় লিখিত পুস্তিকা পবিত্র কুরআনে হযরত ঈসা আ.। তুমেনতু আমাকে বারবার অনুরোধ করলেন, আমি যেন গোসল করে পাক পবিত্র হবার পরই কেবল পবিত্র কুরআনের অনুবাদ গ্রন্থটি পাঠ করি। আমি তার কথা রক্ষা করলাম এবং কুরআন অনুবাদ পাঠ করতে শুরু করলাম। পাঠ শুরু করার পর থেকেই অনুভব করছিলাম, এ পবিত্র গ্রন্থের প্রতিটি বক্তব্যই যেনো আমাকে আকর্ষণ করছে। কি এক অপার্থিব আকর্ষণী শক্তি যেনো লুকিয়ে আছে এ মহাগ্রন্থের প্রতিটি শব্দের মধ্যে।

এভাবেই পাঠ করার এক পর্যায়ে সূরা আল মায়েদার চতুর্থ আয়াতে এসে আমি একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। আমার সমগ্র সত্তায় যেন একটা

www.pathagar.com

প্রবল ঝাঁকুনি অনুভব করলাম। কি সরল এবং প্রত্যয়দৃপ্ত বক্তব্যই না দেয়া হয়েছে আয়াতটিতে।

"তোমাদের দীন সম্পর্কে কাফেরেরা আজ চরমভাবে নিরাশ হয়ে পড়েছে। ওদের আর ভয় করো না, আমাকে ভয় করো। আজ আমি তোমাদের দীনকে পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতের পরিপূর্ণতা বিধান করলাম। আর দীনরূপে একমাত্র ইসলামের প্রতিই আমার সন্তুষ্টি প্রকাশ করলাম।"

কুরআন পাঠ করতে শুরু করেছি মাত্র তিন সপ্তাহ ধরে এরই মধ্যে আমার মনমানসিকতার পরিবর্তন ছিল বিস্ময়কর। ইসলামই যে মহান আল্লাহর মনোনীত একমাত্র সত্য দীন এ অনুভূতি ধীরে ধীরে তীব্রতর হয়ে উঠলো। মনের মধ্যে যখন এমন একটা তোলপাড় অবস্থা ঠিক সে সময় এক রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবছি—

"আমার মন যখন সাক্ষ দিচ্ছে, ইসলামই একমাত্র সত্য দীন তখন ইসলাম গ্রহণ করলে কেমন হয় ?"

কিন্তু পরক্ষণই নানা চিন্তা এসে আমার ভাবনা বিক্ষিপ্ত করে দিচ্ছে। ভাবছি ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথে আমার বর্তমান চাকুরী চলে যাবে। পরিবার পরিজনের ভরণপোষণ নিয়ে আমি মারাত্মকভাবে বিপন্ন হয়ে পড়বো। নানা ভাবনা-চিন্তার মধ্যেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

শেষ রাতের দিকে স্বপ্ন দেখলাম, আমি যেন তৃণলতাহীন এক প্রান্তরে বিপন্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছি। তৃষ্ণায় যেন আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, এই বুঝি জীবন বের হয়ে যায়। এমন সময় দেখলাম এক জ্যোতির্ময় পুরুষকে। তিনি যেন আমাকে অভয় দিচ্ছেন। ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে হাত ধরে আমাকে টেনে তুলছেন।

ঘুম ভেঙে গেলো। কিন্তু তখনও তীব্র পিপাসা অনুভব করতে লাগলাম, সমগ্র শরীর যেন একেবারে ভেঙে পড়ছে। নড়াচড়া করার শক্তিও যেন আমি হারিয়ে ফেলেছি।

কিছুক্ষণ নির্জীবের মত পড়ে থাকার পর শুয়ে শুয়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম, ইসলামই একমাত্র সত্য দীন এ সত্য অনুভব করার পর আর তা থেকে দূরে থাকা মোটেও উচিত হবে না। তাই টুকিটাকি প্রস্তুতির জন্য একদিন সময় নিলাম। পরের দিন স্থানীয় মসজিদে হাজির হয়ে প্রকাশ্যেই ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেলাম। এটা ১৯৮৩ সনের এপ্রিল মাসের ঘটনা।

www.pathagar.com

ইসলামে দীক্ষিত হবার পরই আমি অনুভব করলাম, ফিলিপাইন মূলত ছিল মুসলমানের দেশ। বিশেষত যে মারদেকা বা স্বাধীন মানুষের দেশ আজকে ম্যানিলায় রূপান্তরিত হয়েছে, এর অধিবাসীদের সিংহভাগই তো ছিলেন একদা তাওহীদবাদী মুসলমান। এদের রক্তধারায় কি এখনো তাওহীদবাদীদের অনুভূতি লুকিয়ে নেই ? নিশ্চয় আছে। আমাদেরকে সে হারিয়ে যাওয়া অতীত অনুসন্ধান করতে হবে। অতীতের সে তাওহীদী রক্তের উত্তরাধিকার যারা বহন করছে তাদের কানে আবার ডাক দিতে হবে বেলালী কণ্ঠের সে ডাক।

ড. খালেদ বললেন, উপরোক্ত লক্ষ সামনে নিয়েই আমি কয়েকজন সঙ্গী-সাথী নিয়ে ১৯৮৪ সালে একটা ইসলামী সংগঠন গড়ে তুলি। আমাদের প্রচেষ্টায় গত দু বছরে দুই লাখ আশি হাজার লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে।

দাওয়াতের কাজে আমাদের সর্বাপেক্ষা বড় সাফল্য হচ্ছে, কোসান প্রদেশে একই সাথে আটজন খৃস্টান ধর্ম যাজকের ইসলাম গ্রহণ। এদের সাথে আমার কিছুটা পূর্বপরিচয় ছিল। মাত্র কিছুদিন আগ পর্যন্ত আমরা একই সাথে কাজ করেছি।

দক্ষিণ আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের কানে ইসলামের দাওয়াত পৌছার সাথে সাথে অদ্ভূত এক প্রাণবন্যার সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি ফিলিপাইনের খৃস্টীয় সমাজের মধ্যেও ইসলামী দাওয়াত নতুন এক গণজোয়ার সৃষ্টি করবে বলে আমার বিশ্বাস। অবশ্য এর বাস্তব আলামতও ইতিমধ্যেই আমরা প্রত্যক্ষ করছি। পাদ্রীরা যখন এসে দল বেধে ইসলাম গ্রহণ করছে তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

বিশ্বব্যাপী খৃস্টান পাদ্রীদের এ অবস্থা লক্ষ করে নাইজেরিয়ার একজন খৃস্টান পুরোহিত বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী গ্লাডস্টোনের ন্যায় ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠে এবং পবিত্র কুরআনের একটি কপি আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করার চেষ্টা করলে তার দুটি হাতই পুড়ে ছাই হয়ে যায় এবং পবিত্র কুরআনের কপিটি অদৃশ্য হয়ে যায়। এ খবর পেয়ে দুশো খৃস্টান মিশনারী ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটে নাইজেরিয়ার হালিংগোরাজ্যে এবং এটা ফলাও করে প্রচার করে নাইজেরিয়ান জাতীয় পত্রিকা "দি ট্রাম্প।"–আল ইমামত ২৭/৫/৮৭

❐

www.pathagar.com

৩৩. সালাতের স্বাস্থ্যগত তাৎপর্য

নামায বা সালাত যেমন মানুষের আত্মিক উন্নতিতে সাহায্য করে, অনুরূপ শারীরিক উন্নতিতেও সাহায্য করে। নামায মানুষকে একটি নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ করে। আর মানুষের জীবনের উন্নতির চাবিকাঠি হলো এ নিয়ম। সেই ছাত্রই ভালো রেজাল্ট করে যে এ নিয়ম বা রুটিন অনুযায়ী নিজের জীবনকে পরিচালিত করে। নামাযীকে ভোরবেলা উঠতে হয়। এ সময় বাতাসে প্রচুর পরিমাণে "ভোজেন"(Vozen) থাকে, যা সুস্বাস্থ্যের জন্য সুধার ন্যায় কাজ করে। যে নিয়মিত জামায়াতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে তাঁর মনে এক অনাবিল প্রশান্তি বিরাজ করে—যেটা সুস্থদেহ ও সুস্থমনের জন্য একান্ত জরুরী।

মনে দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা ও ভয়ের উদয় হলে মানুষ স্বভাবতই নিজেকে নিঃসঙ্গ ও নিঃসহায় মনে করে এবং এ ভাব এগুলোর তীব্রতাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু মানুষ যখন আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে নামাযে দাঁড়ায়, তখন মনে এ ভাবের উদয় হয় যে, সে নিঃসঙ্গ নয়, নিঃসহায়ও নয়, তার সাথে আর একজন সব থেকে শক্তিমান সাহায্যকারী দয়াময় বিরাজ করছেন। নিমেষে তার মনে অদম্য সাহসের সঞ্চার হয়, ফলে ভয় তার শরীরের ওপর ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া ফেলতে পারে না। আর এ কারণেই একজন প্রকৃত নামাযী ব্যক্তি বিপদে বিচলিত হয় না। দিশেহারা হয়ে আত্মহত্যা করে না।

বর্তমান যুগের মানসিক রোগের চিকিৎসকগণ আবিষ্কার করেছেন যে, মানুষের মনে এমন কতকগুলো দুঃখ-কষ্ট ও ক্ষোভ থাকে, যা অন্যের নিকট প্রকাশ না করলে তা লাঘব হয় না। বিশেষ করে মহিলারা অন্যের নিকট যে পর্যন্ত তাদের দুঃখ-কষ্ট ইনিয়েবিনিয়ে বর্ণনা করতে না পারে সে পর্যন্ত তারা ক্ষান্ত হয় না—মনে শান্তি পায় না। শেষ পর্যন্ত ফিরিস্তিসহ মনের দুঃখ কষ্ট বর্ণনা করতে পারলেই তাদের দুঃখ লাঘব হয়েছে মনে করে। ফলত লাঘব হয়েও যায়। কিন্তু কোনো লোক জীবনে এমন জঘন্য ও লজ্জাজনক অপকর্ম করে থাকে যে, যা অন্যের নিকট কিছুতেই প্রকাশ করতে পারে না। ঐ সকল অপকর্মের গ্লানি ও অনুশোচনা অজ্ঞাতসারে মনে নানা প্রকার বিকার সৃষ্টি করে দুরারোগ্য ব্যাধির সূত্রপাত করে। কিন্তু নামাযান্তে অকপটে ঐ সকল অপরাধ আল্লাহর নিকট স্বীকার করে ক্ষমা

www.pathagar.com

চাওয়া যায়। আর তাতে মনে স্বস্তির ভাব আসে এবং বুকে আশার সঞ্চার হয়। বেনামাযী লোকেরা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত। মূলত মানুষের মনকে শংকাহীন করতে নামায এক অব্যর্থ ঔষধ।

আনুমানিক ১৯৬৯ সালের কথা। করাচীতে পাকিস্তান মেডিকেল সমিতির এক সভায় আমেরিকান মানসিক রোগের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক হার্বার্ট আরবান বলেন যে, পাকিস্তানে ও এশিয়ার সর্বত্র মানসিক রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঐ একই সময় জাতিসংঘের রিপোর্টেও একথা স্বীকার করা হয়। তিনি এর কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বর্তমান যুগের সমাজব্যবস্থায় সৃজিত অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, অশান্তি, দুর্ভাবনা ও আশা-নিরাশার প্রতিঘাত ও নিরাপত্তার অভাবই এর কারণ। এ সকল লক্ষণ মানুষকে পাগল করে না দিলেও সামাজিক দিক দিয়ে অকেজো করে তোলে। মানুষ দক্ষতা, যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা হারিয়ে সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। কেবল পাগল হলেই মানসিক রোগ হয়েছে এমন নয়, দেহের ব্যাধি যেরূপ ব্যাধি, মনের ব্যাধিও সেরূপ একটি ব্যাধি। দেহ সুস্থ না থাকলে যেরূপ মন সুস্থ থাকে না, তেমনি মন সুস্থ না থাকলেও দেহ সুস্থ থাকে না। কাজেই দেহের ব্যাধি ও মনের ব্যাধি উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে মানসিক ব্যাধিও যে একটা ব্যাধি এবং এটাও যে দেহের ব্যাধি হতে কম ক্ষতিকর নয়, এ রকম চিন্তা খুব কমই করা হয়। বিখ্যাত জার্মান মানসিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ব্রিল ও আমেরিকার হার্বার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক লিয়াম জেমস্ প্রমুখ জগৎবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞগণ বহু গবেষণা ও ব্যবস্থাগত অভিজ্ঞতা হতে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা, মানসিক চাপ ও ভয় মানুষের অর্ধেকের বেশি রোগের কারণ। এবং ধর্ম বিশ্বাস ও আল্লাহর ইবাদাত ছাড়া দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা ও ভয় দূর হতে পারে না। বোতলের ঔষধ বা ইনজেকশনে এগুলোর প্রতিকার সম্ভব নয়। আল্লাহর ইবাদাত ও মানুষের মনকে প্রশস্ত ও সমৃদ্ধিশালী করে জীবনকে উদ্দেশ্যপূর্ণ, তৃপ্তিময় ও আশান্বিত করে, দুর্ভাবনা ও ভয়কে দূরে ঠেলে দেয়। তারা উভয়ে দ্বিধাহীন চিত্তে বলেছেন যে, পাকস্থলির ঘা, স্নায়ুবিক দুর্বলতা, পাগল হওয়া, বহুমূত্র রক্তচাপজনিত ব্যাধি ও হৃদরোগ ইত্যাদি কঠিন ব্যাধিসমূহে ধর্মপরায়ণ লোক সাধারণত আক্রান্ত হয় না। মনের অবস্থা শরীরের উপর বিশেষ ক্রিয়া করে থাকে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। মনে অত্যধিক ভয়ের সঞ্চার হলে মুখের ক্ষারধর্মী লালা একেবারে শুকিয়ে যায় এটা সবারই জানা। এটা প্রমাণের কোনো আবশ্যকতা আছে

www.pathagar.com

বলে আমরা মনে করি না। দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তায় পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিডের ভাগ বেশি মাত্রায় সৃষ্টি হয়ে যেরূপ পাকস্থলির উপর স্তরে ঘা সৃষ্টি করে তদ্রূপ দুর্ভাবনার জন্য রক্তের চাপ ও তাপের তারতম্য ঘটে। শরীরের অক্সিজেন রক্তে নিহিত শর্করা (চিনি) জ্বালাতে সক্ষম হয় না এবং অদগ্ধ চিনি পেশাবের সাথে বের হয়ে যেতে বাধ্য হয়। এটাই বহুমূত্র রোগের প্রধান কারণ। একই কারণে শরীরে রক্ত চলাচল নিয়মিত ভাবে না হওয়ার দরুন রক্তচাপ বৃদ্ধিজনিত ব্যাধি ও হৃদরোগের উৎপত্তি হয়ে শরীরের স্নায়ুগুলো ক্রমে শিথিল ও দুর্বল হয়ে যায়।

ডাক্তার কার্লজাঈ তাঁর রচিত "আত্মার সন্ধানে বর্তমান মানব" নামক ইংরেজী পুস্তকের ২৬৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, আমি অসংখ্য মানসিক রোগীর চিকিৎসা করেছি। কিন্তু যারা ধর্মভাবাপন্ন হতে পারেনি, তাদের কেউই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করতে পারেনি। তিনি এ পুস্তকে আরো বলেছেন যে, "ধর্মভাবই মানুষকে জীবনীশক্তি দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে।"

মানুষ স্বভাবতই চঞ্চল। একই ধরনের কাজে অনেকক্ষণ লিপ্ত থাকতে পারে না। নামাযের মাধ্যমে কর্মধারা পরিবর্তনের যে সুযোগ পাওয়া যায় অন্য কোনো কাজে তা হয় না। সে জন্যই হাদীস শরীফে আছে, নামাযে উদ্যম বৃদ্ধি হয়, কাজ সহজসাধ্য হয়, স্বাস্থ্য অটুট থাকে, জীবনীশক্তি অযথা ক্ষয় হয় না, নামাযী লোক সংক্রামক ব্যাধি হতে অব্যাহতি পায় ও তাদের সন্তান-সন্ততি বলিষ্ঠ হয়। নামায শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করে। সে জন্য নামায়ী লোককে শীঘ্র বার্ধক্যে আক্রমণ করে না। রুকূ' ও সিজদা শরীরের এ ভারসাম্য রক্ষা করে।

নোবেল প্রাইজপ্রাপ্ত ডাঃ ক্যারল বলেছেন, আল্লাহর উপাসনায় মনে যেরূপ শক্তি ও উদ্যমের সৃষ্টি হয় অন্য কিছুতেই তা হয় না। তিনি বলেছেন, "ডাক্তার হিসেবে আমি লক্ষ্য করেছি, যে রোগ কোনো ঔষধে আরোগ্য হয়নি, তা আল্লাহর নিকট প্রার্থনায় অনায়াসে দূর হয়ে গিয়েছে।" তিনি আরো বলেন, "আল্লাহর নিকট প্রার্থনা বিফলে গেছে এমন কোনো ঘটনা আমার জানা নেই।"—নেয়ামুল কুরআন ম্যাজিস্ট্রেট শামছুল হুদা পৃঃ ২৫০)। বাইবেলে আছে, "আল্লাহর নিকট প্রার্থনা অসাধ্য সাধন করতে পারে" নামাযের সৃজনীশক্তি মানব শরীরে গঠনমূলক কার্যে ও আত্মার উন্নতি সাধনের জন্য যে কিরূপ আবশ্যক এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে তা বিস্তারিত বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তবুও নামাযের স্বাস্থ্যগত উপকারিতা সম্বন্ধে নিম্নে ধারাবাহিকভাবে দু চারটি কথা বলার চেষ্টা রাখবো।

www.pathagar.com

নামায একটি বিশেষ শারীরিক প্রক্রিয়া (Physical Process) মানসিক উৎকর্ষতা ও শারীরিক উৎকর্ষতা (Physical and Mental achievement) এর ফসল। প্রবাদ আছে, "A Sound mind in a Sound body" —সুস্থ দেহে সুস্থ মনের বাস। আর মন (Mind) হলো মানুষের সকল কাজের মূল উৎস। মনের ধ্যান-ধারণাই আমাদের কর্মপ্রচেষ্টায় বাস্তব হয়ে ওঠে। শরীর ভালো না থাকলে মন ভালো থাকে না। অসুস্থ মন নিয়ে আবার কোনো কাজ করাও সম্ভব নয়। সুতরাং কোনো কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য সুস্থ শরীর দরকার। নামাযের মাধ্যমে একজন নামাযী শরীর ও মন দুটোকেই আদর্শরূপে গড়ে তুলতে পারে। যে মানুষের শরীর খারাপ তার মাঝে বিরক্তি, আলস্য অসহিষ্ণুতা এসে যায়। অন্যদিকে যার শরীর ভালো সে সদা প্রফুল্য, কর্মঠ, উদ্যোগী, সহিষ্ণু, অধ্যবসায়ী ও উৎসাহী হয়ে থাকে। আবার সুস্থ শরীরের জন্য দরকার—

১. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা
২. নিয়মিত শয্যা ত্যাগ
৩. ব্যায়াম বা শারীরিক কসরত
৪. নিয়মিত আহার-বিহার
৫. নিয়মিত শয্যা গ্রহণ ও ত্যাগ
৬. বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ

নামাযের মধ্যে উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রায় সবগুলোই বিদ্যমান। সুতরাং নামায শরীর সুস্থ রাখার জন্য একটি বিশেষ মাধ্যম, যা মন ও শরীরের মাঝে একটা শক্তিশালী সেতুবন্ধন (Bridge) হিসেবে কাজ করে।

নামাযের জন্য একান্ত প্রয়োজন পবিত্রতা অর্জন। এ পবিত্রতা—

১. মানসিক পবিত্রতা
২. দৈহিক পবিত্রতা
৩. পরিধেয় বস্ত্রের পবিত্রতা
৪. স্থানের পবিত্রতা এবং
৫. নিয়তের পবিত্রতা

মানসিক বা মনের পবিত্রতা সাধিত হয় অযুর দ্বারা। দৈহিক পবিত্রতা অর্জিত হয় অযু-গোসল দ্বারা, পরিবেশের পবিত্রতা অর্জিত হয় পাক-সাফ পরিধেয় বস্ত্রের ও স্থানের পবিত্রতা দ্বারা এবং মনের ভারসাম্য রক্ষা হয় নিয়তের পবিত্রতা দ্বারা। যা নামাযীর সাথে আসমান যমিনের একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলে নামাযীর অন্তরকে দুশ্চিন্তাহীন শংকাহীন ও দৃঢ় করে থাকে।

www.pathagar.com

"Prevention is beter than cure." Community Medicine নামে Medical Science-এ একথা বলা আছে। একজন ঈমানদার মুসলমান দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করার পূর্বে পাঁচবার অযু করে থাকে। এতে করে সে প্রত্যহ পাঁচবার মুখ, নাক, চোখ, হাত, কান, প্রভৃতি স্থানসমূহ ধৌত করে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে Community Medicine-এ ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বা Personal Hygiene আখ্যা দেয়া হয়েছে। যা সংক্রামক জীবন-সংহারকারী রোগ প্রতিরোধের জন্য অপরিহার্য। "In Islam it has been said to be a part of one's faith." আরো বলা হয়েছে, Washing 5 times in a day before prayer is quite valuable for personal health and cleaness. Brashing the teeth 5 times in the 'ozu' also has imense value." (A text book of Community Medicine. Lobdhok Prokashoni, May. 1986. Dr. S. A. Bari. P. 391) তাই দেখা যাচ্ছে যে, অযুর মাধ্যমে আমরা চোখের কনজাংটিবিটিস (Conjunctivitis) ব্লিফারিটিস (Blepheritis) ষ্টায়ি (Stye), ক্যালাজিয়ন, (Calazion), ড্যাকরোসিটিটিস (Dacrocystitis) এ সমস্ত রোগ থেকে রক্ষা করে।

মুখমণ্ডলের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা যথা–দাঁত, গাল, ও জিহ্বাকে পরিষ্কার রাখার জন্য পাঁচবার অযুর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। পাইওরিয়া (Pyorrhoea), জিঞ্জিভিটিস, (Gingivitis), ফাওল স্মেল ব্রিথিং (Foul Smell breathing), ক্রিসটুথ (Cries tooth), টনসিলিটিস (Tonsllitis), ফ্যারিংজিটিস (Phaaryngiti's) ইত্যাদি রোগগুলো দৈনিক পাঁচবার মিসওয়াক করে অযু করলে প্রতিরোধ করা যায়। এক্ষেত্রে বাজারে প্রচলিত উচ্চদামের ব্রাশ ও পেস্টের পরিবর্তে নিমের দাঁতন অধিকতর উপকারী। এ প্রসঙ্গে রাজশাহী মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ এস. এ. এ. বারী বলেন ঃ

In Place of Brush a 'miswak' may be used. that of neem may have some added benefit" (Ibid P. 392)

অযুর উপকারিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী মি. হেনরী গ্রে বলেন, শরীরের সমস্ত অনুভূতি তার সংগ্রাহক দ্বারা সংগৃহীত হয়ে ইমপাল্‌স বা অনুভূতি তরঙ্গ আকারে নার্ভের মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌছে। আর এ অনুভূতি সংগ্রাহক বেশ কয়েক প্রকারের এবং সমস্ত শরীরেই ছড়ানো। এর ভিতর 'বালবাচ করভূছেন' নামে এক প্রকার ঠাণ্ডানুভূতি সংগ্রাহক তন্ত্র আছে যা লোমকূপের পাশেই অবস্থিত। এ তন্ত্র শরীরের

www.pathagar.com

অন্যান্য স্থানের তুলনায় হাত ও পায়ের চামড়ার মধ্যে অনেক বেশী। এ তন্ত্রগুলো শুধুমাত্র ঠাণ্ডানুভূতি সংগ্রহ করে এবং ইমপাল্‌স বা অনুভূতির তরঙ্গ আকারে নার্ভের মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছায় (গ্রেজ য়্যানাটমি, ২৯শ সংস্করণ পৃঃ ৯০৬)। এর ফলে মস্তিষ্কে ইলেক্ট্রনের আধিক্য কমে গিয়ে ভারসাম্য রক্ষিত হয়। প্রবীণ চিকিৎসা বিজ্ঞানী মমতাজ উদ্দীন এ সম্পর্কে একটি উদাহরণ পেশ করে বলেন, অনুভূতি দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা বস্তু ঠাণ্ডা কি গরম তা হাত ও পায়ের স্পর্শ দ্বারা পরিমাপ করা হয়ে থাকে। আবার অনুভূতি দ্বারা ঠাণ্ডা বা গরমের কোনো সূক্ষ্ম পরিমাপের জন্য মুখমণ্ডলের উভয় পাশে স্পর্শ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এতে প্রমাণিত হয় যে, শরীরের অন্যান্য স্থানের তুলনায় গরমের অনুভূতি সংগ্রাহক, হাত, পা এবং মুখমণ্ডলের চর্মে অনেক বেশি। যার মহা গরমে, মাত্র জামার হাতা গুটিয়ে এবং প্রচণ্ড শীতে মাত্র হাত বগলদাবা করে গরম ও শীতের সাথে সবার একটা গোপন লড়াই হয়ে থাকে।-(নামায ও বিজ্ঞান পৃঃ ৪৯)

হাড়ভাঙা শীতের কাঁপুনীতে হাতের তালু সামান্য দুই চার মিনিট আগুনে সেক দিলে যদি অন্তকরণ গরম হতে পারে, তবে ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ঐ একই এলাকা বারবার ধৌত করা হলে কেন অন্তকরণ ঠাণ্ডা হতে পারবে না ? ঠাণ্ডা পানি দ্বারা হাত, পা ও মুখমণ্ডল বারবার ধৌত করা হলে (অযুকরা) বেশী ঠাণ্ডানুভূতি পৌঁছাবে এবং তা ঠাণ্ডা হবে। মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য মস্তিষ্কে ইলেক্ট্রনের বোঝা হ্রাস পেয়ে থাকে। বলাবাহুল্য যে, বেশি ঠাণ্ডায় হিমায়িত হয়ে ইলেক্ট্রন কমে যায়। এ কারণে অযু করলে মস্তিষ্ক অনেকটা ইলেক্ট্রন মুক্ত থাকে। ফলে সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রের অতিরিক্ত কার্যকারিতা কমে গিয়ে তা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে থাকে। আর এ কারণে হৃদপিণ্ডের ওপর মস্তিষ্কের বাড়তি প্রভাব কমে গিয়ে তাও (হৃদপিণ্ড) স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। উল্লেখ্য এ হৃদপিণ্ডের মধ্যেই অন্তকরণ অবস্থিত। কাজেই হৃদপিণ্ড স্বাভাবিক হওয়া অর্থই অন্তকরণ ঠাণ্ডা হওয়া এ কারণেই মানুষ অযু করার সাথে সাথে পরম প্রশান্ত অনুভব করতে থাকে। মানুষ যাতে অত্যন্ত পবিত্র পরিবেশে এই পরম প্রশান্তি মন নিয়ে একাগ্রতার সাথে আল্লাহর ইবাদাত করতে পারে সেই জন্য ইসলাম নামাযের পূর্বে মিসওয়াক করে অযু করার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমস্ত বিজ্ঞানীর বিজ্ঞানী। অতএব শরীর বিজ্ঞানের উপরোক্ত থিওরী তাঁর অজানা থাকার কথা নয়। তাই তিনি তাঁর পাক কালাম ঐশী মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে অযুর উপকারিতা সম্বন্ধে সেই সপ্তম শতাব্দীতেই ঘোষণা করে দিয়েছিলেন ঃ

www.pathagar.com

اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ০

"সে সময়টি স্মরণ কর যখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর তন্দ্রা স্থাপন করেছিলেন স্বীয় সান্নিধান হতে শান্তি স্থাপনের জন্য, আর তোমাদের ওপর আসমান থেকে পানি বর্ষণ করছিলেন যাতে সেই পানি দ্বারা তোমাদেরকে পবিত্র করে দেন (অযুর দ্বারা) আর তোমাদের হতে শয়তানের প্ররোচনা দূর করেন (অযুর দ্বারা)। আর ঐ অযুর দ্বারা তোমাদের অন্তকরণসমূহকে সুদৃঢ় করেন এবং (ঐ অযু দ্বারা) তোমাদের পদসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।"–সূরা আল আনফাল ঃ ১১

গবেষক চিকিৎসা বিজ্ঞানী মমতাজ উদ্দিন সাহেব তাঁর নামায ও বিজ্ঞান গ্রন্থে নামাযের উপকারিতা পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন যে, অন্তঃকরণ হৃদপিণ্ডের মধ্যে অবস্থিত এবং কর্তৃত্ব করে মস্তিষ্কসহ সমস্ত শরীরের উপর। অন্তঃকরণ শক্তিশালী হলে মস্তিষ্কসহ সমস্ত শরীর শক্তিশালী হবে। আল্লাহ তাআলা সবই পারেন তবুও যুক্তি ছাড়া বা কোনো বৈজ্ঞানিক কারণ ছাড়া তিনি কিছুই করেন না। আগেই উক্ত আয়াতে অন্তঃকরণ সুদৃঢ় এবং পদসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত তথা দৈহিক শক্তি বৃদ্ধির বৈজ্ঞানিক কারণ হিসেবে 'অযুর" কথা বলা হয়েছে। অযুর উপকারিতা সম্বন্ধে প্রিয় নবী (স) আরো বলেছেন, "ক্রোধ প্রকাশ করা শয়তানের কাজ এবং শয়তান অগ্নি হতে সৃষ্টি হয়েছে। আগুন পানি দ্বারা নিভান যায়। অতএব তোমাদের মধ্যে কেউ রাগান্বিত হলে সে যেনো অযু করে।"–আবু দাউদ

নামায ও বিজ্ঞান গ্রন্থের হৃদপিণ্ড ও মস্তিষ্ক পরিচ্ছেদে দেখান হয়েছে যে, বিভিন্নভাবে মস্তিষ্কে ইলেক্ট্রন এবং উত্তাপ জমা হচ্ছে। ঐ ইলেক্ট্রন এবং উত্তাপ থেকে মস্তিষ্ককে রক্ষা করার জন্য তার মধ্যে চারটি গর্তে জলীয় পদার্থ জমা থাকে। একে সেরিব্রেস্পাইনাল লুইড বলে। সংক্ষেপে একে সি. এস. এফ. (C. S. F) বলা হয়ে থাকে। ঐ জলীয় পদার্থ মস্তিষ্ককে ঠাণ্ডা করার ফলে হিমায়িত হয়ে তার ইলেকট্রনের বোঝা কমে যায়। মস্তিষ্কের গর্তে যে জলীয় পদার্থ (C. S. F) থাকে তাকে ভেন্ট্রিকল বলে। মস্তিষ্কের মধ্যে ভেন্ট্রিকল মোট চারটি। চতুর্থ ভেন্ট্রিকল মস্তিষ্কের নীচের দিকে অবস্থিত। উপরের দিকে এটা সরু পথ দ্বারা সরাসরি তৃতীয় ভেন্ট্রিকল এবং পরোক্ষভাবে দুই লেটারাল ভেন্ট্রিকলের সাথে যুক্ত। মস্তিষ্কের নার্ভ কোষগুলো আঙুরের মত থোকায় থোকায় ঐ ভেন্ট্রিকলগুলো এবং তাদের যোগাযোগ পথের কাছাকাছি অবস্থিত। যদি কখনো এক বা একাধিক

www.pathagar.com

কোষের থোকা দূরে সরে যায়, ভেন্ট্রিকল তখন হর্ন বা পার্শ্ব প্রসারিত করে ঐগুলোকে নিকটতম দূরত্বে আনে। মূলত, এটা সম্পূর্ণভাবে ইলাহী প্রশাসনে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। আর এ কারণেই একটা থোকাও ভুল করে দূরে সরে যায় না বা দূরে সরে থাকে না। কিন্তু কেন এদের (নার্ভকোষ থোকা এবং C. S. F-এর মধ্যে এই ব্যতিক্রমহীন নিকটতম দূরত্ব ? শরীর বিজ্ঞানীরা বলেন, ঐ নার্ভকোষ থোকাগুলোকে ঠাণ্ডা করার জন্যই ঐ জলীয় পদার্থের এমন নিকটতম অবস্থান ও সম্পর্ক। আর এটা এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন করে রেখেছেন যে, যাতে করে একটি মানুষ সুস্থ থেকে তার দেয় বিধান অনুযায়ী ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক জীবনে সাফল্য অর্জনের জন্য সুষ্ঠুভাবে স্বীয় জীবন পরিচালনা করতে পারে।

গবেষক চিকিৎসা বিজ্ঞানী জনাব মমতাজ উদ্দিন সাহেব বলেন, একটা ইঞ্জিনকে কার্যকর রাখতে তার কম্বাশন চেম্বারের চতুর্দিকে অনবরত ঠাণ্ডা পানি প্রবাহিত করে যেমন তার উত্তাপ সীমার মধ্যে রাখা হয়, মস্তিষ্কের ক্ষেত্রেও তেমনি ভেন্ট্রিকলের মধ্যে জলীয় পদার্থের সাহায্যে উত্তাপ কমিয়ে তাকে কার্যকর রাখা হয়েছে। জলীয় পদার্থ উত্তাপ কমাতে ব্যর্থ হলে ক্রমান্বয়ে তা উত্তপ্ত হয়ে থাকে। ফলে তার জলীয় পদার্থের ধারে কাছে অবস্থিত সমস্ত নার্ভকোষ থোকাগুলো প্রথমত উত্তপ্ত হয় এবং ক্রমান্বয়ে তা সমস্ত মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে মানুষ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং বিভিন্ন রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে।

মস্তিষ্কের মধ্যভাগে অনেকগুলো নার্ভকোষ থোকা আছে। এদের প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক কার্যকারিতা আছে। তবে এদের ভিতর "হাইপোথালামাছ" নামে মস্তিষ্কের মধ্যভাগে অবস্থিত এ নার্ভকোষটির কার্যকারিতা অনেক বেশী। তৃতীয় ভেন্ট্রিকলের সম্মুখে ও পাশের দেয়াল ঐ হাইপোথালামাছ দ্বারা গঠিত। কাজেই তৃতীয় ভেন্ট্রিকলের জলীয় পদার্থ উত্তপ্ত হলে ঐ হাইপোথালামাছও সহজে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ফলে উত্তপ্ত হওয়ার দরুন তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পিটুইটারী গ্লান্টের হর্মোনগুলোর ক্ষরণ মাত্রা বেড়ে যায়। ঐ হাইপোথালামাছ আবার অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের নিয়ন্ত্রক। কাজেই হাইপোথালামাছ উত্তপ্ত হওয়ার দরুন ঐ অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের কার্যকারিতাও ব্যাহত হয়।

এখন দেখা যাক, হাইপোথালামাছ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পিটুইটারী গ্লাণ্ড ও অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের কার্যকারিতা ব্যাহত হয়ে শরীরে কি কি পরিবর্তন সাধিত হয় ঃ

www.pathagar.com

পিটুইটারী গ্লাণ্ডের কার্যকারিতা ব্যাহত হয়ে হজমক্রিয়ার প্রতিপত্তি শরীরে দাহ, মাংসপেশীর সহজ ক্রিয়া শক্তি, মহিলাদের মাসিক রক্তস্রাব পরিচালনা, স্তন পুষ্টি ও দুগ্ধ সঞ্চারণ, পুরুষের অণ্ডকোষের শুক্রকীট তৈরি, চর্মের কাল পদার্থের (মেলানিন) নিয়ন্ত্রণ, পেশাব ও রক্তচাপের নিয়ন্ত্রণ ব্যাহত হওয়ার মত শরীরে বিভিন্ন বৈলক্ষণ সৃষ্টি হতে পারে।

অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের নিয়ন্ত্রণ ব্যাহত হয়ে পাকস্থলী ও অন্ত্রের পাচকরসক্ষরণ, রক্তচাপ, হৃদযন্ত্রের শরীরের প্রান্তভাগের শীরা ও ধমনীর সংকোচন প্রসারণ এবং ঐ উপায়ে শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শরীর মোটা বা চিকন, কম বা বেশী নিদ্রা ও যৌনক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ ব্যাহত হতে পারে। রাস্তাঘাট কলকারখানায় সিগনাল (Signal) বাতি ব্যবহৃত হয়। একটা কারখানার কথাই ধরা যাক। কারখানা সুপরিচালনার জন্য একটি বোর্ডের ওপর কতকগুলো সিগনাল বাতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কারখানার কোনো মেশিনে কোনো বিভ্রাট ঘটলে সাথে সাথে ঐ বোর্ডে সংস্থাপিত নির্দিষ্ট সিগনাল বাতি জ্বলে ওঠে। ফলে কারখানার পরিচালক অতি সহজে উক্ত মেশিন মেরামত করে পুনঃ চালু করতে পারে। স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীদের যে "শরীর নামে কারখানা" প্রবন্ধ আছে তা পাঠ করলে বুঝ তে পারবেন মানুষের সেই মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সৃষ্ট কী অদ্ভূত একটি জীবন্ত কারখানা। মানুষের শরীর বা দেহ নামে এ কারখানারও তদ্রূপ সিগনাল আছে। মাথা ধরায় মস্তিষ্কের কাশিতে ফুসফুসের, বুক কাঁপায়—হৃদযন্ত্রের, কোষ্ঠকাঠিন্যে—লিভারের বিকল সিগনাল হিসেবে ধরা হয়। এরকম হাজার হাজার বিকল সিগনাল অহরহ মানব দেহের মধ্যে ঘটছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেন, তাহলে মলদ্বার দিয়ে বার বার বায়ু বের হওয়া একে কি হজমক্রিয়ার বিকল সিগনাল হিসেবে ধরা যায় না ? আর হজমক্রিয়ার প্রতিপত্তি পাচকরস ক্ষরণ উভয়ই ঐ একই হাইপোথালামাছ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পিটুইটারী গ্লাণ্ডের কার্যকারিতা ব্যাহত হয় এবং অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেমের কার্যকারিতা ব্যাহত হয়ে সৃষ্টি হয় যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই ঠাণ্ডা পানি দ্বারা বারবার অযু করা হলে বেশী ঠাণ্ডানুভূতি মস্তিষ্কে পৌছাবে। ফলে যেমন তাতে (মস্তিষ্ক) ঠাণ্ডা হবে, তেমনি তার ইলেকট্রনের বোঝা কমে যাবে। আবার মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হবার দরুন তার মধ্যাহ্ন হাইপোথালামাছও ঠাণ্ডা হবে। এতে পিটুইটারী গ্লাণ্ডের ওপর এবং অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের ওপর ঐ হাইপোথালামাছের নিয়ন্ত্রণও স্বাভাবিক হবে। ফলে হজমক্রিয়ার প্রতিপত্তি যা ঐ পিটুইটারী গ্লাণ্ডের কাজ এবং পাচক রস ক্ষরণ যা ঐ অটোনমিক

www.pathagar.com

নার্ভাস সিস্টেমের কাজ তাও স্বাভাবিক হবে। এভাবে পিটুইটারী গ্লাণ্ড এবং অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের কার্যকারিতা ব্যাহত হয়ে পূর্বোল্লেখিত সমস্ত বৈলক্ষণ বা রোগগুলো ঐ একই ভাবে অযুর ফলে নিয়ন্ত্রিত হতে পারবে। এজন্য নবী করিম স. মলদ্বার দিয়ে বায়ু বের হলে অযু করার কথা বলেছেন। জ্ঞান বিজ্ঞানে চৌদ্দশত বছর পূর্বে সমস্ত পৃথিবী যখন ঘুমন্ত তখনো এতটুকু বিজ্ঞান যে নবী মুস্তফা স.-এর জানা ছিল যা অত্যাধুনিক বিজ্ঞানের চরম শিখরে দাঁড়িয়ে আজও কেউ ভাবতে পারেনি। তার যথাযোগ্য মর্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক উপাধিতে ভূষিত করা ছাড়া আর কোনো নোবেল পুরস্কারের কথা আমার জানা নেই। (নামায ও বিজ্ঞান ডাক্তার মমতাজ উদ্দিন এম. বি. বি. এস)

অযুর পূর্বে বিশেষ করে জুমার নামাযের পূর্বে মুসল্লিগণ ভালো করে চুল কেটে, নখ কেটে, গোসল করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে মসজিদে যান। এ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দরুন নানা প্রকার সংক্রামক রোগ—যেমন কলেরা, ডায়রিয়া, টাইফয়েড, আমাশয়, ক্রিমি ইত্যাদি রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে আই. পি. জি. এম. আর. (I. P. G. M. R)-এর প্রফেসর ডাঃ গোলাম রসূল ১৯৮৭ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী রোববার বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহ উপলক্ষে জনস্বাস্থ্য বিষয়ের উপর আয়োজিত এক সিম্পোজিয়ামের বক্তৃতায় বলেছিলেন, "হযরত মুহাম্মাদ স.-এর সময়েই প্রথম জনস্বাস্থ্যের প্রকৃত ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অযু গোসল করা, নখ, চুল ইত্যাদি নিয়মিত কাটা সুন্দরের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।"—দৈনিক সংগ্রাম, ২/২/১৯৮৭

ফরয গোসলে নাসিকার মধ্যে ঠাণ্ডা পানি ঢুকান ফরয করা হয়েছে। সম্ভবত এ কারণে যে, ঐ নাসিকার মধ্যে সঞ্চারিত অলফ্যাটরী নার্ভের মাধ্যমে ঠাণ্ডানুভূতি মস্তিষ্কের কেন্দ্রে পৌঁছে ঐ কেন্দ্রকে হিমায়িত করে তার ইলেক্ট্রনের বোঝা কমিয়ে দিতে পারে এবং তা ঠাণ্ডা হতে পারে। এছাড়া যে কারণে গোসল ফরয করা হয়েছে তার আসল উদ্দেশ্য শক্তি ও স্ত্রী সহবাস ক্ষমতা এ দুই বিষয়বস্তুর মূল হাইপোথ্যালামাছ এবং পিটুইটারী গ্লাণ্ডে মস্তিষ্কের ঐ কেন্দ্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর সর্বাধিক শারীরিক পরিশ্রমকর্ম স্ত্রী সহবাসে মস্তিষ্কের ঐ কেন্দ্র বেশি উত্তপ্ত হয়, যা মাথার তালুতে ঠাণ্ডা পানি ব্যবহারের চেয়ে নাকের মধ্যে ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার দ্বারা ঐ কেন্দ্রকে ঠাণ্ডা করা বেশি সহজসাধ্য। কারণ মাথার তালু থেকে ভিতরের দিকে প্রথম মাথার খুলী তার পরে মগজ এবং সর্বশেষে করপাস ক্যালোসামের Csrpus Callosum মত দুর্ভেধ্য প্রাচীর ভেদ করে তালুতে ব্যবহৃত

www.pathagar.com

কোনো ঠাণ্ডানুভূতি মস্তিষ্কের কেন্দ্রস্থ ঐ হাইপোথালামাছ ও পিটুইটারী গ্রন্থি পর্যন্ত পৌছাতে পারে না। স্ত্রী সহবাসের পূর্বে অযুর নির্দেশ এর গূঢ় রহস্যের তাৎপর্যও এখন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ধরা পড়ছে।

নামাযের আহকামের মধ্যে শারীরিক পাক পবিত্রতা অর্জন একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। স্ত্রী সহবাসের পরে মুসলমানদের জন্য গোসল করা ফরয। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। সহবাসের পর স্ত্রীর যৌনাঙ্গে যে বীর্য বা সিমেন প্রবেশ করে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সুগার (Suger) যা ব্যাক্টেরিয়া প্যারাসাইট ও ফাঙ্গাস (Fungus) বৃদ্ধির জন্য মিডিয়া (Media) হিসেবে কাজ করে। ফলে মেয়েদের লিউকোরিয়া বা শ্বেতপ্রদর রোগ হয়। কিন্তু মুসলমানদের স্ত্রী সহবাসের পর গোসল করার মাধ্যমে যৌনাঙ্গ পুরোপুরি পরিষ্কার রাখায় এটা হতে পারে না।

এজন্য Sir Normam Jeffcoate (M.D.F.R.C.O.G.) লিউকোরিয়ার চিকিৎসার জন্য গোসলের মাধ্যমে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন (Principles of Gynaccology Forth Edition, P. 557) এভাবে দৈনন্দিন গোসল করে ধুলামাটির হাত থেকে পবিত্র হওয়া নামাযের একটি পূর্বশর্ত। এতে করে চর্মরোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এভাবে বাহ্যিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মনের শক্তি বৃদ্ধি করে, চিত্তের প্রফুল্লতা আনে, ব্যক্তিত্বের ব্যাপ্তি ঘটায়, সম্মান বৃদ্ধি করে।

সাদা পদার্থ দ্বারা বেশি সৌরশক্তি প্রতিফলিত হয়। যার জন্য রোদের মধ্যে এক টুকরা বরফ ফেলে রাখলে তা আশাতীত সময় টিকে থাকতে পারে, গলে না। পৃথিবী থেকে অল্প সৌরশক্তি প্রতিফলিত হয়। যার জন্য মহাশূন্য থেকে পৃথিবীকে কিছুটা সাদা দেখা যায়। তাহলে মাথায় সাদা টুপি পরলে তা দ্বারা বেশি সৌরশক্তি প্রতিফলিত হবে। ফলে মস্তিষ্কের মধ্যে কম সৌরশক্তি প্রবেশ করবে এবং কম আয়নাইজেশন হয়ে কমমুক্ত ইলেক্ট্রন উৎপন্ন হবে, যার আধিক্য বহু দুরারোগ্য ব্যাধির কারণ। এটাই নামাযীর সাদা টুপি ও সাদা পাগড়ী ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব। এজন্য প্রিয়নবী স. মুসলিম জাতির জন্য সাদা কাপড়, সাদা টুপি, পাগড়ী ব্যবহারের তাগীদ দিয়েছেন। এ সম্বন্ধে একটি হাদীসে এসেছে সর্বোকৃষ্ট পোশাক যাদ্বারা তোমরা কবরে ও মসজিদে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে যাও তা শ্বেতবস্ত্র।-(ইবনে মাজা হতে সংগৃহীত)

শরীরের শুধু বাহ্যিকই নয়, অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জনের কথাও বলা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জনের জন্য হালাল খাদ্য গ্রহণ ও হারাম জিনিস বর্জন করতে জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। হারাম জিনিসকে

www.pathagar.com

চিকিৎসা শাস্ত্রে ক্ষতিকর এজেন্ট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন মদ, গাঁজা, ভাং, হিরোইন, প্যাথিডিন, মরফিন ইত্যাদিতে আসক্ত হলে বিভিন্ন অসুখ দেখা দেয়। সিরোসিস অব লিভারের পশ্চিমা দেশে মদের আসক্তির কারণে ব্যাপ্তি ঘটেছে। এর থেকে হেপাটিক কমা (Hepatic comma) হয়ে মৃত্যু হতে পারে। ড্রাগ আসক্তির কারণে আজকের যুব সমাজের যে নৈতিক ও মানসিক অবক্ষয় দেখা যাচ্ছে তা থেকে এর ক্ষতিকর দিক সহজেই অনুমেয়।

বাংলাদেশের প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও আই.পি.জি. এম.আর. (I.P.G.M.R)-এর ডিরেক্টর প্রফেসর নূরুল ইসলাম বলেন, "ধর্মীয় আচরণ বিধি মেনে চললে রোগ অনেক কমে যায় এবং স্বাস্থ্য সুন্দর থাকে। সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ হচ্ছে শারীরিক মানসিক সামাজিক ও নৈতিক সুস্থতা। সবাই নৈতিক সামাজিক দিক দিয়ে সজাগ হলে জাতীয় সুস্বাস্থ্য সম্ভব।" তিনি বলেন, বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কোথাও নৈতিক স্বাস্থ্য নেই। তাই শারীরিক স্বাস্থ্যও নেই। ২/২/১৯৮৭ তারিখে জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহ উপলক্ষে জনস্বাস্থ্যের ওপর এ বক্তৃতা কালে তিনি বলেছিলেন, "ভয়াবহ রোগ এইড্‌স একটা আশীর্বাদ। কারণ এর ভয়েই আমরা আস্তে আস্তে নৈতিক দিকে ঝুঁকে পড়বো।"

এইড্‌স সেসব দেশেই হচ্ছে যেসব দেশ নৈতিক দিক দিয়ে অধপতনে গেছে। বলা বাহুল্য পশ্চিমাদেশসহ আমাদের দেশেও এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আজ সরকার প্রধানরাও সোচ্চার হয়ে উঠেছেন।

যে স্থানে নামায আদায় করতে হয় সেই স্থান পবিত্র রাখা নামাযের পূর্বশর্ত। ব্যাপক অর্থে এই স্থানের পবিত্রতার মাধ্যমে মানুষ যে পরিবেশে বাস করে তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কথা বলা হয়েছে। মনে রাখতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। মানুষ যে পরিবেশে (Environment) বাস করে মানুষের দেহের উপর তার ব্যাপক প্রভাব পড়ে। (Community Medicine) এ পরিবেশের অর্থ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষের চারপাশের গাছ-পালা, জীব-জন্তু, কল-কারখানা, পানি ইত্যাদি সন্নিবেশে বাস করে। এ সমস্ত উপাদানের মাধ্যমে মানুষের শরীরের ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, যক্ষ্মা, ফাইলেরিয়া, ইয়েলেফেভার, ডেঙ্গু, টাইফাস ফিভার ও অন্যান্য সংক্রামক রোগ হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা যদি আমাদের পরিবেশকে পরিষ্কার ও পাক-পবিত্র রাখি তাহলে উপরোল্লেখিত রোগ ছাড়াও অন্যান্য জীবন সংহারকারী রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারি।

www.pathagar.com

এতক্ষণ নামাযের আংশিক বাহ্যিক পূর্বপ্রস্তুতির স্বাস্থ্যগত উপকারিতার কথা বলা হলো। কিন্তু নামাযের মধ্যে যে সমস্ত আনুষ্ঠানিক কার্যবিধি (অঙ্গ সঞ্চালন) করা হয় তা চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন ডাক্তার বারী বলেন, "Complete prayer five times a day is a moderate exercise also" (Ibid, 391) ব্যায়ামের উপকারিতা বর্ণনা করে ডাক্তার বারী বলেন "It has imense value, it develops the body, muscles improves the circulation, respiration, digestion and exertion. It improveds the tone and makes one smart and prompt. It corrects postural deformities and over weight and possibly prevents many diseases. Sendantery life has many hazards (Diabetes, constipation, insomnia ect). Again one should be regular in his exercise and should be moderate and suitable for age, fatigue must be avoided."

তাই আমরা দেখতে পাই পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয বা অবশ্য পালনীয় করা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অপরিহার্য বলে মনে হচ্ছে। আমরা যদি নামায আদায় না করি এবং অলসভাবে সময় নষ্ট করি তাহলে আমাদেরকে বিভিন্ন রোগে আক্রমণ করতে পারে।

মানবদেহ অসংখ্য কোষ বা Cell-এর সমন্বয়ে গঠিত। তাই এ কোষ বা কোষ সমষ্টিতে যখন স্থায়ী বা অস্থায়ী পরিবর্তন দেখা দেয় তখন রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। এ কোষে স্থায়ী বা অস্থায়ী পরিবর্তনের কারণসমূহ নিম্নরূপ। এ কারণগুলোই মানুষের দেহের রোগ সৃষ্টির মৌলিক কারণ ঃ

১। **হাইপোক্সিয়া (Hipoxia) বা অক্সিজেনের স্বল্পতা ঃ** এটি রোগ সৃষ্টির প্রধান কারণ। শরীরের বিভিন্ন কোষে রক্তের সাহায্যে অক্সিজেন পরিবহন করা হয়। তাই রক্তের সারকুলেশন (Blood Circulation) কমে গেলে বা বন্ধ হয়ে গেলে হাইপোক্সিয়া (Hipoxia) বা অক্সিজেনের স্বল্পতা দেখা দেয়। ফলে রোগ সৃষ্টি হয় ((Pathologic Basis of Diseases, Second Edition by Stanley L. Robvin M.D and Ramzis, Cotran M.D Chapter, Cell Injury and Cell Death-P. 24)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে নামাযের মাধ্যমে রক্ত সঞ্চালন (Blood Circulation) সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। ফলে বিভিন্ন রোগের যে মৌলিক কারণ তা নামাযের মাধ্যমে বর্জন করা যায়।

www.pathagar.com

২. রাসায়নিক এজেন্ট (Chemical Agent) ঃ মদ বা এলকোহল, ধুমপান, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, C.cl. 4, নেশা জাতীয় ঔষধ ও অন্যান্য রাসায়নিক বস্তু শরীরের নানাবিধ রোগ সৃষ্টি করে।

মূলত সমস্ত ঔষধই বিষতুল্য। বাংলাদেশ গণস্বাস্থ্যের প্রখ্যাত গবেষক চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডাক্তার আবুল কাশেম একথারই প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, "ঔষধ মানেই বিষ। যত কম ঔষধ ব্যবহার করা যায় ততই ভালো। তিনি এ সম্পর্কে আরো বলেছেন, "গড় আয়ু বৃদ্ধির জন্য রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। এ ছাড়া এজন্য সচেতনতা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার প্রয়োজন রয়েছে। বলাবাহুল্য, ইসলাম মানব জাতিকে যে জীবন বিধান দিয়েছে সে অনুযায়ী চললে মানব জাতিকে আজ এতো কঠিন কঠিন রোগে আক্রান্ত হতে হতো না।" ইতিহাস সাক্ষী দেয়, একদা একটি বিদেশী (সম্ভবত রোম থেকে আগত) মেডিক্যাল টীম এসেছিল নবী স.-এর দরবারে সাহাবীদের সেবা শুশ্রূষা করার জন্য। কিন্তু দীর্ঘকাল অবস্থান করেও একটা রোগী পেলো না। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে নবী করীম স. বলেছিলেন, এরা পরিমিত আহার করে এবং ইসলামী জীবন বিধান মেনে চলে। যেহেতু ইসলামী জীবন বিধানে উল্লেখিত নেশাকর দ্রব্যাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ সেহেতু সমস্ত নামাযী ব্যক্তি ঐ সমস্ত দ্রব্যাদি থেকে দূরে থাকে।

৩. বায়োলজিক এজেন্ট (Biologic Agent) ঃ ব্যাক্টেরিয়া, ফাঙ্গাস, প্যারাসাইটস, রিকেসিয়া ইত্যাদি রোগজীবাণু মানুষের চারপাশে বাস করে। এগুলো সংক্রামক রোগের মূল হোতা। অযু ও নামাযের আনুসঙ্গিক পবিত্রতার মাধ্যমে একজন নামাযী অতি সহজে এ সমস্ত রোগজীবাণু থেকে দূরে থাকতে পারে।

৪. পুষ্টি ও রোগ (Nutritional Factor) ঃ রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "যে লোক সহীহ শুদ্ধভাবে নামায আদায় করে তার রিযিকের অভাব হয় না। ফলে প্রকৃত নামাযী ব্যক্তি কখনো অপুষ্টিজনিত রোগের শিকার হতে পারে না।

৫. ইমিউপোজিক্যাল ফ্যাক্টর (Immunolagical Factor)।

৬. জেনেটিক ফ্যাক্টর (Genitic Factor) এবং

৭. নিওপ্লাসিয়া (Neoplasia) বা টিউমার ঃ এ ফ্যাক্টরগুলো দমন রাখতেও নামাযের যে অন্তর্নিহিত ভূমিকা থাকতে পারে তা বলা যায়।

৮. মানসিক প্রতিক্রিয়া বা সাইকোলজিক্যাল এজেন্ট (Psychological Agent) ঃ ডাক্তারী শাস্ত্রে বলা হয়ে থাকে "Health is the physical

www.pathagar.com

mental, Social and spiritual well-being not merely the absence of disease or infermity." তাই শরীর সুস্থ রাখতে হলে মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সুস্থতা অপরিহার্য। নামাযের মাধ্যমে এ তিনটি শান্তি অর্জন করা যায়। আজ বিশ্বের উন্নত অনুন্নত সমস্ত দেশকে পর্যালোচনা করলে এ সত্যটি আমাদের মগজে অনায়াসে ধরা পড়ে। পশ্চিমা উন্নত বিশ্বের মানুষের জীবন প্রকৃতিতে ধন-ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য আছে, কিন্তু ইসলামের হাকীকত ও নামায তাদের মধ্যে নেই। ফলে ঐ সমাজের মধ্যে মানসিক ও সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ড্রাগ আসক্তি (হেরোইন, মরফিন, মদ, ম্যানড্রেক্স টেবলেট, প্যাথেড্রিন) আত্মহত্যা, হত্যা, নারী ধর্ষণ, লুণ্ঠন, মানসিক যৌন-বিকৃতি যেমন বেষ্টিয়েলিটি, হোমো সেক্সুয়ালিটি, হেটারোসেক্সুয়ালিটি, সোডোমি, বাকলকটাস ইত্যাদি সামাজিক ও মানসিক অরাজকতায় তারা নিজেরাও যেমন দিশেহারা অনুরূপভাবে এগুলো অন্য দেশে বিস্তার করে তাদেরকেও বিব্রত করে রাখছে। ফলে সামাজিক ও মানসিক যে শান্তি তা পদে পদে বিঘ্নিত হচ্ছে। একমাত্র ইসলামে শুরু থেকে এ কার্যকলাপগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যে ব্যক্তি নিয়মিত নামায আদায় করে সে সর্বদা একটা মানসিক ও আত্মিক প্রশান্তির মধ্যে বাস করে। ফলে এ জঞ্জালময় কার্যকলাপ থেকে সে দূরে থাকে।

মানসিক অস্থিরতা বা (Mental anxiety, tension, worriness শরীরের কোষের (Cell) জৈবিক পরিবর্তন ঘটায়। ফলে বিভিন্ন অরগানিক ডিজিজ (Organic Disease) দেখা দেয়। প্রখ্যাত স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ Sir Norman Jeffcoate) মহিলাদের মাসিক এর অনিয়ম যথা এমাইনোরিয়া (মাসিক না হওয়া), অলিগোমেনোরিয়া (অল্প মাসিক হওয়া), ডিসমেনোরিয়া (মাসিকে ব্যথা হওয়া) ইপিমেনোরিয়া পলিমেনোরিয়া (ঘনঘন মাসিক হওয়া), মেনোরজিয়া (বেশি মাসিক হওয়া), ডিসফাংশনাল ইউটেরাইন ব্লাডিং (রক্ত প্রদর), হ্যামেরজিকা (রক্তস্রাব), ইমপোটেন্সী (যৌন অক্ষমতা), ইনফার্টিলিটি (সন্তান না হওয়া), এবোরশান (গর্ভপাত), গর্ভের সময় রক্তচাপ বৃদ্ধি ইত্যাদি অসুখগুলোর আংশিক কারণ মূলত মানসিক অস্থিরতাকে চিহ্নিত করেছেন।

এভাবে দেখা যায়, চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে উচ্চ রক্তচাপ (Hypertension), করোনারিহার্ট ডিজিজ, স্ট্রোক, ক্রনিক ডিয়োডোনাল

www.pathagar.com

আলসার (পুরাতন বৃহদান্ত্রের ক্ষত), হুপিং (হাপানী), ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম (পেটের পীড়া), এ্যগথাস আলসার (ভিটামিনের অভাবে মুখের ঘা), টাকপড়া (এ্যলোপেশিয়া), নিউরোসিস (পাগল হওয়া), সাইকোসিস, ইত্যাদি জাতীয় রোগ মানসিক অস্থিরতার জন্য দায়ী। সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মানুষ বিশেষ করে ব্যবসায়ী উচ্চনির্বাহী অফিসার, পশ্চিমা দেশের ঐশ্বর্যের পিছনে যারা ছুটছে তাদের মৃত্যুর মূল কারণ এ সমস্ত অসুখ। একটি পরিসংখ্যানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের গবেষক চিকিৎসাবিজ্ঞানী অধ্যাপক এস. জি. এম. চৌধুরী গবেষণা পরিচালনা করে দেখতে পেয়েছেন যে, কওমী মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে উচ্চ রক্ত চাপের হার শূন্য। অথচ সমাজের ব্যবসায়ী ও নির্বাহী অফিসারদের মধ্যে এর হার X এবং Y এতে করে বুঝা যায় নামায ও ইসলামী আহকাম মানুষকে নিবিড় মানসিক প্রশান্তির মধ্যে রাখে ফলে নামাযী ব্যক্তি মানসিক অস্থিরতাজনিত রোগবালাই মুক্ত থাকে।

প্রকৃত নামাযী ব্যক্তিই প্রকৃত ঈমানদার। ঈমানদার ব্যক্তি কখনো যিনা ও বিকৃত যৌন সম্ভোগের প্রশ্রয় নেয় না। ফলে যৌন রোগ থেকে তারা মুক্ত থাকে। ভিনারিয়াল ডিজিজ (Vineareal Disease) পূর্বে আমাদের দেশে ছিলো না। বৃটিশ নাবিকরা এ রোগ বহন করে আমাদের দেশে নিয়ে আসে। আর তাদেরই সৃষ্টি পতিতা সমাজের মধ্যে জিইয়ে রাখে। ফলে সমাজের বিপথগামী লোকজন এর শিকার হয়। কিন্তু প্রকৃত নামাযীরা তাঁদের ঈমানী বলে বলিয়ান হয়ে স্বীয় ষড়রিপুর বিরুদ্ধে জিহাদ করে এ সমস্ত যৌনরোগ যথা গনোরিয়া, সিফিলিস, এইডস ইত্যাদি মারাত্মক রোগ থেকে মুক্ত থাকতে পারছে।

একটা চুম্বকদণ্ড যেমন তার উত্তর প্রান্ত হতে দক্ষিণ প্রান্তের দিকে চুম্বক বলরেখা প্রবাহিত করে, পৃথিবীও তেমনি তার চুম্বক মেরুদণ্ডের উত্তর মেরু হতে দক্ষিণ মেরুর দিকে চুম্বক বলরেখা প্রবাহিত করে। একটা বৈদ্যুতিক মটরের মধ্যে যদি চুম্বক বলরেখা দ্বারা দুর্বল বৈদ্যুতিক বলরেখা কর্তিত হয়ে বেশী শক্তিশালী চুম্বকীয় বৈদ্যুতিক বলরেখা (Electromagnetic Lines of Forces) উৎপন্ন হতে পারে (রোটারচল) তবে কেন পৃথিবীর মধ্যেও তেমনি তার চুম্বক বলরেখা দ্বারা তারই বহিঃস্তরের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত ইলেকট্রনের চক্রগুলো কর্তিত হয়ে বেশি শক্তিশালী চুম্বকীয় বৈদ্যুতিক বলরেখা উৎপন্ন হতে পারবে না ? এ দুয়ের মধ্যে (বৈদ্যুতিক মটর ও পৃথিবী) শুধু পার্থক্য এই যে, বৈদ্যুতিক মটরের উৎস শক্তি বিদ্যুৎ, তার ভিতরে তার বৈদ্যুতিক বলরেখা চক্রাকার (কর্কস্ক্রু রুল) এবং

www.pathagar.com

যে তৃতীয় শক্তির উৎপন্ন হয়, যার জন্য ঐ মটর ঘোরে তা চক্রাকার। আর পৃথিবীর ক্ষেত্রে তার আবর্তনের উৎসশক্তি সূর্য দ্বারা ছড়ান ইলেকট্রন, তা পৃথিবীর বাইরে বহিঃস্তরের ইলেক্ট্রনের চক্র পৃথিবীর উপর সূর্যের বিক্ষিপ্ত সৌরশক্তি সরল রেখায় এবং যে তৃতীয় শক্তি উৎপন্ন হয় যা ভূপৃষ্ঠে থেকে বায়ুমণ্ডলে প্রবাহিত তাও সরল রেখার ন্যায়। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে প্রবাহিত এই তৃতীয় শক্তির নামই সেলফ।

পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির ফলে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে যে সেলফ (Self) বা বলরেখা অনবরত বিক্ষিপ্ত হচ্ছে তাও মানুষের মহা কল্যাণের জন্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিক্ষিপ্ত করাচ্ছেন। মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্ট আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এ সেলফ বা বলরেখা দ্বারা মানুষ যাতে দৈহিক ও আত্মিক উভয় দিক দিয়ে লাভবান বা উপকৃত হতে পারে সে জন্য তিনি নামায এবং নামাযে সিজদা করার হুকুম প্রদান করেছেন।

একদিন কতবার এ সিজদা মানুষের দৈহিক ও আত্মিক সুস্থতার জন্য আবশ্যক তারও একটা আন্তর্জাতিক পরিমাণ আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানুষকে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। দিন রাতের পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযে সর্বমোট চৌত্রিশ বার 'সিজদা' করলে একটা মানুষ মোটামুটিভাবে উভয় দিক দিয়ে মুক্তি পেতে পারে। প্রতি সিজদায় 'সুবহানা রাব্বিআল আ'লা' তিনবার পড়তে যতটুকু সময় লাগে তাই সিজদার সময়ের একক। নামাযের প্রধানতম প্রক্রিয়া এ সিজদা নামাযী কিভাবে শেফা হিসেবে কাজ করে থাকে তা নিয়েও চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা গবেষণা পরিচালনা করেছেন। তাঁদের মতে, নাসিকার অগ্রভাগ ভূ-পৃষ্ঠে স্পর্শ করা হলে ঐ নাসিকার মধ্যে সঞ্চারিত অলফ্যাকটরী নার্ভের মাধ্যমে পৃথিবী বিক্ষিপ্ত বলরেখা সেলফ সহজে সরাসরি মস্তিষ্কের কেন্দ্রস্থ প্রায় সমস্ত স্নায়ুকোষ গুচ্ছের মধ্যে প্রবেশ করে। কারণ ঐ অলফ্যাকটরী নার্ভ মস্তিষ্কের কেন্দ্রস্থ প্রায় সমস্ত স্নায়ু কোষগুচ্ছের সাথে সংযুক্ত। কাজেই ললাট ও নাসিকার অগ্রভাগ একত্রে ভূ-পৃষ্ঠে স্পর্শ (সেজদা) করা হলে মস্তিষ্কের ভিতর ও বাইরের সমস্ত নার্ভকোষ তথা সমস্ত মস্তিষ্কের মধ্যে পৃথিবীর বিক্ষিপ্ত বলরেখা সেলফ যেমন একই সাথে সরাসরি প্রবেশ করতে পারে এবং মস্তিষ্কের মধ্যস্থ ইলেকট্রনের বাড়তি অংশ পৃথিবীর মধ্যে টেনে নিতে পারে তেমনি মাথার অন্য কোনো এলাকা ভূ-পৃষ্ঠে স্পর্শ করা হলে একই সাথে এবং সরাসরি মস্তিষ্কের ভিতর ও বাইরের সমস্ত স্নায়ু কোষের মধ্যে পৃথিবী বিক্ষিপ্ত বলরেখা সেলফ প্রবশ করতে পারে না। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের শান বুঝা বড় কঠিন। সম্ভবত

www.pathagar.com

এ কারণেই সিজদার সময় প্রথমে নাসিকার অগ্রভাগ স্পর্শ করত নামাযীর ললাট ভূ-পৃষ্ঠে স্পর্শ করার তাগিদ শরীআতে রয়েছে।

এদিকে নামাযের সময় বা ওয়াক্তের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযসহ অন্যান্য ওয়াজিব ও সুন্নাত নামাযসমূহের জন্য দিন ও রাতের এমন সময় নির্ধারিত রয়েছে যা সূরা হুদের ১১৪ আয়াতেই নামাযের সময়ের অর্থের (অর্থাৎ দিনের উভয় প্রান্তে রাতেরও একাংশে) সাথে পুরোপুরি মিল আছে। উপরন্তু অন্যান্য যে সমস্ত আয়াতে নামাযের সময় বা ওয়াক্তের কথা ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলোতেও নামাযের সময়ের সার্বিক অর্থের সাথেও পুরোপুরি মিল রয়েছে। অর্থাৎ মোট যে আয়াতগুলো দ্বারা নামাযের সময় বা ওয়াক্ত নির্দেশিত সেগুলোর সার্বিক অর্থ দ্বারা সমস্ত নামায দিনের উভয় প্রান্তে রাতেরও একাংশ নিয়ে এমন এক বিস্তীর্ণ সময় বুঝায় যে সময় ভূ-পৃষ্ঠ দ্বারা বিক্ষিপ্ত বলরেখা সেলফ দিনরাতের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং মস্তিষ্ক থেকে ইলেকট্রন পৃথিবীর মধ্যে টেনে নেয়ার শক্তিও সবচেয়ে বেশী। কাজেই ঐ সময় নামাযের সিজদায় মস্তিষ্কের মধ্যে যে বাড়তি ইলেকট্রন মানুষের বিভিন্ন রোগের কারণ তা অতি সহজে পৃথিবীর মধ্যে চলে যায় এবং ঐ রোগগুলো মানুষের অজান্তেই নিরাময় হয়ে যায়।

এবার কিছু রোগের কথায় আসা যাক। যেমন গ্যাস্ট্রিক আলসার, পাইলরিক স্টেনসিন, কোষ্ঠকাঠিন্য, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, বেশি মোটা হওয়া, নিউরালজিয়া, হিস্টেরিয়া, শরীরদাহ একলামপসিয়া, বাই, খিচুনী, অনিয়মিত ঋতুস্রাব, সিজেফ্রেনিয়া, স্বপ্নদোষ, স্ত্রী সহবাসে অপারগতা, একাধারে দিনের পর দিন বমি হওয়া, হাইপারইমিসিস, প্রতিভেরাম, মোসন, সিকনেচ, পাগলামি ইত্যাদি। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এ সবই রোগের মধ্যে গণ্য। সব রোগের জন্য তেমন কোনো নিশ্চিত কারণ পাওয়া যায় না। আবার এদের জন্য তেমন কোনো ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসকেও দায়ী করা হয় না। তবে এদের সবার মস্তিষ্ক ব্যতিক্রমহীন ভাবে বেশি উত্তপ্ত থাকে। এসব রোগীর ললাট ও নাসিকার অগ্রভাগ ভূ-পৃষ্ঠে বা কোনো পাকা মেঝের উপর পূর্বের মত স্পর্শ করা হলে এদের মস্তিষ্ক থেকেও প্রয়োজনাতিরিক্ত ইলেকট্রন পৃথিবীর মধ্যে চলে যায়। তাতে যেমন তাদের উত্তপ্ত মস্তিষ্ক স্থায়ীভাবে ঠাণ্ডা হয় তেমনি উক্ত রোগগুলোর অধিকাংশ নিরাময় হয়। শরীরের মধ্যে কোনো কার্যকরী রোগ জীবাণু থেকে থাকলে সে ক্ষেত্রে ললাট ও নাসিকার অগ্রভাগ ঐভাবে স্পর্শ করা হলে তার বৈজ্ঞানিক কায়দা যেমন খুব দুর্বল হয়ে যায় তেমনি তা আবার ক্ষণস্থায়ী হয়। এসব

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে প্রতিষেধক ঔষধ দ্বারা ঐ রোগ জীবাণু নির্মূল করা হলে তবেই তার বৈজ্ঞানিক কায়দা লক্ষণীয়ভাবে উপলব্ধি হয়ে থাকে।

তাছাড়া বায়ুমণ্ডলের নিম্নচাপের সময় দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় এবং পূর্ণিমা ও অমাবস্যার সময় ললাট ও নাসিকার অগ্রভাগ ঐ ভাবে স্পর্শ করা হলে তার বৈজ্ঞানিক কায়দা কম অনুভব হয়। ঐ সময় পৃথিবী বিক্ষিপ্ত বলরেখা সেলফ এর জোর অপরিবর্তিত থাকলেও বায়ুমণ্ডলের পটেনশিয়াল ভেল্যু বৃদ্ধি পায়। এতে ঐ বায়ুমণ্ডল ও পৃথিবীর পটেনশিয়াল ভেল্যুর ব্যবধান কমে যায়। উল্লেখ্য যে, পটেনশিয়াল ভেল্যুর ব্যবধানকে ই. এম. এফ বা ইলেকট্রো রোটিভ ফোরস (Electtro Rotive Force) বলে। কাজেই ঐ সময় পৃথিবী বিক্ষিপ্ত বলরেখা সেলফ দ্বারা শরীর থেকে ইলেকট্রন পৃথিবীর মধ্যে টেনে নেয়ার পরিমাণও কমে যায়। এজন্য এ সমস্ত সময় রোগের প্রভাব ও মৃত্যুহার বেশী থাকে।

পৃথিবী বিক্ষিপ্ত বলরেখা সেলফ এর কার্যকারিতা আবার সবার উপর সমান নয়। কেউ তা অল্প সময় ললাট ও নাসিকার অগ্রভাগে ব্যবহার করে বেশী উপকৃত হয়। কেউ তা অল্প সময় ব্যবহার করে কম উপকৃত হয়। আবার কেউ তা অল্প সময় ব্যবহার করে তেমন কোনো উপকারিতা উপলব্ধি করে না। এদের সংখ্যা অবশ্য খুবই নগণ্য।

কিছু লোক বিশেষ করে যাদের কর্টিকাল সেল ড্যামেজ বা মায়কার্ডিয়াল ড্যামেজ (Cortical cell damage or myocardial damage) রয়েছে তারা যদি ললাট ও নাসিকার অগ্রভাগে দীর্ঘ সময় ব্যবহার করে তাহলে মস্তিষ্ক থেকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী ইলেক্ট্রন পৃথিবীর মধ্যে চলে যাবে। তাতে তাদের হৃদপিণ্ড ও মস্তিষ্কের মধ্যকার ইলেকট্রনের ভারসাম্য ব্যাহত হতে পারে। ফলে আপাতত তাদের খুব খারাপ লাগতে পারে, মাথা ঘুরতে পারে। তবে তা ক্ষণস্থায়ী।

সম্ভবত এর জন্য সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা স. জীবনের প্রথম থেকে সিজদার (নামাযের) অভ্যাস করার লক্ষে জোর তাগিদ করে বলেছেন, "তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাত বছর বয়সে নামায পড়তে আদেশ কর এবং দশ বছর বয়সে নামাযের জন্য প্রয়োজনে প্রহার কর।"–মিশকাত শরীফ

সূর্যের প্রভাবে পৃথিবীর বহিঃস্তরের মধ্যদিয়ে ইলেক্ট্রনের চক্রাবর্তনের ফলে যেমন তা (পৃথিবী) ঘুরছে, তেমনি আবার দিনের দুই প্রান্তে রাতেরও একাংশ নিয়ে ভূ-পৃষ্ঠের এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এমন এক পরিবর্তন হচ্ছে, যেখানে পৃথিবীর বিক্ষিপ্ত বলরেখা সেলফ ভূ-পৃষ্ঠে অন্যান্য স্থানের

www.pathagar.com

তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী। ঐ সময় (অর্থাৎ দিনের দুই প্রান্তে রাতেরও একাংশে) ভূ-পৃষ্ঠের উপর সিজদা দিলে পৃথিবীর বিক্ষিপ্ত ঐ বলরেখা বেশীমাত্রায় মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করে এবং বেশী মাত্রায় ইলেকট্রন পৃথিবীর মধ্যে টেনে নিতে পারে। ফলে মস্তিষ্কের মধ্যে ঐ বেশি মাত্রায় ইলেক্ট্রন থাকার জন্য শরীরে যে সমস্ত রোগ সৃষ্টি হয় তারও নিরাময় দান করে থাকে। উল্লেখ্য, সেলফ এর এ রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা তখন আরো বেশী হয়, যখন নামাযী বা কোনো রুগ্ন ব্যক্তি পাকা মেঝের উপর সিজদা করে থাকে। এটা পরীক্ষিত। এ পরীক্ষা পরিচালনা করেছেন বাগেরহাটের নাগের বাজারের প্রবীণ চিকিৎসাবিদ মমতাজ উদ্দিন সাহেব এবং পর্যবেক্ষণ করেছেন বাগেরহাটের সিভিল সার্জন কাওছার উদ্দিন সাহেব। এম. বি. এস ডাক্তার জনাব মমতাজ উদ্দিন সাহেবের এ গবেষণার ফলাফল ডাঃ ক্যারল, ডাঃ কার্লজাঈ, ডাঃ ব্রিল এবং ইউলিয়ান জেমস এর দেয় তথ্যের সত্যতা প্রমাণ করে।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর কুদরতী শক্তি দ্বারা এরূপ অত্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে এই পৃথিবীকে যদি না ঘুরাতেন তাহলে দিন ও রাতের সবসময় ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বিক্ষিপ্ত বলরেখা সেলফ একই রকম থাকতো। আর তাই যদি হতো তাহলে পৃথিবীতে প্রাণের স্পন্দন থাকতো না—চন্দ্রের ন্যায় প্রাণহীন একটি গ্রহরূপে মহাবিশ্বে আমাদের এ বৈচিত্রময় পৃথিবী ভাসমান থেকে বিচরণ করে বেড়াত। কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলামীনের বিশেষ রহমতে তা মানুষের বসবাসের উপযোগী হলো এবং তাদের মনোরঞ্জনের জন্য সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা করা হলো। উপভোগের জন্য হাজারো রকমের নিয়ামতে পরিপূর্ণ করে দেয়া হলো। মানুষ তার দেহ কারখানারূপ শরীরের মহামূল্যবান অংগ-প্রত্যংগের পার্টস-এর কথা যখন স্মরণ করে এবং এগুলোকে মানুষের কল্যাণ সংরক্ষণের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীন শরীরের অভ্যন্তর ও বাইরে যে সমস্ত ব্যবস্থাপনা চালু রেখেছেন তার কথা চিন্তা-গবেষণা করে তখন নিজের অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয় 'আল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন' —হে আল্লাহ সমস্ত প্রশংসাই তোমার জন্য, কারণ তুমি 'আর রহমানীর রহীম'—পরম দয়ালু ও দাতা। একজন নামাযী তাঁর জীবন সংগ্রামের প্রভাতে ফজর নামাযে ঘোষণা করে, আল্লাহর রহমতের পিযুষধারায় সিক্ত হয়ে নব শক্তিতে বলিয়ান হয়ে স্বীয় কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বলাবাহুল্য যে, এরকম অতি সুন্দর বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনা এক ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো মানব রচিত ধর্ম মানুষকে উপহার দিতে পারেনি। আর

www.pathagar.com

পারেনি বলেই অন্যান্য জাতির চিন্তাশীল গবেষক, বিজ্ঞানী, বড় বড় খৃষ্টান পাদ্রী এবং হিন্দু জ্ঞানী ও বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত ধর্মগুরু ব্যক্তিগণ ইসলামের বিজ্ঞান ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থায় ও সভ্যতায় বিমুগ্ধ হয়ে অধুনা দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে চলেছে। মানুষ যতই কুরআন ও ইসলামী বিধি-বিধান নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা করবে ততই এর প্রতি বেশি করে আকৃষ্ট হবে। কারণ 'আল কুরআন' বিজ্ঞানময় গ্রন্থ (সূরা ইয়াসিন), বিজ্ঞানময় মানব পরিচালন বিধি।

এতক্ষণ যে আলোচনা করা হলো তা নামাযের বাহ্যিক স্বাস্থ্যগত উপকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, নামাযের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অসীম। আমাদের এই সামান্য জ্ঞানের মাধ্যমে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য প্রকাশ করতে যাওয়া বেয়াদবী মাত্র। আমরা মুসলিম মিল্লাত এমন একটি সম্পদকে হাতে পেয়ে এর সদ্ব্যবহার করছি না। ফলে এর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা তো দূরের কথা এর যে জৈবিক স্বাস্থ্যগত উপকারিতা আছে তাও গ্রহণ করতে ব্যর্থ হচ্ছি। আমাদের নামের পাশে মুসলিম শব্দটি থাকলেও আসলে এর যে ঈমানী হাকীকত বা তাৎপর্য আছে তা আমরা গ্রহণ করতে পারছি না। আমাদের দেশে ইতিপূর্বে দেখেছি বহু আলেম যাঁরা নামাযকে পুরোপুরি আঁকড়ে ধরেছেন, তাঁরা খুব কমই বালা মুসিবতের রোগ শোকের শিকার হয়েছেন। মহামারিতে যখন গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে গেছে, মানুষ গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে পলায়ন করছে তখন এ সমস্ত লোক আর্তপীড়িতের সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছেন। নামাযের পবিত্রতার তাৎপর্য ও হাকীকতে তাঁরা নিজেরা মহামারী থেকে রক্ষা পেয়েছেন এবং অপরকে রক্ষা করার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চেষ্টা করেছেন। তাই খাঁটি মানুষ হিসেবে সুস্থ হয়ে আমাদের বাঁচতে হলে নামাযের রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। তবেই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তি পাওয়া যাবে।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- তাফহীমুল কুরআন (১-১৯ খণ্ড)
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
- শব্দে শব্দে আল কুরআন (১-১৪ খণ্ড)
  - মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
- শব্দার্থে আল কুরআনুল মজীদ (১-১০ খণ্ড)
  - মতিউর রহমান খান
- সহীহ আল বুখারী (১-৬ খণ্ড)
  - ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র)
- সুনান ইবনে মাজা (১-৪ খণ্ড)
  - আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র)
- শারহু মাআনিল আছার (তাহাবী শরীফ) (১-২ খণ্ড)
  - ইমাম আবু জাফর আহমদ আত তাহাবী (র)
- সীরাতে সরওয়ারে আলম (১-২ খণ্ড)
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
- আল কুরআনের শিক্ষা (১-২ খণ্ড)
  - আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী
- মহিলা ফিক্‌হ (১-৪ খণ্ড)
  - আল্লামা মুহাম্মদ আতাইয়া খামীস
- ফিক্‌হী বিশ্বকোষ (১-৮ খণ্ড)
  - ড: মুহাম্মদ রাওয়াস কালা'জী
- বিশ্ব নবীর সাহাবী (১-৬ খণ্ড)
  - তালিবুল হাশেমী
- মহানবীর সীরাত কোষ
  - খান মোসলেহউদ্দীন আহমদ

www.pathagar.com